১

বন্-এ যখন পেঁছিলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এই পাঁচ বছর ধরে পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর ফলে আমার মধ্যে কতকগুলো যান্ত্রিক অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। যেমন প্ল্যাটফরম্-এর সিঁড়ি বেয়ে নামা, প্ল্যাটফরম্-এর সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, সুটকেস্ নামিয়ে রাখা, ওভারকোট-এর পকেট থেকে টিকিট বার করা, সুটকেস্ হাতে নেওয়া, টিকিট দেওয়া, পত্রিকার স্ট্যাণ্ডে যাওয়া, সন্ধ্যের কাগজ কেনা, বাইরে আসা এবং ট্যাক্সি ডাকা—এখন জোর করে নিজেকে সে-অভ্যাসগুলির বশ্যতা থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করলাম। পাঁচ বছর ধরে আমি প্রায় প্রত্যেক দিন কোথাও না কোথাও রওনা হয়েছি এবং কোথাও না কোথাও পেঁছেছি। সকালে প্ল্যাটফরম্-এর সিঁড়ি বেয়ে উঠেছি এবং নেমেছি আবার বিকেলে প্ল্যাটফরম্-এর সিঁড়ি বেয়ে নেমেছি এবং উঠেছি, ট্যাক্সি ডেকেছি, টিকিটের দাম দেবার জন্যে কোটের পকেট হাতড়েছি। পত্রিকার স্ট্যাণ্ডে সন্ধ্যের কাগজ কিনেছি আর আমার মনের সচেতন কোণে এই যান্ত্রিক অভ্যাসের সঠিক হিসেব করা আলস্য উপভোগ করেছি। ওই ৎস্যুফ্নারকে, মানে ওই ক্যাথলিকটাকে বিয়ে করবার জন্য মারী আমাকে ছেড়ে যাবার পর থেকে আমার দৈনন্দিন জীবন আরও যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে, অবশ্য ও-গুলো ভেবেচিন্তে করার ব্যাপার হয়ে ওঠে নি কখনো।

স্টেশন থেকে হোটেল অবধি, হোটেল থেকে স্টেশন—দূরত্বের একটা মাপ আছে, সেটা ট্যাক্সির মিটার। যেমন দু-মার্ক দূরত্ব, তিন-মার্ক দূরত্ব কি চার-মার্ক পঞ্চাশ পেনি। মারী চলে যাবার পর থেকে মাঝে-মধ্যে আমার দৈনন্দিন জীবনে ছন্দ-পতন ঘটেছে। হোটেল-এর সঙ্গে স্টেশন গুলিয়ে ফেলেছি।

হতবুদ্ধি হয়ে হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে টিকিট খুঁজছি কিংবা টিকিট চেকারকে আমার ঘরের নম্বর জিজ্ঞেস করেছি। কী যেন একটা, বোধহয় অদৃষ্ট, আমার পেশা এবং আমার অবস্থার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমি একজন ক্লাউন। সরকারী কাগজে লেখা আছে, ক্যারিক্যাচারিস্ট, কোন গির্জারই সদস্য নয়, বয়স সাতাশ।

আমার একটা ক্যারিক্যাচার-এর নাম 'পৌঁছোনো ও রওনা হওয়া', একটা লম্বা, বেশ বেশীই লম্বা মূকাভিনয়, আর তা দেখতে দেখতে দর্শকরা অবশেষে পৌঁছানো আর রওনা হওয়া গোলমাল করে ফেলে। আমি এই মূকাভিনয় প্রায়ই একবার ট্রেনের মধ্যে ঝালাই করে নিই (এতে ছ'শোরও বেশী এ্যাক্শন আছে আর সেগুলোর কোরিওগ্রাফি আমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হয়), কাজেই মাঝে-মধ্যে আমি আমার নিজের কল্পনারই শিকার হয়ে যাই। যেখানে স্রেফ আমার হোটেলের ঘরে গিয়ে আমার শো-এর জন্য তৈরি হবার কথা সেখানে হুড়মুড়িয়ে হোটেলে ঢুকে টাইম টেবিলটা খুঁজতে শুরু করি, সেটা পেয়ে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠি কিংবা নামি যাতে ট্রেনটা ফস্কে না যায়। কপাল ভাল, প্রায় সব হোটেলে অধিকাংশ মানুষই আমাকে চেনে। পাঁচ বছরে এমন একটা ছন্দের সৃষ্টি হয়ে যায়, যার মধ্যে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা, সাধারণভাবে লোকে যেমন ভাবে, তার চেয়ে অনেক কম থাকে—আর তাছাড়া আমার দালাল আমার অভ্যাসগুলোর সঙ্গে পরিচিত বলে এমন একটা বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে রাখে যাতে করে তেমন কোন একটা গোলমাল বাধে না। "শিল্পীসুলভ ভাব-প্রবণতা" বলে লোকটা আমার যে অভ্যাসগুলোর নাম দিয়েছে, তাকে সে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করে বলে আমার আরামের কোন ত্রুটি রাখে না। ফলে ঘরে ঢোকা মাত্র একটা 'সচ্ছলতার ছাপ' আমাকে ঘিরে থাকে। যথা—একটা ফুলদানীতে ফুল, ওভারকোটটা খুলে ফেলে জুতো জোড়া (জুতো আমার দু' চোখের বিষ) কোণের দিকে ছুঁড়ে ফেলতে না ফেলতেই একটি সুন্দরী মেয়ে কফি আর ব্র্যান্ডি নিয়ে হাজির, বাথটবে স্নানের জল, তাতে সবুজ রঙের একটা পদার্থ মিশিয়ে সুগন্ধি এবং মনোরম করা। বাথটবে আমি কাগজ পড়ি, সব হাল্কা ধরনের, সংখ্যায় ছ'টা অবধি, অন্তত পক্ষে তিনটে। তখন আমি গলা ছেড়ে গানও গাই, একমাত্র গির্জার গান। যেমন কোরাস, স্তবগান, স্কুল জীবনে শেখা যা-সব মনে আসতো তাই। আমার বাবা-মা ছিলেন গোঁড়া প্রোটেস্টান্ট, যুদ্ধের পরের ফ্যাশান 'ধর্মীয় উদারতায়' বিশ্বাস করতেন এবং আমাকে একটা

ক্যাথলিক স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। আমি নিজে ধর্মে বিশ্বাস করি না, এমন কি গির্জাতেও না। গির্জার গান বা স্তবগান গাই আমার রোগের চিকিৎসা হিসেবে। আমার স্বভাবে দুটো কষ্ট চেপে বসে আছে—বিষাদ এবং মাথার যন্ত্রণা। ঐ-সব গান গাইলে আমি ও দুটোর হাত থেকে রেহাই পাই। মারী যখন থেকে ক্যাথলিকদের দলে গিয়ে ভিড়েছে (মারী যদিও ক্যাথলিক, তবুও মনে হয় ওটাই সঠিক উক্তি), আমার যন্ত্রণা দুটোর উগ্রতা তখন থেকে আরও বেড়েছে। এযাবৎ 'টান্টুম এ্যারগো' বা 'গির্জার লিটানী' গান ছিল আমার যন্ত্রণা উপশমের অমোঘ উপায়, এখন তাতেও বিশেষ ফল হয় না। সাময়িক উপশমের একটি উপায়—মদ। সম্পূর্ণ উপশমেরও একটি উপায় ছিল—মারী; মারী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। ক্লাউন মদ ধরলে মাতাল-ঘরামির চাল থেকে পড়ে যেতে যত সময় লাগে তার চেয়েও জলদি গড়িয়ে পড়ে।

আমার ক্যারিক্যাচারের ভঙ্গিগুলো নিখুঁতভাবে করতে পারলে তবেই ওৎরায়। মাতাল অবস্থায় আমি তা পারি না, বাজে ভুল করে বসি। এবং বিব্রত অবস্থার যে-ফাঁদে পড়ে একজন ক্লাউনের সব জারিজুরি ধরা পড়ে যায় সে অবস্থায় পড়ে নিজের ধাপ্পাবাজিকেই বিদ্রূপ করি। আসলে জঘন্য অপদস্ত হওয়া একটা অবস্থা। সাদা চোখে থাকলে, স্টেজে ঢোকার ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমার ভয়টা ক্রমাগত বেড়েই চলতে থাকে (তখন বেশীরভাগ সময়েই আমাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে হয়)। কোন কোন সমালোচক আমার যে শোগুলোকে 'এই পরম মুহূর্তের চিন্তামগ্ন প্রসন্নতা' বা 'যার পেছনে আছে দরদী মনের ছোঁয়া', বলত, তা আসলে আমার বেপরোয়া চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর তার ফলে আমি সুতোয় টানা পুতুল হয়ে যেতাম। বলা বাহুল্য, সুতো ছিঁড়লেই মুশকিল, তখন ওই পুতুলের মত নিজেই নিজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ার সম্ভাবনা। সাধনায় নিমগ্ন মুনিদের কারো কারো খুব সম্ভব এরকম হয়। মারী সব সময় প্রচুর মিস্টিক বই নিয়ে ঘুরতো। আমার মনে আছে সেগুলোর মধ্যে আকছার 'শূন্য' এবং 'তুচ্ছ' শব্দ দুটি আমি দেখেছি।

তিন সপ্তাহ যাবৎ আমি বেশীর ভাগ সময়েই মাতাল অবস্থায় ছিলাম আর তখন সব সময় আত্মবিশ্বাসের একটা মিথ্যা ভান নিয়ে স্টেজে ঢুকেছি, ফলে মোহভঙ্গ ঘটেছে সেই স্কুলের পিছিয়ে থাকা ছাত্রের চেয়েও জলদি —যে-ছাত্র পরীক্ষার ফল বের হবার আগের মুহূর্ত অবধি কেবল কল্পনায় বাজী মাৎ করেছে। আধখানা বছর স্বপ্ন দেখার পক্ষে প্রচুর সময়। তিন

সপ্তাহ বাদেই আমার ঘরে আর ফুল দেওয়া হতো না, দ্বিতীয় মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে বাথরুমওয়ালা ঘর জুটত না আর, তৃতীয় মাসের শুরু থেকেই স্টেশন থেকে হোটেলের দূরত্ব পৌঁছে গেছে সাত মার্ক-এ, ওদিকে আমার পারিশ্রমিক নেমে এসেছে তিন ভাগের এক ভাগে। ব্র্যাণ্ডি নয়, জুটছে সস্তা মদ, জিন। সুন্দর সুসজ্জিত মঞ্চ নয় আর, বদলে ক্লাব—অদ্ভুত সব লোকজন আবছা অন্ধকার ঘরে এসে জমায়েত হতো। সেখানে সেই টিমটিমে আলোর স্টেজে আমি শুধু ত্রুটিপূর্ণও নয়, একেবারে জঘন্য সব অঙ্গভঙ্গি করতাম। রেল, পোস্টঅফিস, কাস্টমস্, ক্যাথলিক মেয়েদের কিম্বা ইভাঞ্জেলিক নার্সদের কারও হয়তো কোনও একটা জুবিলী, কি মিলিটারী ট্রেনিং শেষে মাতাল অফিসারদের পদোন্নতির উৎসবের আয়োজনে আমার ডাক পড়ত। আমার অভিনয় দেখে ওরা ঠিক হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারত না। ওখানে আমি আমার শেষ মূকাভিনয় 'উকিল বাবু' করতাম। গতকাল বোখুম-এ ছোটদের সামনে চ্যাপলিন-এর নকল করে হাঁটতে গিয়ে আছাড় খাই, তারপর আর উঠে দাঁড়াতে পারি নি। এমনকি কেউ সিটিও মারে নি, কেবল একটু আহা-উঁহু গুঞ্জন উঠেছিল—ওরই মধ্যে আমি দাপাদাপি করেছিলাম। শেষে পর্দা পড়তেই আমার টুকিটাকি জিনিসপত্র গুছিয়ে কেটে পড়েছি। মুখের রঙ না মুছেই সোজা এসে উঠেছি হোটেলে। সেখানে আবার এক বিশ্রী ঝামেলা, হোটেলের মালকান আমার ট্যাক্সি ভাড়া দিতে নারাজ। ট্যাক্সিওয়ালা ওদিকে গজ্‌গজ করছে। শেষমেশ আমার ইলেকট্রিক শেভিং মেশিনটা, জমা হিসাবে নয়, ভাড়া হিসেবে দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করি। লোকটা ভাল ছিল, আমাকে একটা পুরো প্যাকেট সিগারেট আর নগদ দুটো মার্ক দিল। আমি জামা-প্যাণ্ট পরা অবস্থাতেই গিয়ে অগোছাল বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বোতলের তলানি গিলে ফেলে বুঝতে পারলাম, গত কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রথম, আমার বিষাদ আর মাথাধরা সম্পূর্ণ সেরে গেছে। বিছানায় পড়ে রইলাম, মনে হল এভাবেই আমার জীবনটা শেষ হবে—মাতাল অবস্থায় খানায় পড়ে মরব আমি। একটুখানি মদের জন্য আমি আমার জামাটাও দিতে রাজী ছিলাম। কিন্তু ওই দেওয়া-নেওয়া-ঝামেলার কথা ভেবেই সে চিন্তা দূর করলাম। চমৎকার ঘুমোলাম। গভীর ঘুম, স্বপ্নে ভরা। স্বপ্নে স্টেজের ভারি পর্দাটা আমার মৃতদেহকে পুরু কাপড় হয়ে ঢেকে দিল—যেন একটা অন্ধকার স্বাচ্ছন্দ্য। ওই ঘুম আর স্বপ্নের মধ্যেও কিন্তু ঘুম ভেঙে যাবে ভয় হচ্ছিল। মুখে তখনও রঙ মাখা, ডান হাঁটুটা ফুলে উঠেছে।

সস্তা একটা ট্রের ওপর জঘন্য ব্রেকফাস্ট, কফির পটটার পাশে একটা টেলিগ্রাম, আমার দালাল পাঠিয়েছে—'কোবলেনৎস্ এবং মাইনৎস্ প্রদর্শনী বাতিল করেছে। সন্ধ্যায় বন্-এ টেলিফোন করছি।—ৎসোনেয়ারার।' একটু পরে এল গত সন্ধ্যার প্রদর্শনীর কর্মকর্তার ফোন। এই প্রথম জানতে পারলাম, লোকটি একটি খ্রীস্টান প্রতিষ্ঠানের হোমরা-চোমরা। 'কোস্টার্ট বলছি', সে বলল টেলিফোনে, ঠাণ্ডা ভারিক্কি গলা—'মিঃ শ্নীয়ার, আপনার সঙ্গে লেনদেনের ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে নিতে চাই।'

'বেশ তো', আমি বললাম, 'সে তো ঠিকই আছে।'

'তাই বুঝি?' বলল সে। আমি চুপ। তারপর যখন সে আবার কথা বলল তখন তার টুনকো গাম্ভীর্য আর নেই, যেন প্রতিহিংসায় মারমুখো হয়ে উঠেছে। 'আমরা একজন ক্লাউনকে একশো মার্ক দেব ঠিক করেছিলাম, যে এক সময় দুশো মার্ক পাবার যোগ্য ছিল'—একটু সময় অপেক্ষা করলো, মনে হয় আমাকে রেগে ওঠবার সুযোগ দেবার জন্য, আমি কিন্তু চুপ করেই রইলাম, আর সে, আসলে তার যেমন প্রকৃতি তেমনি কুৎসিতভাবে বলল, 'আমি একটা উন্নয়ন সংস্থার কর্তাব্যক্তি। আমার মতে একজন ক্লাউনকে, যাকে কুড়ি মার্ক দেওয়াই যথেষ্ট, বলা যায়, দিলে বড্ড বেশীই দেওয়া হল মনে হবে, তাকে একশো মার্ক দিতে আমার বাধছে।' আমার নীরবতা ভাঙবার কোনও কারণই আমি দেখলাম না। একটা সিগারেট ধরালাম, আরও এক কাপ ঐ জঘন্য কফি ঢাললাম আর ফোন্-এ তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে থাকলাম। সে বলল, 'শুনছেন?' 'শুনছি' বলে আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। চুপ করে থাকা একটা দারুণ অস্ত্র। আমার স্কুল জীবনে হেড মাস্টারের ঘরে বা অন্য কোথাও ডাক পড়লে আমি চুপ করেই থাকতাম। আমার জ্বালায় ফোন্-এর ওপাশে সেই খ্রীস্টান কোস্টার্ট মশাই তখন ঘেমে উঠেছেন। আমার ব্যাপারে দুঃখিত হবার মত উদারতা ওর ছিল না, তবে ওর নিজেরই যেন একটু নিজের ওপর দয়া হল, অবশেষে বিড়বিড় করে বলল, 'একটা কিছু বলবেন তো, মিঃ শ্নীয়ার।'

'মন দিয়ে শুনুন, মিঃ কোস্টার্ট', আমি বললাম, 'আমার প্রস্তাবটা শুনুন। একটা ট্যাক্সি নিয়ে স্টেশনে যান, আমার জন্য বন্-এ যাবার একটা ফার্স্টক্লাশ টিকিট কাটুন,—তারপর এক বোতল মদ কিনে হোটেলে চলে আসুন, হোটেলের পাওনাগণ্ডা বখশিস সমেত মিটিয়ে দিন আর একটা খামের মধ্যে স্টেশন অবধি যাবার ট্যাক্সি ভাড়াটা ভরে এখানে রেখে যান। তাছাড়া আমার মালপত্র নিখরচায়

বন্‌-এ পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন, আপনার খ্রীস্টান বিবেকের দোহাই। রাজী?'

হিসেব করল, কাশল, তারপর সে বলল, 'কিন্তু আমি তো আপনাকে পঞ্চাশ মার্ক দিতে চাচ্ছিলাম।'

'ঠিক আছে', বললাম, 'তাহলে আপনি ট্রামে যাতায়াত করুন। তাতে আপনার পঞ্চাশ মার্কের কমেই হবে। রাজী?'

আবার হিসাব করল, বলল, 'আপনার মালপত্র ট্যাক্‌সিতে নিয়ে যেতে পারবেন না?'

'না', বললাম, 'আমার হাঁটুতে খুব চোট লেগেছে। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

মনে হয় ওর খ্রীস্টান বিবেকে কোথায় যেন খুব লাগল। 'মিঃ শ্নীয়ার', মৃদু গলায় বলল সে, 'আমি খুব দুঃখিত, আমি…'। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে মিঃ কোস্‌টার্ট', আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'আমার ভাবতে বেশ ভাল লাগছে যে আমি একটা খ্রীস্টীয় সংস্থার চুয়ান্ন থেকে ছাপান্ন মার্ক বাঁচিয়ে দিতে পারলাম!' আমি লাইনটা কেটে দিয়ে রিসিভারটা পাশে রেখে দিলাম। এই জাতীয় লোকেরা আবার টেলিফোন করে অনর্থক ঘ্যানঘ্যান করে। তার চেয়ে বরং ও একা একা ওর বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করুক, সেই ভাল। আমার বিশ্রী লাগছিল। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আমি কেবল বিষাদ আর মাথার যন্ত্রণাতেই ভুগি না, আমার আরও একটা ব্যাপার আছে, প্রায় মিস্টিক একটা ক্ষমতা আছে আমার, আমি টেলিফোনে গন্ধ টের পাই। কোস্‌টার্টের গায়ে লজেন্‌সের কেমন একটা গা গোলানো মিষ্টি গন্ধ। উঠে গিয়ে দাঁত মাজতে বাধ্য হলাম। মদের তলানিটুকু দিয়ে কুলকুচা করলাম, কল্টেস্‌ন্টে মুখের রঙ তুললাম, এবং আবার গিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। মারীর কথা, খ্রীস্টানদের কথা, ক্যাথলিক-দের কথা ভাবতে লাগলাম, শেষে আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকলাম। নর্দমাগুলোর কথাও মনে পড়ল, ওখানেই হয়তো একদিন গড়াগড়ি খেতে হবে। পঞ্চাশের কাছাকাছি পৌঁছলে একজন ক্লাউনের সামনে দুটো পথ খোলা থাকে—নর্দমা কিম্বা প্রাসাদ। কিন্তু প্রাসাদের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ ছিল না। ভাবছিলাম পঞ্চাশে পৌঁছতে আরও বাইশটা বছর কোন মতে আমাকে পার হতে হবে। আসল কথা, কোবলেনৎস্‌ আর মাইন্‌ৎস্‌ যেটাকে নাকচ করেছে ৎসোনেরারার সেটাকেই হয়তো 'প্রথম সাবধানবাণী' বলত। তা ছাড়া যেটাকে আগে আমি হিসেবের মধ্যেই ধরি নি আমার সে

গ্ৰেণ্টার কথাও মনে পড়ল। সেটা হচ্ছে আমার আলস্য। আর বন্-এও তো নর্দমা আছে, তা ছাড়া পঞ্চাশ অবধি অপেক্ষা করতেই হবে তাই বা কে বলেছে?

মারীর কথা মনে পড়েছিল, ওর গলার স্বর, ওর বুক, ওর হাত আর চুল, ওর অঙ্গ-ভঙ্গি এবং সমস্ত কিছু,—যা আমরা দুজনে মিলে করেছি। মারী যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল সেই৺স্যুফনার-এর কথাও মনে পড়ছিল। ছোটবেলা থেকেই আমরা পরস্পরকে চিনতাম, এত ভাল চিনতাম যে পরে বড় হয়ে পরস্পর 'আপনি' না 'তুমি' বলবো তা বুঝে উঠতে পারি নি। কথা বলতে গেলেই আমরা মুশকিলে পড়েছি, আর যতবারই আমাদের দেখা হয়েছে, ওই মুশকিল-টাকে এড়িয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হয় নি। আমার মাথায় ঢুকছিল না মারী কি করে ঐ লোকটার দিকেই ঝুঁকল, মারীর ব্যাপার-স্যাপার বোধ হয় কোনদিনই আমার মাথায় ঢোকে নি।

আমাকে এই চিন্তার ঘোর থেকে কোস্টার্ট এসে জাগিয়ে তুললে আমি ভীষণ চটে গিয়েছিলাম। কুকুরের মতন দরজা আঁচড়াচ্ছিল সে আর বলছিল, 'মিঃ শ্নীয়ার, আমার একটা কথা শুনুন। আপনার কি ডাক্তার দরকার?' 'আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন তো', আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'খামটা দরজার তলা দিয়ে ঠেলে দিয়ে বাড়ি চলে যান।'

সে খামটা দরজার তলা দিয়ে ঠেলে দিল। আমি উঠে গিয়ে সেটা খুললাম। দেখি, বোখুম থেকে বন্ অবধি একটা সেকেণ্ড ক্লাশ টিকিট আর ট্যাক্সি ভাড়াটা একেবারে টায় টায় হিসেব করা—সাড়ে ছ' মার্ক। আমি ভেবেছিলাম ওটা বোধ হয় দশ মার্ক করে দেবে। তা ছাড়া আমি মোটামুটি হিসেবও করে রেখেছিলাম, ফার্স্টক্লাশের টিকিট ফেরত দিয়ে একটা সেকেণ্ড ক্লাশের নিলে বাদসাদ দিয়েও কতটা পয়সা বাঁচবে। আমার হিসেবে প্রায় পাঁচ মার্ক মতো হতো তাতে। 'ঠিক আছে?' বাইরে থেকে ও জিজ্ঞাসা করল। 'হ্যাঁ' বললাম, 'এবার নিজের রাস্তা দেখুন, জঘন্য খ্রীস্টান আপদ'—'মাপ করবেন', ও কি একটা বলতে গেল। আমি হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম, 'রাস্তা দেখুন।' খানিকটা সময় চুপচাপ কাটল, তারপর ওর সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাবার শব্দ পেলাম। আজকের জগতের শিশুরাও এইসব 'আলোকের সন্তানদের' চেয়ে বুদ্ধিমান। কেবল তাই নয়, অনেক বেশী উদার, অনেক বেশী মুহৎও বটে। সিগারেট আর মদের জন্যে কিছু পয়সা বাঁচাতে আমি ট্রামে গেলাম স্টেশন অবধি। গতকাল সন্ধ্যায় বন্-এ মনিকা সিল্‌ভস্-এর নামে একটা টেলিগ্রাম

পাঠাতে দিয়েছিলাম হোটেলের মালকানকে। মহিলাটি সেই খরচটা আমার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে কারণ কোস্‌টার্ট সে পয়সা দিতে রাজী হয় নি, কাজেই ট্যাক্‌সিতে যেতে পয়সায় কুলোত না। কোবলেন্‌ৎস্‌ আর মাইনৎস্‌ থেকে শো নাকচের খবর পাবার আগেই আমি ঐ টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম। আমি নাকচ করবার আগেই ওরা নাকচ করে দেওয়াতে আমার মনটা খচ্‌খচ্‌ করছিল। 'হাঁটুতে প্রচণ্ড চোট লাগার জন্য 'শো' করা অসম্ভব' জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আমিই যদি 'শো' বাতিল করে দিতে পারতাম খুব ভাল হতো, তবু যা হোক অন্তত মনিকাকে টেলিগ্রাম পাঠান হয়েছে, 'ফ্ল্যাটটা একটু গুছিয়ে রাখবেন।—শুভেচ্ছান্তে হান্‌স্‌।'

২

বন্‌-এ বরাবরই সব অন্য রকম। এখানে আমি কখনো শো করি নি। এখানে আমার বাড়ি। ট্যাক্‌সি ডেকে উঠে বসলে আমাকে সে কখনই কোন হোটেলে নিয়ে যায় নি। পৌঁছে দিয়েছে আমার বাড়িতে। আমার বলা উচিত ছিল আমাদের—মারীকে আর আমাকে। বাড়ির দরজায় কোন দারোয়ান নেই যে টিকিট চেকারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলব। তবু এই বাসাটা আমার কাছে সব হোটেলের চেয়ে অপরিচিত। এখানে আমি বছরে মাত্র তিন থেকে চার সপ্তাহ কাটাই। স্টেশনের বাইরে এসেই ট্যাক্‌সি ডেকে ফেলা আমার এমন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে যে আর একটু হলেই আমি ট্যাক্‌সি ডেকে ফেলেছিলাম আর কি, কিন্তু জোর সামলে গেছি, নইলে কী আহাম্মকটাই না বনে যেতাম। আমার পকেটে তখন একটি মাত্র মার্ক। দু'মুহূর্তের জন্যে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আমি চাবিগুলো ঠিক আছে কিনা দেখে নিলাম—বাড়ির দরজার চাবি, ফ্ল্যাটের দরজার চাবি, লেখার টেবিলের চাবি ; লেখার টেবিলে পাব সাইকেলের চাবি। অনেক দিন ধরেই চাবি নিয়ে একটা মূকাভিনয়ের কথা ভাবছি। ভেবেছি আমার কল্পনার চাবির গোছা হবে আইসক্রিমের তৈরি। সেগুলো অভিনয় করার সময় ধীরে ধীরে গলে যাবে।

ট্যাক্সির পয়সা নেই। জীবনে এই প্রথম সত্যি সত্যি একটা ট্যাক্সির দরকার। হাঁটুটা ফুলে উঠেছে। বহু কষ্টে স্টেশনের সামনের চত্বরটা পার হয়ে খোঁড়াতে খোড়াতে পোস্টস্ট্রাসে-তে এসে পড়লাম। স্টেশন থেকে আমাদের বাসাটা মাত্র দু'মিনিটের পথ, মনে হচ্ছিল যেন আর শেষ হবে না। একটা সিগারেট বিক্রির অটোম্যাট-এ হেলান দিয়ে বাড়িটার দিকে তাকালাম। এই ছ'তলা বাড়িরই একটা ফ্ল্যাট আমার ঠাকুর্দা আমাকে দান করেছে। চমৎকার সাজানো ফ্ল্যাটগুলো, ব্যালকনিগুলো পাঁচ রকম রঙে বেশ মানিয়ে রঙ করা। ছ'তলার ব্যালকনিগুলোতে পোড়া মাটির রঙ। সেখানে আমার ফ্ল্যাট।

আমি কী আমার একটা মূকাভিনয় করছিলাম? বাড়ির দরজায় চাবি ঢোকালাম, দরজা খুলে গেল। চাবি গলে পড়ল না। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। লিফটের দরজা খোলাই ছিল। ছ' নম্বর বোতাম টিপলাম। একটা হালকা শব্দ আমাকে ওপরের দিকে নিয়ে চলল। লিফটের ছোট্ট জানালা দিয়ে প্রত্যেক তলার মাঝখানকার জানালা দেখা যায়। তার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় একটা স্মৃতিস্তম্ভের পেছন দিক, একটা চত্বর একটা গির্জা—যেন আলো ঝলমল ফ্রেমে বাঁধানো। তারপর একটা অন্ধকার অংশ, কংক্রীটের সীলিং আবার সামান্য ভিন্ন কোণে সেই ঝলমলে আলোর ফ্রেমে বাঁধানো স্মৃতিস্তম্ভের পেছন, চত্বর, গির্জা এ রকম তিনবার। চতুর্থবার কেবল চত্বর আর গির্জা। ফ্ল্যাটের দরজায় চাবি ঢোকাতে দরজা খুলে গেল—এটাও খুলবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমার ফ্ল্যাটের সব কিছুই পোড়ামাটি-রঙ-এর। দরজা, দেয়াল আলমারি—সব। কালো সোফার ওপর পোড়ামাটি রঙের অ্যাপ্রনপরা একটি মহিলাকে সুন্দর মানাত। সেই রকম একজন থাকাটাই স্বাভাবিক। আমার কেবল বিষাদ, মাথার যন্ত্রণা, আলস্য আর সেই টেলিফোনে গন্ধ পাওয়ার মিস্টিক ক্ষমতাই নয়, আরও একটা অসহ্য ব্যাপার আছে। আমি একপত্নিত্বে বিশ্বাসী। আমার একটিমাত্র মহিলা আছে, তার নাম মারী। পুরুষরা নারীদের সঙ্গে যা যা করে আমি কেবল তার সঙ্গেই সে-সব-কিছু করতে পারি। মারী আমাকো ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে একজন ক্যাথলিক পাদ্রীর যে-জীবন যাপন করা উচিত আমি সেই জীবনই যাপন করে চলেছি। তফাতটা কেবল এই যে আমি ক্যাথলিক পাদ্রী নই। আমি একবার ভেবে দেখেছিলাম, আমার পুরোনো স্কুলের প্যাস্টর-এর কাছে উপদেশ চাইতে গ্রামে চলে যাব কিনা; কিন্তু এই ভাঁড়গুলো সবাই ভেবে বসে আছে, পুরুষমাত্রেই বহুপত্নিত্বকামী, তাই তারা

এক-পত্নী-প্রথার ওপরে এত জোর দেয়। সুতরাং ওরা আমাকে একটা অদ্ভুত জীব বলে ধারণা করে বসবে, মনে করে বসবে, আমি সেই রাজ্যের জীব যেখানে ভালবাসা, ওদের মতে, পয়সা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায়। ওরা আমাকে সেই ধারণা ভিত্তি করেই উপদেশ দেবে। প্রোটেস্‌ট্যানট্‌দের ব্যাপারে আমি এখনও অবাক হই, যেমন ওই কোস্‌টার্ট—লোকটা আমাকে সত্যি সত্যি অবাক করেছে। কিন্তু ক্যাথলিকদের নিয়ে আমার আর বিস্মিত হবার কিছু নেই। ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে, ওই ধর্মের ব্যাপারটা আমি বুঝতেও পারি ভাল। সেই যখন চার বছর আগে মারী আমাকে প্রথম ওই 'প্রগতি-শীল ক্যাথলিক চক্রে' নিয়ে যায়, তখন থেকে। মারী আমাকে আমার উপকারের জন্যই বুদ্ধিমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছিল। ওর মনে মনে একটা সাধ ছিল—আমি হয়তো কোনদিন ক্যাথলিক হব (সব ক্যাথলিকের মনের পেছনে ওই ধরনের একটা মতলব থাকে)। ওই চক্রে আমার প্রথম যোগ দেওয়ার অভিজ্ঞতাটা বড় করুণ। তখনও বাইশ পেরোই নি। ক্লাউন হয়ে ওঠার শিক্ষায় সে-সময়টা ছিল আমার সবচেয়ে কঠিন পর্যায়। সারাদিন কেবল মহড়া দিই আর সন্ধ্যের দিকে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে যাই। তাই সেদিনের সন্ধ্যেটার জন্যে বড় আগ্রহ ছিল মনে মনে। আশা করেছিলাম—একটা ঝলমলে আসর তার সঙ্গে প্রচুর ভাল মদ আর ভাল খাদ্য, নাচ থাকলে তো কথাই নেই। কেননা আমাদের আর্থিক অবস্থা তখন খুব সঙ্গীন, ভালমন্দ সুখাদ্য আমাদের বরাতে জুটত না। কিন্তু ওখানেও সেদিন কোন প্রত্যাশা মিটল না। ওরা দিল অত্যন্ত বাজে মদ, তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারটাই আমার মনে হয়েছিল এক বিরক্তিকর প্রফেসারের পরিচালনায় সমাজতন্ত্রের সেমিনারের মত। ওটা শুধু ক্লান্তিকরই ছিল না, কেমন যেন অনাবশ্যক আর অবাস্তব মনে হয়েছিল। প্রথমে ওরা সবাই মিলে প্রার্থনা করল। আর প্রার্থনার সেই গোটা সময়টাই বসে বসে অস্থির হয়ে ভাবলাম—হাত দুটো কোথায় রাখি, মুখটাই বা কোন দিকে ফেরাই। আমার মতে এ জাতীয় অধিবেশনে একজন অবিশ্বাসীকে ডেকে এনে এমন বে-আবরু করা আদৌ উচিত নয়। ওদের সেই প্রার্থনার গানে প্রচলিত 'হে প্রভু…' কি 'আভে মারিয়া' গোছের কিছু ছিল না। ওটা তাহলে আমার পক্ষে খুবই যন্ত্রণাদায়ক হতো। প্রোটেস্‌ট্যানট্‌দের মধ্যে বড় হয়েছি, এ জাতীয় প্রার্থনা আমার একদম অসহ্য। ওদের প্রার্থনাটা ছিল বেশ সময়মাফিক—এক কিংকেল-এর লেখা—'এবং তোমার কাছে প্রার্থনা, আমাদের শক্তি দাও,

ঐতিহ্যপরায়ণ কি প্রগতিশীল সকলের প্রতিই যেন সমান সুবিচার করতে পারি।' ইত্যাদি। তারপরেই শুরু হল, সেদিনের সন্ধ্যার নির্দিষ্ট আলোচনা। বিষয়, 'আমাদের এই সমাজের দারিদ্র্য'। আমার জীবনে সবচেয়ে মর্মান্তিক ওটা। আমি ভাবতেই পারি না ধর্মীয় আলোচনা এমন ক্লান্তিকর হতে পারে। আমি জানি, 'রক্তমাংসের পুনরভ্যুত্থান এবং অনন্ত জীবন' বিষয়ক ধর্মে বিশ্বাস করা শক্ত। অনেক সময় মারী আমাকে বাইবেল পড়ে শোনাত। ও-গুলো বিশ্বাস করা সত্যি অসম্ভব। পরবর্তীকালে আমি কীরকেগার্ডও পড়েছি। ওটা উঠতি ক্লাউনের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য। দেখেছি, বিষয়টা কঠিন কিন্তু ক্লান্তিকর নয়। জানি না এমন লোকও আছে কিনা, যারা টেবিলক্লথ সেলাই করতে পিকাসো বা ক্লের নকসা ব্যবহার করে। সেদিন সন্ধ্যায় মনে হয়েছিল, এই প্রগতিশীল ক্যাথলিকরা টমাস ফন আকুইন, ফ্রানৎস্ ফন আসিস্, বনাভেন্টুরা আর ত্রয়োদশ লেয়োকে নিয়ে কুরুশ দিয়ে অ্যাপ্রন বুনছে। তাতে অবশ্য তাদের দৈন্য চাপা পড়ছিল না। কারণ আমি ছাড়া উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে মাসে অন্তত পনেরো শো মার্ক উপায় করে না। অথচ ওরা নিজেরাই এমন বিব্রত অবস্থায় পেঁছেছিল যে, ওরা শেষমেশ সিনিক আর উন্নাসিক হয়ে পড়েছিল—বাদ ছিল কেবল স্ট্রুফনেয়ার। তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা এত খারাপ লাগছিল যে সে আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়েছিল। আমি লক্ষ্য করেছি, ধোঁয়ায় ওর মুখটা আড়াল হয়ে যেতে ও খুব আরাম বোধ করছিল। কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছিল মারীর কষ্ট দেখে। কিংকেল তখন গল্প শুরু করে দিয়েছে, তার গল্পের লোকটি যখন মাসে পাঁচ শো মার্ক রোজগার করত তখন সে একটু অসুবিধায় পড়ল। যখন তার রোজগার বেড়ে দু' হাজার হল তার দুরবস্থা পেঁছল চরমে। কিন্তু যেই সে মাসে তিন হাজার মার্ক আয় করতে শুরু করল তখন সে দেখল তার অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। লোকটার অভিজ্ঞতার নীতিবাক্য বা হিতোপদেশ হল—'পাঁচ শো মার্ক অবধি একজনের ভালই চলে যায়, কিন্তু পাঁচ শো আর তিন হাজারের মধ্যে দৈন্যটা নিদারুণ। মারী গল্পটা শুনতে শুনতে ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছিল, সে কাঁপছিল।. কিংকেল কিন্তু খেয়ালই করে নি কী অবস্থার সৃষ্টি করেছে সে। সে তার মোটা চুরুটের ধোঁয়া উড়িয়ে, মদের গ্লাস মুখে ঠেকিয়ে, চীজের ঝুরিভাজা চিবোতে চিবোতে পরম আনন্দে গেঁজিয়ে চলেছে। সে বক্তৃতা করছিল—বারো হাজার মার্কের একটা গাড়ি চার হাজার পাঁচশো মার্কের গাড়ির চেয়ে সস্তা…তার বক্তৃতায়

বিরক্ত হয়ে এমন কি চক্রের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা প্রেলেট সম্মারহিল্‌ড-ও চেষ্টা করল তাকে অন্য প্রসঙ্গে টেনে নিতে। তিনিই প্রতিক্রিয়া শব্দটা উচ্চারণ করে থাকবেন ওই বক্তৃতার মাঝখানে। শুনে ঢোঁকটা গিলে ফেলেছিল কিংকেল, মানে রেগেমেগে সে বক্তৃতার মাঝখানেই চুপ মেরে গিয়েছিল। সবাই তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এমন কি তার যে স্ত্রী স্বামী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সবাইকে বিরক্ত করে ছাড়ত সেও বড় করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা।

এই প্রথম এ ফ্ল্যাটটাতে আমার বলতে গেলে বেশ আরামই লাগছিল। মিষ্টি গরম আর পরিচ্ছন্ন। আমার ওভারকোটটা হ্যাঙ্গারে ঝোলাবার সময় আর গীটারটা কোণে রাখতে গিয়ে ভাবছিলাম, সত্যি সত্যি বোধহয় একটা ফ্ল্যাট শুধু আত্মপ্রসাদের চেয়ে আরও একটু বেশী কিছু। আমি এক জায়গায় বেশী দিন থাকতে পারি না, কোনও দিন পারবও না—এক জায়গায় থাকতে গেলে মারী অস্থির হয়ে উঠত আমার চেয়েও আগে। এখন কিন্তু মনে হচ্ছে ও অবশেষে স্থায়ীভাবে কোথাও বাস করবে বলে ঠিক করে ফেলেছে। অথচ কোন জায়গায় যদি আমাকে পেশাগত কারণে এক সপ্তাহের বেশী থাকতে হতো ও-ই সব প্রথম ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠত।

মনিকা সিল্‌ভ্‌স্‌কে টেলিগ্রাম পাঠালে বরাবর যেমন করে এবারও সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছে। বাড়ির দেখাশোনার ভার যার ওপর, তার কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে সব পরিষ্কার করেছে, বসবার ঘরে ফুল রেখেছে, ফ্রিজ ভর্তি করে রেখেছে যাবতীয় জিনিস। রান্নাঘরের টেবিলের ওপর কফি পিষে রেখেছে, তার পাশে এক বোতল ব্র্যান্ডি। বসবার ঘরের টেবিলের ওপর সিগারেট; ফুলদানীর পাশে একটা জ্বলন্ত মোম। মনিকা বেশ মরমী হয়ে উঠতে পারে কিন্তু মাঝে মাঝে রুচিবোধ ওকে ত্যাগ করে। আমার টেবিলের ওপর যে মোমবাতিটা ওটার কথাই ধরা যাক। 'রুচি বিষয়ক ক্যাথলিক চক্র' পরীক্ষা নিলে ওটা কখনই পাশ করত না। মনে হয় তাড়াতাড়ি অন্য মোম পায় নি কিম্বা হয়তো

দামী, সুন্দর মোম কেনবার পয়সা ছিল না। আমি কিন্তু বেশ অনুভব করছিলাম বিশেষ করে এই ক্যাটকেটে মোমটার দরুনই মনিকাকে ভাল লাগাটা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছছে যে, আমার একপত্নীতে নিষ্ঠার সীমা প্রায় আহত হচ্ছে। ওই ক্যাথলিকচক্রের অন্য কোনও সভ্যই কোন সময় এ রকম ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দেবে না, ওরা কখনই ওদের দুর্বলতা প্রকাশ করবে না, নৈতিক দিক থেকে সম্ভব হলেও রুচির দিক থেকে অসম্ভব। মনিকা যে সেন্ট ব্যবহার করে সেটা কিন্তু ওকে ঠিক মানায় না, কি যেন জিনিসটা, বোধহয় টাইগা। ফ্ল্যাটের মধ্যে ও-গন্ধটা এখনও আমি পাচ্ছি।

মনিকার মোমবাতি থেকে আমি মনিকার রাখা সিগারেটগুলোর একটা ধরালাম। রান্নাঘর থেকে ব্র্যান্ডির বোতলটা আর ও-ঘর থেকে টেলিফোন ডাইরেক্টরীটা নিয়ে এলাম। টেলিফোনটা তুললাম। সত্যি সত্যিই মনিকা আমার জন্য ওটাও ঠিক করে রেখেছে। টেলিফোনের লাইন দেওয়া আছে। হালকা শব্দটা আমার কাছে উদার হৃদকম্পনের শব্দ বলে মনে হল। এই মুহূর্তে ওই শব্দটা আমার কাছে সমুদ্রের কল্লোলের চেয়ে, ঝড়ের দীর্ঘনিঃশ্বাসের চেয়ে বা সিংহের চাপা গর্জনের চেয়েও ভাল লাগছিল। এই হালকা শব্দের কোথাও লুকিয়ে আছে মারীর স্বর, লেয়োর স্বর, মনিকার স্বর। আমি ধীরে ধীরে ফোনটা নামিয়ে রাখলাম। এই একটিমাত্র অস্ত্রই আমার উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে, আর আমি খুব শিগ্‌গির ওটা ব্যবহার করব। আমার ডান পাটা উঁচু করে তুলে হাঁটুটা লক্ষ্য করলাম। চামড়াটা ওপর-ওপর ছড়ে গেছে, ফোলাটাও তেমন সাংঘাতিক নয়। বেশ খানিকটা ব্র্যান্ডি গ্লাসে ঢাললাম, অর্ধেকটা খেয়ে নিলাম, বাকিটা ঢেলে দিলাম জখম হাঁটুটার ওপর। খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে ব্র্যান্ডির বোতলটা রান্নাঘরে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিলাম। এইবার মনে পড়ল কোস্‌টার্টকে যে এক বোতল মদ দিতে বলেছিলাম তা সে আমাকে দেয় নি। ও নিশ্চয় ভেবেছিল, আমার ভালর জন্যই ওটা দেওয়া ঠিক নয়, আর এভাবেই সেই খ্রীস্টীয় সংস্থার সাড়ে সাত মার্ক বাঁচিয়েছে। আমি ঠিক করলাম ওকে ফোন করে ওটা পাঠিয়ে দিতে বলব। এই কুত্তাটাকে অক্ষতভাবে পালাতে দেওয়া ঠিক হবে না, তাছাড়া-অর্থের প্রয়োজন আমার। গত পাঁচ বছর ধরে আমার খরচের তুলনায় আমি অনেক বেশী রোজগার করেছি, তবুও কিন্তু কিছু উদ্বৃত্ত থাকে নি। আমি অবশ্য হাঁটুটা সেরে উঠলেই আবার ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ মার্ক পর্যায়ে রোজগার করতে পারি। আমার কাছে আসলে তা একই কথা, এইসব অনুষ্ঠানের

দর্শ করা আমার কাছে ঐসব নামজাদা জায়গার চেয়ে ঢের ভাল। কিন্তু দিনে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ মার্ক নিতান্তই কম, হোটেলে ঘরগুলো বড্ড ছোট, মহড়া দিতে গেলে টেবিল চেয়ারে গুঁতো লাগে, তাছাড়া আমার মতে বাথরুম বিলাসিতা নয়। আর, পাঁচটা সুটকেস্ নিয়ে চলতে হলে ট্যাক্সি খরচাও আবশ্যিক। ব্রাণ্ডির বোতলটা আবার ফ্রিজ থেকে বার করে বোতল থেকেই এক ঢোক গিললাম। আমি মদ্যপ নই। মদ খেলে আমি শান্তি পাই, মারী চলে যাবার পর থেকেই এই অবস্থা। অর্থকষ্টেও আমি আর অভ্যস্ত নই, আর প্রকৃতপক্ষে আমার পকেটে যে মাত্র এক মার্ক রয়েছে এবং সেটা বৃদ্ধি পাবার কোনও সম্ভাবনাই নেই অদূরে ভবিষ্যতে, সেকথা ভাবতে আমার অস্বস্তি লাগছে। বিক্রি করবার মত একটিমাত্র জিনিসই আছে, সেটা আমার সাইকেল। কিন্তু যদি আবার রোজগারে নামাই ঠিক করি তবে ওটা আমার একান্তই প্রয়োজন। ওটার সাহায্যে ট্যাক্সি আর ছোটখাট যাতায়াতের পয়সা বাঁচানো যাবে। এই ফ্ল্যাটের মালিকানার সাথে একটা সর্ত জুড়ে দেওয়া আছে, আমি এটা বিক্রি করতে বা ভাড়া দিতে পারব না। প্রকৃত বড়লোকি খেয়াল। সব সময় একটা প্যাঁচ থাকবে। কোনক্রমেই আর ব্র্যাণ্ডি খাব না ঠিক করে বসবার ঘরে টেলিফোন ডাইরেক্টরীটা খুলে বসলাম।

৪

আমি বন্-এ জন্মেছি। এখানকার অনেককেই চিনি। আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত, স্কুলের-জীবনের সহপাঠী, অনেকে আছে এখানে। আমার বাবা-মা আর আমার ভাই লেয়ো এখানে থাকে। হ্যুফনার নিজে ওকে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা দিয়েছে। ও এখন এখানে ক্যাথলিক থিয়োলজী পড়ে। আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে আমাকে একবার দেখা করতেই হবে, ওদের সঙ্গে টাকা-কড়ির হিসেবটা চুকিয়ে ফেলব। এমনও হতে পারে, আমি সে ভার কোন উকিলের ওপরেই ছেড়ে দেব। এ ব্যাপারে এখনও কিছু ঠিক করি নি। আমার দিদি হেনরিয়েটের মৃত্যুর পর থেকে আমার সঙ্গে আমার বাবা-মার সম্পর্কটা আর তেমন নেই। সতেরো বছর হয়ে

গেছে হেনরিয়েটে মারা গেছে। যুদ্ধ যখন শেষ হল ওর বয়স তখন ষোল। সুন্দরী ছিল। একমাথা সোনালী চুল ছিল ওর। বন্ আর রেমাগেন-এর মধ্যে ওর মত টেনিস খেলোয়াড় কেউ ছিল না। সেই সময় সবাই বলত, অল্প বয়সী মেয়েদের স্বেচ্ছায় যুদ্ধের বিমান-প্রতিরোধ বিভাগে যোগ দেওয়া উচিত। হেনরিয়েটে ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারিতে যোগ দিয়েছিল। সবটাই কেমন তাড়াহুড়োর মধ্যে আর এমন হুট্ করে হয়ে গিয়েছিল যে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারি নি। আমি স্কুল থেকে আসছিলাম, ক্যোল্নারস্ট্রাসেটা পার হতে যাব, দেখি হেনরিয়েটে ট্রামে বসে আছে। ট্রামটা তক্ষুনি বন-এর দিকে রওনা হয়ে গেল। আমাকে দেখে ও হাত নেড়েছিল আর হেসেও ছিল। ওর পিঠে একটা ছোট্ট ব্যাগ ঝোলানো ছিল। ওর মাথায় ছিল সুন্দর গাঢ় নীল রঙের একটা টুপি আর গায়ে মোটকা নীল ওভারকোট, কলারের কাছে ফার লাগানো। ওকে আমি আগে কখনও টুপি মাথায় দিতে দেখি নি। ও কখনও টুপি মাথায় দিতে চাইতও না। টুপি মাথায় ওকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। ওকে দেখাচ্ছিল একজন যুবতী মহিলার মত। ভেবেছিলাম, স্কুল থেকে বুঝি ওদের কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে, বেড়াতে যাবার পক্ষে সময়টা অবশ্যই অদ্ভুত। তবে সে সময়ে স্কুলগুলোতে সবই সম্ভব ছিল। মাস্টাররা তো বিমান আক্রমণের আশ্রয়ে বসেও আমাদের অঙ্ক শেখাতে চেষ্টা করত, অথচ তখন আমরা বাইরে কামানের শব্দ শুনছি। ব্রুল, আমাদের মাস্টারমশাই, আমাদের সঙ্গে গান করতেন, গানগুলোকে তিনি প্রশস্তি ও দেশপ্রেমের গান বলতেন। গানগুলো ছিল, 'গৌরবময় দেখ এই দেশ' কিম্বা 'পূবের আকাশে দেখ ঐ উষা' এই ধরনের। রাতে যখন আধঘণ্টামত সময় সব ঠাণ্ডা থাকত, শোনা যেত পায়ের শব্দ। কারা যেন মার্চ করে চলেছে। ইটালীয়ান যুদ্ধবন্দী (স্কুলে আমাদের তখন বোঝান হতো ইটালীয়ানরা আর মিত্রপক্ষ নয়। এখন তারা যুদ্ধবন্দী হিসাবে আমাদের কাজ করছে, আমি কিন্তু ব্যাপারটা আজ অবধি বুঝতে পারি নি), রুশ যুদ্ধবন্দী, বন্দী মেয়েরা, জর্মান সৈন্য—সারা রাত ধরে মার্চ করে চলত তাদের পাগুলো। কী যে ঘটছে কেউই সঠিকভাবে জানত না।

হেনরিয়েটেকে দেখে মনে হয়েছিল সত্যি যেন সে স্কুলের আর সকলের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে। ওদের পক্ষে সবই সম্ভব। কখনো কখনো যখন আমরা দুই বিপদ-সঙ্কেতের মধ্যে ক্লাসে গিয়ে বসতাম, খোলা জানালা দিয়ে শুনতে পেতাম রাইফেলের শব্দ। আমরা ভয় পেয়ে জানালার দিকে তাকালে ব্রুল

মাস্টারমশাই জানতে চাইতেন আমরা ওই শব্দের মানে জানি কিনা। আমরা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছিলাম, আবার একজন পালিয়ে-যাওয়া সৈনিককে জঙ্গলে গুলি করে মারা হল। ব্রুল বলতেন, 'ইহুদী ইয়াংকিদের হাত থেকে আমাদের পবিত্র জর্মান মাটিকে রক্ষা করতে অস্বীকার করলে আরও অনেকের ভাগ্যে এই ঘটনা ঘটবে।' (কিছুদিন আগে তাঁর সঙ্গে আমার আর একবার দেখা হয়েছিল। বুড়ো হয়েছেন। চুল সব সাদা হয়ে গেছে। একটা শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেন। এবং 'অনমনীয় রাজনৈতিক অতীত' সম্পন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত, কারণ তিনি কখনো পার্টিতে যোগ দেন নি। কখনো না!)

যে ট্রামটায় হেনরিয়েটে চলে গেল আমি আর একবার তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লাম। তারপর আমাদের বাগানের মধ্যে দিয়ে বাড়ি ঢুকলাম। বাবা-মা লেয়োকে নিয়ে খাবার টেবিলে বসে গেছে। আমাদের আসল খাবার ছিল পাতলা স্যুপ, আলুসেদ্ধ আর একটা ঝোল, খাওয়ার সময় চুপচাপই ছিলাম। খাবার শেষে একটা আপেল ছিল। আপেল খাবার সময় মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হেনরিয়েটে স্কুলের আর সকলের সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গেল? মা একটু হেসে বললো, "বেড়াতে? বাজে বকছ কেন? বন-এ গেল 'বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ' বাহিনীতে যোগ দিতে। আপেলটা অত মোটা করে ছাড়িও না। দেখ আমি কী করছি", বলে মা সত্যি-সত্যিই আমার প্লেট থেকে আমার ছাড়ান খোসাগুলো নিয়ে চেঁচে চেঁচে, ওই মিতব্যয়িতায় প্রাপ্ত কাগজের মত পাতলা আপেলের চাঁছিগুলো মুখে পুরে দিলে। আমি তখন বাবার দিকে তাকালাম। বাবার তখন প্লেটের দিকে চোখ, কিছুই বললো না। লেয়োও চুপ করে ছিল। কিন্তু আমি আবার মায়ের দিকে তাকাতে মা বললো নরম গলায়, "তুমি এটা মানবে তো যে আমাদের এই পবিত্র জার্মানীর মাটি থেকে ইহুদী ইয়াংকিদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে যথাসাধ্য কর্তব্য করা প্রত্যেকেরই উচিত।" মা আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যে আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। মা সেই একইভাবে তাকাল লেয়োর দিকে, আমার মনে হল, মায়ের যেন একান্ত ইচ্ছে, আমরা দুজনই ইহুদী ইয়াংকিদের সঙ্গে লড়তে নেমে পড়ি। "জার্মানী আমাদের পবিত্র মাটি।" মা বলছিল, "আর ওরা ওদিকে আইফেলে পাহাড়ী পথে ঢুকে পড়েছে।" আমার হাসতে ইচ্ছা করছিল কিন্তু আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। ফলকাটা ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ঢুকেছিলাম নিজের ঘরে। আমার ভয় করছিল। আমি জানতাম কেন, কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারছিলাম না। অভিশপ্ত ওই

আপেলের খোসার কথা ভাবতেই আমার রাগ হচ্ছিল। আমাদের বাগানে, নোংরা বরফে ঢাকা জার্মানীর মাটির দিকে তাকালাম। চোখ তুললাম রাইন-এর দিকে, কাদুনে উইলো ছাড়িয়ে সাতপাহাড়ের দিকে দৃষ্টি পাতলাম, আর এই সমস্ত দৃশ্যই আমার কাছে কেমন নিরর্থক মনে হতে থাকল। ওইসব 'ইহুদী ইয়াংকিদের' কিছু আমি দেখেছিলাম। লরী বোঝাই করে কেনুসবুর্গ থেকে ওদের বন-এর একটা ক্যাম্পে আনা হচ্ছিল। ওদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওরা ঠাণ্ডায় জমে গেছে। ওদের মুখে ভয়ের ছাপ—কত অল্পই না বয়স ওদের! ইহুদীদের সম্বন্ধে যদি আমি আদৌ কোনও ধারণা করতে পারতাম, তাহলে সেইটে হতো বরং ইটালীয়ানদের মত কিছু, ঠাণ্ডায় আমেরিকানদের চেয়েও বেশী কাবু মনে হতো তাদের। তারা এত ক্লান্ত আর অবসন্ন থাকত যে, ভয় পাওয়ার শক্তিও তাদের ছিল না। আমার বিছানার সামনের চেয়ারটাকে একটা লাথি মারলাম। ওটা উল্টে পড়ল না দেখে আবার লাথি মারলাম। তখন ওটা উল্টে গিয়ে আমার বিছানার পাশের ছোট্ট টেবিলটার ওপরে ছিটকে পড়ে তার কাচটা টুকরো টুকরো করে দিলে। নীল টুপি মাথায় হেনরিয়েটে, পিঠে ব্যাগ। ও আর ফেরে নি। আমরা আজও জানি না ওকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ শেষে কে যেন একজন এসে আমাদের খবর দিয়েছিল, ও লেভারকুজেনের কাছে নিহত হয়েছে।

পবিত্র জার্মানীর ভূমি নিয়ে এই উৎকণ্ঠাটা আমার কাছে কেমন যেন হাস্যকর লাগে। বিশেষ করে যখনই মনে পড়ে কয়লাখনির একটা মোটা অঙ্কের শেয়ার গত দুই পুরুষ ধরে আমরা ভোগ করছি। গত সত্তর বছর ধরে এই পবিত্র জার্মানীর মাটি যে-খোঁড়াখুঁড়ি সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে, শ্নীয়ার পরিবার তা থেকে মুনাফা করে আসছে প্রচুর। আর তার দাপটে গ্রাম, জঙ্গল, প্রাসাদ সবই বুলডজারের ঘায়ে ভেঙে পড়ছে জেরিকোর প্রাচীরের মত।

ক'দিন বাদে জানতে পারলাম 'ইহুদী ইয়াংকি' কথাটা সবপ্রথম কে চালু করল। সে আর কেউ নয়, আমার হিটলার, আমাদের কিশোর দলের নেতা হেয়ারব্যার্ট কালিক্; তখন তার বয়স চোদ্দ। আমার মা তাকে আমাদের বাগানে এসে আমাদের গ্রেনেড ছোঁড়া শেখানোর অনুমতি দিয়েছিল দরাজ মনে। আমাদের সে-দলে আমার আট বছরের ভাই লেয়োও ছিল। আমি ওকে একটা অকেজো গ্রেনেড কাঁধে নিয়ে টেনিস লন-এর পাশ দিয়ে হনহন করে যেতে দেখে থামিয়েছিলাম। ওর মুখটা খুব গম্ভীর, একটা

কচি মুখে যতটা গাম্ভীর্য সম্ভব। ওকে থামিয়ে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী করছিস্ তুই এখানে ?' ও সেই গম্ভীর মুখে থমথমে গলায় বলেছিল, 'আমি সৈন্যদলে যোগ দেব, তুই যাবি না ?' 'নিশ্চয়' বলে আমি ওর সঙ্গে টেনিস লন-এর পাশ দিয়ে চাঁদমারির দিকে গেলাম। সেখানে হেয়ারব্যার্ট আমাদের একটা ছেলের গল্প বলল। ছেলেটা মাত্র দশ বছর বয়সেই প্রথম শ্রেণীর লোহার ক্রশ পেয়েছিল। স্লেসিয়েনের ওদিকে কোথায় যেন ছেলেটা তিনটে রুশ ট্যাঙ্ক ঘায়েল করে দিয়েছে। ছেলেদের মধ্যে একজন সেই বীর ছেলেটির নাম জিজ্ঞেস করলে আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম, 'মহামানব' রুবেৎসাল। শুনে হেয়ারব্যার্ট কালিক্-এর মুখটা অদ্ভুত হলদে হয়ে গেল। সে চিৎকার করে উঠল 'তুই একটা জঘন্য হারুয়া।' আমি গাল খেয়ে এক মুঠো ধুলো তুলে ওর মুখে ছুঁড়ে দিলাম, আর সবাই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, শুধু লেয়ো কিছু করে নি, আমাকে সাহায্য করতেও আসে নি, সে কেবল কাঁদছিল। উন্মত্ত হয়ে আমি হেয়ারব্যার্টকে মুখের ওপর চেঁচিয়ে বললাম, 'বেটা নাৎসী শুয়োর।' ওই কথাটা আমি কোথাও পড়েছিলাম, কোন রেলের লেভেল ক্রসিং-এর বেড়ার গায়ে লেখা ছিল। আমি কথাটার মানে জানতাম না, কিন্তু মনে হয়েছিল ওটা এখানে গালি হিসাবে বেশ জুতসই হবে। হেয়ারব্যার্ট কালিক্ সঙ্গে সঙ্গে মারপিট থামিয়ে হঠাৎ আইনমাফিক কাজ শুরু করল। সে আমাকে গ্রেপ্তার করল। আমাকে নিয়ে আটকে রাখা হল চাঁদমারির ছাপড়ায় নিশানার সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে। হেয়ারব্যার্ট গিয়ে আমার বাবা-মা, ব্রুল মাস্টার আর কয়েকজন পার্টির লোককে ডেকে নিয়ে এল। আমি তখন রাগে চিৎকার করছিলাম আর নিশানাগুলোকে সব লণ্ড-ভণ্ড করতে করতে বাইরে যারা আমাকে পাহারা দিচ্ছিল, তাদের 'নাৎসী শুয়োর' বলে বার বার গাল পাড়ছিলাম।

জেরা করার জন্য ঘণ্টাখানেক বাদে আমাকে নিয়ে গিয়ে বসানো হল আমাদের বসবার ঘরে, ব্রুল মাস্টার তখন রাগে গরগর করছিল। সে কেবলই বলছিল, 'গোড়া শুদ্ধ উপড়ে ফেলা দরকার, উপড়ে ফেলা দরকার গোড়া শুদ্ধ। এটাই যোগ্য শাস্তি।' আমি আজ অবধি জানি না, সে ওটা দৈহিকভাবে না মানসিকভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ঠিকানায় এবার তাকে একটা চিঠি লিখব, ঐতিহাসিক সত্যের প্রয়োজনে ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠাব। পার্টির তরফ থেকে যে এসেছিল তার নাম প্রোভেনিষ। সে ছিল 'ডেপুটি

'ডিসট্রিক্ট লিডার', বেশ ভাল ছেলে। বারে বারে বলছিল, 'ভুলে যাবেন না ছেলেটার বয়স বড় জোর এগারো। তার কথার মধ্যে একটা সান্ত্বনার সুর ছিল। আমি তার কথারই জবাব দিচ্ছিলাম। সে জিজ্ঞেস করেছিল কোথা থেকে ঐ সর্বনেশে কথাটা জেনেছি। আমি বলেছিলাম, 'আম্নাব্যারনার স্ট্রাসের রেল গুমটির বেড়ায় পড়েছিলাম লেখাটা।'

'ও-কথা তোমাকে কেউ বলে নি?' জিজ্ঞেস করেছে সে, 'মানে ও কথাটা তুমি কাউকে বলতে শোন নি?'

'না', আমি জবাব দিয়েছি।

'ছেলেটা জানেই না ও কী বলছে।' আমার কাঁধে হাত রেখে বলল আমার বাবা।

ব্রুল তখন বাবার দিকে কঠিন চোখে তাকাল, তারপর বিরতভাবে দৃষ্টি ফেরাল হেয়ারব্যার্ট কালিক্-এর দিকে। বোঝা গেল বাবার কথাটা সে নেহাতই পিতৃস্নেহ বলে মনে করছে। মা ক্রমাগতই কাঁদছিল। সে বোকা বোকা ভাষায় চাপা গলায় বলল, 'ও জানে না ও কি করছে, ও বুঝতেই পারে না…নইলে কবেই আমি ওকে বিদেয় করে দিতাম।'

'বেশ বিদেয় করে দাও না।' আমি জবাব দিলাম।

এ সবই চলছিল আমাদের বিশাল বসবার ঘরে। সেখানে সব গাঢ় রঙ করা ওক কাঠের ভারি ভারি আসবাব, ওক কাঠের উঁচু তাকের ওপরে সাজান শিকার করে পাওয়া ঠাকুর্দার ট্রফিগুলো, ঢাকনাওয়ালা বড় বড় বিয়ার মগ আর মস্ত মস্ত কাঁচের আলমারি ভর্তি বই। এখান থেকে কুড়ি কিলোমিটারও হবে না, আইফেল পাহাড়ের ওদিকে কামানের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, মাঝে মাঝে মেশিনগানের আওয়াজও হচ্ছিল। ফ্যাকাসে-রঙ সুন্দর-চুল হেয়ারব্যার্ট কালিকের মুখে উগ্র উৎসাহের স্পষ্ট ছাপ, উকিলদের ধরনে টেবিল চাপড়ে সমানে তার দাবি জানিয়ে বলছিল, 'শক্ত হতে হবে, শক্ত হতে হবে, দয়া করা চলবে না।' অবশেষে আমার শাস্তি হল হেয়ারব্যার্টের তত্ত্বাবধানে বাগানে একটা বাঙ্কার খোঁড়া। সেই বিকেলেই শ্রীয়ারদের ঐতিহ্য অনুসারে জার্মানীর মাটি খুঁড়তে শুরু করলাম। অবশ্য শ্রীয়ারদের ঐতিহ্য বিরোধী উপায়ে, নিজ হাতে। ঠাকুর্দার প্রিয় গোলাপ বাগানের এধার থেকে ওধার একদম মিনারের মত করে তৈরি এ্যাপোলোর মূর্তিটা অবধি খুঁড়ে চললাম। আমি খুঁড়তে খুঁড়তে কেবল সেই মুহূর্তটার কথা ভাবছিলাম, যখন ঐ মর্মর মূর্তিটা আমার এই খনন উৎসাহের

তলায় ধসে পড়বে। মূর্তিটার কথা ভাবতে আমার খুব ভাল লাগছিল। আমার সেই আনন্দের মুহূর্তটা আসতেও অবশ্য দেরি হল না। আমার কাজটা জর্জ নামে একটা রোদে পোড়া বাচ্চা ছেলেই করে দিলে। ওখানে ভুল করে রাখা একটা গ্রেনেড অজ্ঞাতে ফাটিয়ে ফেলেছিল ছেলেটা তাইতে মূর্তিটা শুধু ও নিজেও উড়ে গেল। এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে হেয়ারব্যার্ট কালিক্-এর মন্তব্যটা খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট। সে বললে, 'ভাগ্য বলতে হবে। গেয়র্গ ছিল অনাথ।'

৫

যাদের সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে, টেলিফোন ডাইরেক্টরি দেখে তাদের নম্বরগুলো খুঁজে বার করে লিখে রাখলাম। যাদের কাছে ধার চাওয়া যেতে পারে তাদের নামগুলো বাঁ দিকে পর পর লিখলাম। কার্ল এমণ্ডস্, হাইনরিখ বেলেন, দুজনেই আমার স্কুলের বন্ধু, একজন এককালে থিয়লজী পড়ত এখন অধ্যাপক, অন্যজন হয়েছেন যাজক, তারপর বেলা ব্রসেন, আমার বাবার প্রেয়সী—ডানদিকে লিখলাম আরও ক'জনের নাম, যাদের কাছে অন্য কোনও উপায় না থাকলে ধার চাইতে পারি—আমার বাবা-মা, লেয়ো (ওর কাছে ধার চাওয়া যায়, কিন্তু ওর হাতে কখনও কিছু জমা থাকে না, সব খরচ করে ফেলে, ক্যাথলিক চক্রের সভ্যদের নাম—কিংকেল ফ্রেডেবয়েল, ব্লোথার্ট, সম্মারহ্বিল্ড। এই দুই নামের সারির মাঝখানে, মনিকা সিল্ভস্। ওর নামের চারপাশ ঘিরে একটা সুন্দর নক্সা এঁকে ফেলেছিলাম। আমাকে ফোন করবার জন্য অনুরোধ করে কার্ল-এমণ্ডস্কে একটা তার করতে হল। ওর টেলিফোন নেই। মনিকাকে সবচেয়ে আগে ফোন করতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু ওকেই সব শেষে ফোন করতে হবে। আমাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা এমন যে, শারীরিক ও মানসিক উভয় তরফ থেকেই তাকে বিরত করা অভদ্রতা হবে। আমার একটা নিদারুণ পরিস্থিতি হচ্ছে, আমি একজন একপত্নীত্ববাদী—ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও মারী আমাকে ত্যাগ করে যাবার পর থেকে স্বতঃই ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন করছি। মারী বলেছে সে নাকি আমাকে ত্যাগ করেছে 'মনস্তাত্ত্বিক আতঙ্কে'। আসলে

বোখুম-এ আমি অনেকটা ইচ্ছা করেই আছাড় খেয়েছি। ইচ্ছা করেই হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে পড়েছি যাতে করে সফরটা বাতিল হয় আর আমি বন্‌-এ আসতে পারি। মারীর ধর্মপুস্তকে যাকে ভুল করে বলে 'রক্ত-মাংসের ক্ষুধা' আমি ভেতরে ভেতরে তারই অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগছিলাম। মনিকাকে আমার এত ভাল লাগে যে, অন্য কোনও স্ত্রীলোকের পিপাসা তাকে দিয়ে মেটানো যায় না। ওই সব ধর্মপুস্তকে 'স্ত্রীলোকের প্রতি আকর্ষণ কথাটা' থাকলেই যথেষ্ট স্পষ্ট হতো। যদিও 'স্ত্রীলোকের প্রতি আকর্ষণ' কথাটা যথেষ্ট খারাপ তবু ওটা 'রক্ত-মাংসের ক্ষুধার' চেয়ে অনেক ভাল হতো। কসাইখানা ছাড়া আমি রক্ত-মাংস বলতে আর কিছু বুঝি না, তাও অবশ্য যথেষ্ট মাংসল নয়। যখনই ভাবি, মারীর যে ব্যাপারটা একমাত্র আমার সঙ্গেই করার কথা তা ৎস্যুফ্‌নার-এর সঙ্গে করছে, আমার বিষাদ হতাশায় দিশেহারা হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে শেষমেশ ৎস্যুফ্‌নার-এর টেলিফোন নম্বরটাও খুঁজে বার করলাম। এবং যাদের কাছে ধার চাইব না ঠিক করেছি তাদের নামের নিচে নামটা লিখে রাখলাম। মারী আমাকে অর্থ সাহায্য করবে, চাইবামাত্রই দেবে, ওর যা আছে সব দেবে। ও আমার কাছে আসবে, পাশে এসে দাঁড়াবে। বিশেষ করে যদি জানতে পারে আমি কেবল একটার পর একটা দুর্ভাগ্যের পাল্লায় পড়ছি ; কিন্তু ওতো একা আসবে না।

ছ'বছর অনেকটা সময়, তাছাড়া ওর ৎস্যুফ্‌নার-এর বাড়িতে থাকবার কথা নয়। তার ব্রেকফাস্ট টেবিলেও না, না তার বিছানায়। মারীর জন্য আমি লড়াই করতেও রাজী আছি, যদিও লড়াই শব্দের মধ্যে ওই যে দৈহিক শক্তি প্রয়োগের ভাবটা আছে ওতে করেই আমার মতটা পালটে যায়। হাস্যকর, ৎস্যুফ্‌নার-এর সঙ্গে মারামারি! আমার মা আমার কাছে যে-অর্থে মৃত, মারী এখনও আমার কাছে সে-অর্থে ততটা মৃত নয়। আমার মনে হয়, বেঁচে যারা আছে তারাই মৃত আর মৃতেরা জীবিত। অবশ্য যে অর্থে ওই ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যাণ্টরা বিশ্বাস করে সে-অর্থে নয়। আমার কাছে একটা ছেলে, যেমন ওই জর্জ যে গ্রেনেড ফেটে মারা গেল সে আমার মায়ের চেয়ে বেশী জীবিত। আমি দেখতে পাই রোদে-পোড়া বিচ্ছিরি চেহারার ছেলেটা বাগানের ওই এ্যাপোলো মূর্তির সামনে, শুনতে পাই হেয়ারব্যার্ট কালিক-এর চিৎকার। 'ওভাবে ছুঁড়ো না, ওভাবে না—' বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাই, বেশী না, দু' চারটে চিৎকার, তারপর কালিকের মন্তব্য, 'ভাগ্য বলতে হবে। গেয়র্গ ছিল

অনাথ,' তারপর আধঘণ্টা বাদে রাতের খাওয়ার টেবিলে, যে-টেবিলটাতে বসে আমার বিচার করা হয়েছিল, আমার মা লেয়োকে বলেছিল, 'তুমি ওই বেকুবটার চেয়ে ভাল কাজ করবে, তাই না!' লেয়ো মাথা নেড়েছিল, আমার বাবা তাকিয়েছিল আমার দিকে, তার দশ বছরের ছেলেটার চোখে সে কোন সান্ত্বনা খুঁজে পেল না।

ইতিমধ্যে আমার মা বেশ ক'বছর হলো 'জাতি বৈষম্য দূরীকরণ সমিতির' কেন্দ্রীয় সভার সভানেত্রী; আমস্টারডাম-এ আন্নে ফ্রাঙ্কহাউসে যায়, সুযোগ পেলে যায় আমেরিকায়ও, সেখানে আমেরিকান মহিলা সমিতিতে বক্তৃতা দেয়। বিষয় 'জার্মান যুবকদের অনুশোচনা।' এখনও সেই মিষ্টি, সরল গলা। হয়ত ওই রকম গলাতেই হেনরিয়েটেকে বিদায় দেবার সময় বলেছিল, 'ভাল থেক, বাছা।' এ-গলা আমি যে-কোন সময়ে টেলিফোনে শুনতে পারি, হেনরিয়েটের গলা আর কখনও শুনব না। ওর গলার স্বরটা ছিল আশ্চর্য রকমের ভারি আর হাসিটা হাল্কা। একবার এক টেনিস ম্যাচ খেলতে খেলতে ও হাত থেকে ব্যাটটা ফেলে দেয়, আর ঠায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন স্বপ্ন দেখছে। আর একবার খেতে বসে চামচটা সুপের মধ্যে ফেলে দেয়; আমার মা চেঁচিয়ে উঠেছিল, জামায় আর টেবিল ক্লথে দাগ ফেলবার জন্য গাল দিচ্ছিল; হেনরিয়েটে সে সব কিছুই শুনতে পায় নি, তারপর যখন ওর ঘোর কেটে গেল, চামচটা সুপের থেকে তুলে নিয়ে ন্যাপকিনে মুছে আবার খেতে শুরু করল। যখন তৃতীয়বার, চিমনির ধারে বসে তাস খেলতে খেলতে ওর ওই রকম অবস্থা হল, আমার মা বেশ রেগে গিয়েছিল। চিৎকার করে বলে উঠেছিল, 'ওই অবাস্তব স্বপ্ন দেখা ছাড় তো', হেনরিয়েটে মায়ের দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, 'কী হয়েছে কী? আমার আর খেলতে একদম ভাল লাগছে না', বলে ওর হাতের তাসগুলো চিমনির আগুনে ফেলে দিয়ে উঠে গেছে। আমার মা তাসগুলো আগুনের ভেতর থেকে তুলে আনতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছিল। হরতনের সাতটা ছাড়া আর সব ক'টাই উদ্ধার করতে পেরেছিল মা। ওটাই কেবল পুড়ে গিয়েছিল। আমরা তার পরে তাস খেলতে বসে কখনো হেনরিয়েটের কথা না ভেবে পারি নি, যদিও মা এমন ভান করত যেন কিছুই হয় নি কখনো।' আমার মা মানুষটা খারাপ নয়, শুধু কেবল কেমন যেন একটু নির্বোধ আর অসম্ভব মিতব্যয়ী, আমি বুঝতে পারি না কেন। এক জোড়া নতুন তাস কেনা হোক এটা মা কিছুতেই সহ্য করবে না। আমার মনে হয় ওই

পোড়া হরতনের সাতটা এখনও আছে, আর পেশেন্স খেলবার সময় হাতে যখন ওটা আসে তখন মায়ের কিছু মনে পড়ে বলে আমার মনে হয়না। হেনরিয়েটেকে টেলিফোন করতে খুব ইচ্ছা করছিল, কিন্তু আমাদের ধর্মযাজকরা এরকম একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও আবিষ্কার করতে পারে নি। আমাদের বাড়ির টেলি-ফোন নম্বরটা আমি কেবলই ভুলে যাই। ডাইরেক্টরি দেখে ওটা বার করলাম—শ্নীয়ার, আলফন্স, ডঃ জেনারেল ডাইরেক্ট। ডঃ-টা আমার কাছে নতুন। এটা হয়ত একটা অনারারি ডিগ্রী। নম্বরটা ডায়াল করতে করতে আমি মনে মনে বাড়ি চলে গেলাম, কোবলেন্ৎসার স্ট্রাসে হয়ে এবার্টআল্লেতে পড়ে বাঁ দিকে রাইন-এর দিকে। হেঁটে গেলে প্রায় একঘণ্টা। ঝি-এর গলা শুনতে পেলাম—

'ডঃ শ্নীয়ারের বাড়ি।'

বললাম, 'মিসেস শ্নীয়ারের সাথে কথা বলতে চাই।'

'কে কথা বলছেন?'

বললাম, 'শ্নীয়ার, হান্স শ্নীয়ার। 'ও, ওই মহিলার পুত্র স্বয়ং।' মেয়েটা ঢোক গিলল, এক মুহূর্ত ভেবে নিল, আর আমি এই ছয় কিলোমিটার লম্বা তারের মধ্যে দিয়ে অনুভব করতে পারলাম যে, ও ঠিক রাজী নয়। ওর গায়ের গন্ধটা কিন্তু বেশ, শুধু সাবান আর একটুখানি টাট্‌কা নখপালিশ-এর গন্ধ। বোঝা গেল সে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল, তবে আমার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন নির্দেশ ও পায় নি। বোধ হয় কেবল আবছা গুজব শুনেছে—এ বাড়ির কেউ না, ছন্নছাড়া।

'নিশ্চিন্ত হতে পারি কী?' জিজ্ঞেস করল সে শেষ পর্যন্ত, 'এটা কোন ঠাট্টা নয় তো?'

'আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন', বললাম আমি, 'দরকার হলে আমার মায়ের চেহারার বিশদ বর্ণনাও দিতে রাজী আছি। মুখের নীচে বাঁ দিকে জন্মদাগ একটা, একটা আঁচিল—'

মেয়েটা হাসল, বলল, 'ঠিক আছে।' সে লাইন দিল। আমাদের টেলিফোনটা বেশ ঝঞ্ঝাটে। আমার বাবার একারই আছে তিনটে আলাদা—একটা লাল, সেটা কয়লাখনি সংক্রান্ত, একটা কালো সেটা শেয়ার সংক্রান্ত আর একটা ব্যক্তিগত, সেটা সাদা। আমার মায়ের মাত্র দুটো, কালোটা জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সমিতির সেন্ট্রাল কমিটির, সাদাটা ব্যক্তিগত কাজের জন্য। যদিও আমার মায়ের ব্যাঙ্কের পাশ বই-এ ছয় অঙ্কের একটা সংখ্যা রয়েছে তবুও

টেলিফোনের বিল এবং আমস্টারডাম বা অন্য কোথাও যাতায়াতের খরচা কাটা যায় সেন্‌ট্রাল কমিটির টাকা থেকে। টেলিফোন অপারেটার ভুল কানেকশান দিয়েছিল। আমার মা গম্ভীরভাবে কালো টেলিফোনে বলল, 'জাতিগত মিলন সমিতির সেন্‌ট্রাল কমিটি।'

আমি কথা হারিয়ে ফেললাম। যদি বলত, 'মিসেস শ্নীয়ার বলছি', হয়ত আমি বলতাম, 'আমি হান্স, কেমন আছ মা?' তা না বলে বললাম, 'ইহুদী ইয়াংকিদের সেন্‌ট্রাল কমিটির একজন প্রতিনিধি বলছি, দয়া করে আমাকে আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে দিন।' আমি নিজেই চমকে উঠলাম। মায়ের চিৎকার শুনলাম, তারপর শ্বাস—দীর্ঘশ্বাস মত ফেলল। আমি তাতে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম মায়ের আমার বয়স হয়েছে। বলল, 'ও-কথা তুই কোনদিন ভুলতে পারবি না, তাই না?' আমার নিজেরও তখন প্রায় কেঁদে ফেলবার অবস্থা, বললাম, 'ভুলব, তাই বুঝি উচিত, মা?' মা চুপ করে গেল, আমি শুনতে থাকলাম এক বয়স্কা মহিলার কান্না, যা আমার অত্যন্ত বিচ্ছিরি লাগে। পাঁচ বছর হল মায়ের সঙ্গে দেখা নেই, মায়ের বয়স যাটের ওপরে হবার কথা। একবার আমার সত্যি সত্যিই মনে হল, মা বুঝি হেনরিয়েটের সঙ্গে কানেকশান দিচ্ছে। মা তো সবসময়ই বলে, স্বর্গের সঙ্গে তার হয়ত একটা ব্যক্তিগত লাইন আছে। ঠাট্টা করেই বলে অবশ্য, আজকাল যেমন লোকে বলে, পার্টিতে লাইন আছে, ইউনিভার্সিটিতে লাইন আছে। টেলিভিশান দপ্তরে কিম্বা স্বরাষ্ট্র দপ্তরে আছে।

হেনরিয়েটের গলা শুনতে খুব ইচ্ছা করছিল, এমন কি যদি স্রেফ 'কিস্‌মুনা' বলত কিম্বা 'শালা'। ওর মুখে ওটা আদৌ কুৎসিত শোনাত না। যেমন একবার যখন শ্নীৎস্‌লার ওর মিস্টিক ক্ষমতার কথা বলছিল তখন শ্নীৎস্‌লারকে বলেছিল, হেনরিয়েটের গলায় ওই শব্দটা শুনিয়েছিল যেন বরফ পড়ছে। শ্নীৎস্‌লার ছিল লেখক, যুদ্ধের সময় আমাদের বাড়িতে যারা পরগাছার মত থাকত তাদের একজন। আর যখনই হেনরিয়েটেকে অদ্ভুত অন্যমনস্কতায় পেয়ে বসত তখনই সে বলত ওর মিস্টিক ক্ষমতার কথা। আর তাই শুনে হেনরিয়েটে বলত শুধু 'শালা'। ও-তো অন্য যে-কোন কথাই বলতে পারত; যেমন 'আজ আমি ওই গর্দভ ক্লোনাখ্‌টাকে আবার হারিয়েছি'। কিম্বা ফ্রেঞ্চে —'La condition du Monsieur le comte est parfaite'। ও আমাকে অনেক সময় স্কুলের হোমটাস্ক করতে সাহায্য করত। ও অন্যের হোমটাস্ক খুব

ভাল করতে পারত কিন্তু নিজেরটার বেলায় যাচ্ছেতাই। আমরা তাই নিয়ে কত হাসাহাসি করতাম।

সে সব হাসাহাসির বদলে আমি শুনছিলাম বয়স্কা মহিলার কান্না, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবা কেমন আছে ?'

'ওঃ', মা বলল, 'ওর বয়স হয়েছে,—সে এখন বৃদ্ধ এবং বিচক্ষণ।' 'আর লেয়ো ?'

'লে ? দারুণ কাজ করছে, থিওলজিসট হিসাবে খুব নাকি নাম করবে শোনা যায়।'

'ভগবান', আমি বললাম, 'ওই লেয়ো নাম করবে থিয়োলজিস্ট হিসাবে, আর লোক নেই !'

'ও যখন ক্যাথলিক হল তখন আমাদের খুবই খারাপ লেগেছিল', মা বলল, 'কিন্তু সবই তো তাঁরই ইচ্ছা।'

মা আবার তার সেই গলা ফিরে পেয়েছে। আমি একবার চেষ্টা করলাম শ্লীৎসলারের কথা জিজ্ঞেস করতে। লোকটা তো এখনও আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করে। লোকটা ছিল একটু মোটা-সোটা, আর ছিমছাম। সে-সময় 'মহান ইয়োরোপীয় ঐতিহ্য' আর 'জার্মান আত্মসচেতনতা' নিয়ে খুব মুখর থাকত। কৌতূহলবশে আমি পরে একবার তার লেখা একটা উপন্যাস পড়েছিলাম। 'ফরাসী ভালবাসার কাহিনী' ; বইটা ছিল নামটার চেয়েও বাজে। ওর মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক ঘটনা হচ্ছে, নায়ক—যুদ্ধবন্দী ফরাসী লেফটেনাণ্ট। দেখতে বেশ সুন্দর। আর নায়িকা মোসেল এলাকার এক জার্মান মেয়ে। রঙ ময়লা। যখনই হেনরিয়েটে—বোধহয় মোট দুবার—'শালা' বলেছিল, লোকটা চমকে উঠেছিল আর বলেছিল, একটা মিস্টিক ক্ষমতার সঙ্গে 'অশ্লীল শব্দ উচ্চারণের অনিচ্ছাকৃত চেষ্টা' অনায়াসে হাত মিলিয়ে চলতে পারে। (যদিও হেনরিয়েটে শব্দটা আদৌ বাধ্য হয়ে বলত না কিংবা ছুঁড়ে দিত না, স্বতঃই উচ্চারণ করত সে শব্দটা)।

শ্লীৎসলার তার যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ করবার জন্য গ্যোর্‌রের 'খ্রীস্টান রহস্যবাদ'-এর পাঁচ খণ্ড বার করেছিল। বলা বাহুল্য ওই উপন্যাসখানাতে নানা-রকম মজার ব্যাপার-স্যাপার ছিল। যেমন, 'প্রেমিক প্রেমিকাদের পরস্পরের প্রতি প্রণয় প্রকাশকালে নানান নামের ফরাসী মদের গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকি'। উপন্যাসের শেষ হয় গোপন বিবাহে; কিন্তু তার ফলে শ্লীৎসলার 'জাতীয় সমাজ-তান্ত্রিক লেখক সমিতি'র বিরাগভাজন হয়, কবলে পড়ে রাজরোষের। প্রায় দশ

মাসের জন্য কলম কেড়ে নেওয়া হয় তার। এই শাস্তিছল শাপে বর, আমেরিকানরা দু'হাত বাড়িয়ে তাকে প্রতিরোধ বাহিনীতে নিয়ে নিলে, চাকরি দিলে তাকে তাদের সংস্কৃতি-দপ্তরে। আর শ্লীৎস্লার এখনও সারা বন্ শহর ঘুরে বেড়ায় আর সুযোগ পেলেই বলে, নাৎসীরা তার লেখা বাজেয়াপ্ত করেছিল। এইসব ভণ্ডদের সমাজে পাত্তা পাবার জন্য কোনও মিথ্যা কথাও বলতে হয় না। ওদিকে এই লোকটাই মাকে বাধ্য করেছিল যাতে আমরা নাৎসীদলে যোগ দিই, আমি 'হিট্লার ইয়ুথ'-এ আর হেনরিয়েটে 'বি-ডি-এম'-এ। 'এই মুহূর্তে, শুনুন আপনি'; শ্লীৎস্লার বক্তৃতা করেছিল, 'আমাদের একমাত্র কর্তব্য একমত হওয়া, একসঙ্গে উঠে দাঁড়ান, একসঙ্গে কষ্টভোগ করা'। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—লোকটা চিমনির ধারে দাঁড়িয়ে, হাতে আমার বাবার একটা চুরুট, বলছে, 'আমি যার বলি হয়ে পড়েছি সেই বিশেষ অবিচার আমার স্বচ্ছ দৃষ্টিকে ঝাপসা করতে পারবে না, ফ্যুয়রার'—ওর গলা সত্যি সত্যিই আবেগে কেঁপে উঠেছিল – 'আমাদের ফ্যুয়রার ইতিমধ্যেই আমাদের রক্ষার ব্যবস্থা হাতে নিয়েছেন।' কথাগুলো সে বলেছিল আমেরিকানরা বন্ অধিকার করবার দিন দেড়েক আগে।

'শ্লীৎস্লার-এর খবর কী?' মাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'চমৎকার', মা বললেন, 'বৈদেশিক দপ্তরে ওকে ছাড়া গতি নেই।' মা স্বাভাবিকভাবেই ওসব কথা ভুলে গেছে। আশ্চর্য হয়ে ভাবি 'ইহুদী ইয়াংকি' শব্দটা শুনলে মায়ের মনে এখন আর কোন স্মৃতি জাগে কিনা। মায়ের সঙ্গে যেভাবে কথা শুরু করেছিলাম তার জন্য এখন আর আমার আদৌ দুঃখ হচ্ছিল না।

'আর ঠাকুর্দা, সে কী করছে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'দারুণ', মা বলল, 'নব্বুই বছর হতে চলল, এতটুকু টস্কায়নি। কেমন করে যে চালিয়ে যাচ্ছে সেটা আমার ধাঁধা মনে হয়।'

'অত্যন্ত সহজ কথা', আমি বললাম, 'এইসব বৃদ্ধরা অতীতের স্মৃতি বা বিবেকের দংশনে পীড়িত হয় না। বাড়িতে আছে?'

'না', মা বলল, 'দেড়মাসের জন্য ইশীয়া গেছে।'

আমরা দু'জনেই চুপ করে গেলাম। আমার নিজের গলার স্বরটা এখনও স্বাভাবিক হয় নি, মায়ের গলা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, মা জিজ্ঞেস করল, 'তোর ফোন করার আসল উদ্দেশ্য তো···যেমন শুনছি, তোর অবস্থা আবার খারাপ। কে বলছিল, কাজের দিক থেকে বেকায়দায় পড়েছিস।' 'তাই বুঝি?'

আমি বললাম, 'ভয় পাচ্ছ ভেবে, এই বুঝি তোমার কাছে আর বাবার কাছে টাকা চাইব। তোমার ভয়ের কারণ নেই, মা। দেবে তো না, এটা ঠিক। আমি আইনের সাহায্য নেব, সত্যি কথা বলতে কি, আমার টাকাও দরকার, কারণ আমেরিকা যাব ভাবছি। ওখানে একজন আমাকে একটা সুযোগ করে দিচ্ছে। একজন ইহুদী ইয়াংকি, কিন্তু জাতিগত বৈষম্য যাতে বাদ না সাধে তার চেষ্টা করব।' মায়ের কান্নার কোনও লক্ষণই নেই। টেলিফোনটা রাখবার আগে কেবল শুনলাম, কি যেন এক নীতির কথা বলছে। ভাল কথা, মায়ের গায়ের গন্ধ, চিরকালের মতই, গন্ধহীন। মায়ের আর একটা নীতি, 'একজন মহিলার শরীরে কোনও রকম গন্ধ থাকে না।' সেইজন্যই বোধ হয় আমার বাবার একজন সুন্দরী প্রেয়সী আছে, যার গায়ে কোনও গন্ধ নেই অথচ দেখলে মনে হয়, গায়ে সুগন্ধ আছে।

হাতের কাছে যে ক'টা বালিশ পেলাম সব পিঠের তলায় দিয়ে জখম পা-টা উঁচু করে রাখলাম, টেলিফোনটা টেনে নিয়ে ভাবলাম, যাই একবার রান্নাঘরে, ফ্রিজটা খুলে ব্র্যাণ্ডির বোতলটা এখানে নিয়ে আসি।

আমার মায়ের মুখে ওই 'কাজের দিক দিয়ে বেকায়দায়' পড়ার কথাটা বিশ্রী লেগেছে, আর মা তার খুশী ভাবটা ঢাকবার কোনও চেষ্টাই করে নি। আমি ভেবেছিলাম, এই বন্-এ কেউই আমার এই দুর্দশার কথা জানে না, সেটাই বোধ হয় আমার সবচেয়ে বড় বোকামি হয়েছে। মা যখন জেনেছে, বাবাও জানে, জানে লেয়ো-ও, এবং লেয়োর কাছ থেকে জেনেছে৺স্যুফ্নার, ক্যাথলিক চক্রের সবাই এবং মারী। মারী খুবই আঘাত পাবে, আমার চেয়ে বেশী। আমি যদি মদ খাওয়া একদম ছেড়ে দিই তবে আমি খুব তাড়াতাড়ি আবার এমন একটা অবস্থায় পেঁছব আমার দালাল ৎসোনেয়ারার যাকে 'গড়পড়তার চেয়ে বেশ খানিকটা ওপরে' বলবে, আর তার ফলে আমার এই বাকি বাইশ বছরে নর্দমা অবধি পেঁছবার পথটা খোলসা হবে। ৎসোনেয়ারার সব সময়েই আমার অগাধ দক্ষতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। সে শিল্প ব্যাপারের কিছুই বোঝে না, সে কেবল

সরল মানুষের মত সাফল্য দিয়ে সবকিছু বিচার করে। তবে আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে ওর একটা ধারণা আছে, ও ঠিকই জানে, আমি আরও বিশ বছর ধরে দৈনিক তিরিশ-মার্ক-পর্যায়েরও ওপরে শো চালিয়ে যেতে পারব। মারীর ব্যাপারটা অন্য। আমার ভেতরের 'শিল্পীর অধঃপতনে' মারী ব্যথা পাবে, আমার এই দুরবস্থার জন্য কষ্ট পাবে ; আমার কিন্তু তেমন সাংঘাতিক কিছু মনে হচ্ছে না। পরদেশীর চোখে—এ পৃথিবীতে প্রত্যেকেই পরস্পরের কাছে পরদেশী—, যে-ব্যাপারটার সঙ্গে যে জড়িত তার চেয়ে অনেক বেশী খারাপ বা ভাল ঠেকে—তা সে সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, বিরহ কি 'শিল্পীর অধঃপতন' যাই হোক না কেন দমবন্ধ করা হলের মধ্যে ক্যাথলিক গৃহিণী বা ইভাঞ্জেলিস্ট নার্সদের সামনে ভাল ক্যারিকেচার বা স্রেফ ভাঁড়ামি দেখাতে আমার কিছুই আসবে যাবে না। তবে এইসব লোকেদের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে ধারণাটাই যা হাতাশাজনক। এইসব গোষ্ঠীর প্রধান যেসব মহিলা, তারা স্বভাবতই ভাবে, পঞ্চাশ মার্ক যথেষ্ট টাকা, আর মাসে এ রকম কুড়ি বার পেলে অনায়াসে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমি যদি আমার মেক-আপের খরচ দেখাই আর বলি যে অনুশীলনের জন্য আমার কমসে কম আট বাই দশ সাইজের একটা হোটেল ঘর লাগে তাহলে হয়ত ভাববে আমার স্ত্রী বুঝি 'সাবার' রানীর চেয়েও ব্যয়সাপেক্ষ। আর যদি বলি, আমি বলতে গেলে স্রেফ আধা সেদ্ধ ডিম, টম্যাটো আর এটা-সেটা খেয়ে কাটাই তবে সে ক্রুশ এঁকে ভাববে, আমি খেতে পাই না কারণ আমি রোজ দুপুরে একগাদা গিলি না। শেষমেশ যদি বলি আমার দোষের মধ্যে আমি সন্ধ্যের কাগজ পড়ি, সিগারেট টানি আর একটু লুডো খেলতে ভালবাসি তাহলে নিশ্চয় ভাববে, আমি একটা ধাপ্পাবাজ। টাকা-পয়সা বা শিল্প নিয়ে কারও সঙ্গে তাই কোনও কথা বলা আমি বহুদিন হল ছেড়ে দিয়েছি। ও দুটো একসঙ্গে হলেই একটা কিছু গণ্ডগোল পাকিয়ে যায়। শিল্প সব সময়ই হয় যৎসামান্য নয় অতিরিক্ত পাওনা পায়। আমি ইংল্যাণ্ডের এক সার্কাসদলের ক্লাউনকে দেখেছি, লোকটার ক্ষমতা আমার চেয়ে বিশ গুণ আর শিল্পে দক্ষতা দশ গুণ কিন্তু সে দিনে দশ মার্ক-ও রোজগার করত না। তার নাম ছিল জেমস্ এলিস, বয়স চল্লিশের শেষের দিকে। তাকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলাম। খাবার ছিল হ্যাম-ওমলেট, স্যালাড আর আপেলের কেক। বেচারীর সে-খাবার সহ্য হয় নি, দশ বছরের মধ্যে সে এত খাবার একসঙ্গে খায় নি। জেমসের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে আমি আর টাকাপয়সা বা শিল্প নিয়ে কথা বলি না কখনও।

আমার হচ্ছে যখন যেমন তখন তেমন। শেষ বলতে সেই নর্দমা। মারীর মাথায় অন্য রকম সব ভাবনা। সব সময় বলত 'দৈবঘোষণা', সবই বুঝি দৈবঘোষণা, এমন কি আমি যা করি তাও। আমি নাকি উচ্ছল, আমার ধরন-ধারণ নাকি আন্তরিক এবং বিশুদ্ধ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। বীভৎস, ক্যাথলিকদের মাথার মধ্যে কত কিই না ঘোরে। এমন কি কোনও একটা বিকৃতি বা বিচ্যুতির কথা না ভেবে ওরা একটা ভাল মদও খেতে পারে না। যে কোনও মূল্যে ওরা সচেতন থাকবেই, আর কিছু না হোক মদটা কত ভাল, কেন ভাল ইত্যাদিতে সচেতন থাকবে। সচেতনতার ব্যাপারে ওরা মার্ক্সবাদীদের চেয়েও খারাপ। কয়েক মাস আগে আমি যখন একটা গীটার কিনেছিলাম, বলেছিলাম, এখন থেকে আমি নিজের লেখা, নিজের স্থর দেওয়া গান গীটার বাজিয়ে গাইব, শুনে মারী হতাশ হয়ে গিয়েছিল। ওর মতে ওটা আমার মর্যাদার পরিপন্থী। আমি উত্তরে বলেছিলাম, মর্যাদার দিক থেকে নর্দমার নিচে একমাত্র খাল। কিন্তু আমি কি বলতে চেয়েছিলাম ও বোঝে নি, আর এ সবের বিশদ ব্যাখ্যা করতে আমার ঘেন্না করে। হয় কেউ তা বুঝবে নয়ত বুঝবে না। আমি টীকাকার নই।

লোকে ভাবতে পারে আমার পুতুলনাচের সুতো বুঝি ছিঁড়ে গেছে, বরং উল্টো। সুতোগুলো সবই আমার হাতের শক্ত মুঠোয় ছিল আর আমি নিজেকে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম বোখুম-এর ঐ স্টেজের ওপর। আমি মাতাল ছিলাম, আমার হাঁটুতে চোট লেগেছিল। দর্শকের মধ্যে করুণার গুঞ্জন শুনছিলাম, আমার বিশ্রী লাগছিল। আমাকে এত করুণা করার কিছু নেই। দু-চারটে সিটিই বরং আমার প্রাপ্য ছিল। এমন কি আমার দাপাদাপিও আঘাত অনুযায়ী হয় নি। যদিও আমার সত্যি সত্যিই লেগেছিল। আমি মারীকে ফিরে পেতে চেয়েছিলাম আর সেজন্য আপন পথে চেষ্টা করছিলাম প্রাণপণ, স্রেফ সেই ব্যাপারটার তাগিদে, মারীর বইগুলোতে যাকে 'রক্ত-মাংসের ক্ষুধা' বলা হয়েছে।

৭

আমার তখন একুশ আর মারীর উনিশ, একদিন সোজা ওর ঘরে যাই, ওর সঙ্গে সেই ব্যাপারটা করতে, পুরুষ আর নারীতে যা করে। সেদিন বিকেলেও আমি ওকে হ্স্যাফ্‌নার-এর সঙ্গে দেখেছি, কেমন দু'জনে হাত ধরাধরি করে ইয়ুথ হোস্টেল থেকে বেরিয়ে আসছে, দু'জনেই হাসিখুশি। দেখে আমার ভেতরটা খচ্‌ করে উঠেছিল। ও হ্স্যাফ্‌নার-এর নয়, না। ঐ জঘন্য হাত ধরাধরি আমাকে হন্যে করে তুলেছিল। হ্স্যাফ্‌নার শহরের প্রায় সবাইকে চিনত, সেটা মূলত ওর বাবার জন্যই হয়েছিল। ওর বাবাকে নাৎসীরা তাড়িয়ে দিয়েছিল। ভদ্রলোক মাস্টার ছিলেন, যুদ্ধের পরে তাঁকে সেই স্কুলেরই হেডমাস্টার করতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। কে যেন একজন তাঁকে মন্ত্রীও করতে চেয়েছিল, তাতে কিন্তু ভদ্রলোক ক্ষেপে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি মাস্টার, আবার আমি মাস্টারই হতে চাই।' দীর্ঘকায় মানুষটি বেশ ঠান্ডা প্রকৃতির ছিলেন, মাস্টার হিসাবে তাঁকে আমার একটু ক্লান্তিকর মনে হতো। তিনি একবার আমাদের জার্মান ক্লাসে এসে একটা কবিতা পড়িয়েছিলেন, কবিতাটি ছিল সুন্দরী যুবতী লিলোফে-র ওপর লেখা।

স্কুলের ব্যাপারে আমার মতামতের দাম নেই। যতদিন স্কুলে যাওয়া উচিত তার চেয়ে বেশী সময় ধরে আমাকে স্কুলে পাঠানটাই একটা ভুল হয়েছিল, এমন কি সরকারী নিয়মের ক'টা বছরও আমার কাছে অত্যন্ত বেশী মনে হয়েছিল। স্কুলের ব্যাপারে মাস্টারমশাইদের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার ছিল না, বলবার ছিল আমার বাবা-মার বিরুদ্ধে। ঐ 'অন্তত গ্র্যাজুয়েটটা তো হবে' ধরনের ধারণাটাই আসলে পরবর্তীকালে জাতিগত মিলন সমিতির সেন্ট্রাল কমিটিতে পরিণত হয়েছে। এটা সত্যি সত্যিই একটা শ্রেণীগত প্রশ্ন, স্কুলের সার্টিফিকেট পাওয়া, স্কুলের সার্টিফিকেট না-পাওয়া, মাস্টার হওয়া, প্রফেসর হওয়া, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী পাওয়া, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী না-পাওয়া—সবাই এক-একটা শ্রেণী।

কবিতাটা পড়া হলে হ্স্যাফ্‌নার-এর বাবা একটু সময় অপেক্ষা করে একটু হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এবার কেউ কিছু বলবে এ বিষয়ে?' আমি তৎক্ষণাৎ

লাফিয়ে উঠে বলেছিলাম, 'কবিতাটা আমার চমৎকার লেগেছে।' তাতে সারাটা ক্লাশ হাসিতে ফেটে পড়েছিল, ৎস্যুফ্নার-এর বাবা হাসেন নি। তিনি একটু হাসির ভাব করেছিলেন কিন্তু ঠিক উন্নাসিকদের মত নয়। ওঁকে আমার খুব ভাল লেগেছিল, শুধু একটু যা রসকষহীন। তাঁর ছেলেকে আমি খুব ভাল চিনতাম না, তবে বাবার চেয়ে বেশী চিনতাম। আমি একবার খেলার মাঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ও ওর বন্ধুদের নিয়ে ফুটবল খেলছিল। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, ও আমাকে হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'খেলবি নাকি?' আমি সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ বলে ৎস্যুফ্নার-এর বিপরীত দিকে লেফ্‌ট আউটে নেমে পড়েছিলাম। খেলার শেষে ও আমাকে বলেছিল, 'আমাদের সঙ্গে আসবি?' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কোথায়?' ও বলেছিল, 'আমাদের হোস্টেলে, সন্ধ্যের আসরে।' আমি জবাব দিয়েছিলাম, 'আমি তো আর ক্যাথলিক নই।' শুনে ও হেসেছিল আর সব সঙ্গীরাও যোগ দিয়েছিল ওর হাসিতে। ৎস্যুফ্নার বলেছিল, 'আমরা গান গাই—তুইও তো গান গাইতে ভালোবাসিস।'—'হ্যাঁ'। আমি বলেছিলাম, 'কিন্তু ঐ সব হোস্টেলের সন্ধ্যের আসর আমি যথেষ্ট করেছি, আমি তো দু'বছর একটা রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে ছিলাম।' ও হেসেছিল কিন্তু আহতও হয়েছিল ঠিক। ও বলেছিল, 'কিন্তু, ইচ্ছা করলে তুই আবার ফুটবল খেলতে আসতে পারিস।' আমি কয়েকবার ওদের সঙ্গে ফুটবল খেলেছি, ওদের সঙ্গে আইসক্রীম খেতেগেছি, কিন্তু ও আমাকে আর কখনও ওদের হোস্টেলের সন্ধ্যের আসরে যেতে বলে নি। আমি এও জানতাম, মারী ওদের ঐ একই হোস্টেলেই নিজের দলবল নিয়ে সন্ধ্যের আসর বসাতো। আমি মারীকে খুব ভালভাবেই জানতাম। খুবই ভাল জানতাম কারণ আমি প্রায়ই ওর বাবার সঙ্গে কাটাতাম, আর কখনও কখনও আমি সন্ধ্যের দিকে খেলার মাঠের দিকে যেতাম। ও তখন ওর মেয়েদের নিয়ে বল খেলছে, দেখতাম। সঠিক বলতে গেলে, আমি ওকে দেখতাম। মাঝে মধ্যে ও খেলতে খেলতেই আমার দিকে হাত নাড়ত আর একটু হাসত। আমিও হাত নাড়তাম আর হাসতাম। আমরা পরস্পরকে খুবই ভাল চিনতাম। আমি তখন প্রায়ই ওর বাবার কাছে যেতাম, ওর বাবা আমাকে হেগেল আর মার্কস বোঝাতে চেষ্টা করত। তখন মারীও কখনো-সখনো সেখানে গিয়ে বসত, বাড়িতে কিন্তু ও কোনও দিন আমার দিকে তাকিয়ে হাসেনি।

সেদিন যখন দেখলাম ও ৎস্যুফ্নারের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে ইয়ুথ হোস্টেল

থেকে বেরিয়ে আসছে, আমার ভেতরে খচ্ করে উঠল। আমার তখন এক বিশ্রী অবস্থা। আমি স্কুলের পাঠ শেষ না করেই স্কুল ছেড়েছি। একুশ বছর বয়েসে। গ্রেড 'টেন'-এ উঠে। মাস্টারমশায়রা খুব ভাল ব্যবহারই করেছিল, এমন কি একটা পার্টিও দিয়েছিল আমার বিদায় উপলক্ষে। তাতে বিয়ার ছিল, স্যানডউইচ ছিল। যারা সিগারেট খায় তাদের জন্যে সিগারেট, সিগারেট না খেলে দেওয়া হয়েছিল চকোলেট। আমি আমার সতীর্থদের কিছু অভিনয়ও দেখেছিলাম ওই উপলক্ষে—যেমন ক্যাথলিকরা কিভাবে বাণী দেয়, প্রোটেস্ট্যান্টরাই বা কিভাবে দেয়, শ্রমিকরা মাইনের দিন টাকার খাম পেয়ে কি করে ইত্যাদি, তা ছাড়া চ্যাপলিনের অনুকরণ করে ক্যারিকেচারও করেছি। এমন কি একটা বিদায় বক্তৃতাও দিয়েছিলাম। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'চিরসুখী হওয়ার জন্যে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার ভুল ধারণা।' দারুণ মজা হয়েছিল সেদিন সন্ধ্যেয়। কিন্তু বাড়িতে সবাই ক্ষেপে গিয়েছিল আমার ওপরে। মা-তো রীতিমতো রেগে গিয়ে আমাকে জাহান্নামে পাঠাতে হুকুম দিয়েছিল বাবাকে। বাবা আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করত, আমি কি করতে চাই, আমি কেবলই বলতাম 'ক্লাউন'। বাবা বলত 'তুমি বলতে চাও অভিনেতা হবে?—বেশ তো —তাহলে তোমাকে একটা নাটকের স্কুলে ভর্তি করে দিই।'

'না', আমি বলতাম, 'অভিনেতা না, ক্লাউন হব—স্কুলে গিয়ে আমার কিছু হবে না।'

'কিন্তু তুমি কি করবে, কী ভেবেছ?'

'কিচ্ছু না', আমি বলতাম, 'কিছুই না। আমি চলে যাব এখান থেকে।'

দুটো অসহ্য মাস চলে গেল কিন্তু সত্যি সত্যি চলে যাবার সাহস আমি পেলাম না। আর খেতে বসে প্রতিটি গ্রাস নেবার সময় আমার মা আমার দিকে এমনভাবে তাকাত যেন আমি একটা অপরাধী। আর আমার এই মা-ই বছরের পর বছর বাউন্ডুলে পরগাছাগুলোর খাবার যুগিয়ে এসেছে, ওরা নাকি সব শিল্পী আর সাহিত্যিক। অপদার্থ শ্নীৎস্লার আর ঐ গ্রুবার। গ্রুবার লোকটা তত বাজে ছিল না। মোটাসোটা, ঠাণ্ডা আর নোংরা কবি। আধেকটা বছর সে আমাদের বাড়িতে ছিল কিন্তু একটা লাইনও লেখে নি। সকালে ব্রেকফাস্টের জন্য নিচে নামলেই আমার মা তাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করত, সারারাত ধরে কোন দানবের সঙ্গে কুস্তির কোন চিহ্ন খুঁজত। আমার মায়ের এই তাকান প্রায় অসভ্যতার পর্যায়ে পড়ত। একদিন সে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। আমরা

রা তার ঘরে ঢুকে খুবই অবাক হয়েছিলাম। ঘরে গাদা গাদা ডিকেটটিভ গল্পের বই, লেখার টেবিলে কয়েকটা টুকরো কাগজ, একটার ওপর লেখা, 'শূন্য' আর একটার ওপর দু'বার লেখা, 'শূন্য, শূন্য।' আর এইসব লোকদের জন্যই কিনা আমার মা নিচের ভাঁড়ারে গিয়ে আরও খানিকটা বেশী করে হ্যাম নিয়ে আসত। আমার মনে হয়, আমি যদি বিশাল একটা ইজেল নিয়ে এসে বিশাল বিশাল ক্যানভাসের ওপর তুলে দিয়ে হিজিবিজি আঁকতাম তাহলে আমার মা আমাকে খুব যত্ন করত। তাহলে বলতে পারত, 'আমাদের হান্স শিল্পী, ও ঠিক নাম করবে। এখনও প্রস্তুতি চলছে।' কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমি মাত্র একটা স্কুল-পালানো ছেলে, তার বেশী নই। আমার সম্বন্ধে তার শুধু এটুকুই ধারণা, 'সে কি একটা কায়দা কসরৎ করে, মাঝে-মধ্যে তা ভালই হয়।' ঐ সামান্য খাদ্যের বিনিময়ে আমার ক্ষমতার নমুনা দেখাতে আমি স্বভাবতই গররাজি ছিলাম। কাজেই দিনের অর্ধেকটাই আমি মারীর বাবার ওখানে কাটাতাম। মারীর বাবা, বুড়ো ডেয়ারকুমকে তাঁর দোকানদারীতে একটু আধটু সাহায্য করতাম আর সেজন্য পেতাম সিগারেট, যদিও তাঁর নিজের অবস্থাই তেমন ভাল ছিল না। মাত্র দুমাস কাটিয়েছি আমি এভাবে বাড়িতে, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন অনন্তকাল, অনন্তকাল; যুদ্ধের চেয়েও অনেক বেশী সময় যেন। মারীর দেখা পেতাম কালেভদ্রে, ও তখন পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত, ক্লাশের অন্য মেয়েদের সঙ্গে পড়াশুনা করত। ঐ বুড়ো ডেয়ারকুম আমাকে কয়েকবার ধরে ফেলেছেন, তাঁর কথায় কান না দিয়ে হাঁ করে রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি বলতেন, 'ওর আসতে আজ দেরি হবে', তখন আমার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠত।

সেদিন শুক্রবার। আমি জানতাম বুড়ো ডেয়ারকুম শুক্রবার সন্ধ্যের শো-এ সিনেমায় যান; কিন্তু আমি ঠিক জানতাম না মারী বাড়িতে কিংবা বান্ধবীদের সঙ্গে পড়াশুনোয় ব্যস্ত। আমার মাথায় তখন কোনও চিন্তা ছিল না, আবার সব চিন্তাই ছিল। এমন কি একথাও ভেবেছিলাম, 'তারপর' ও আর পরীক্ষা দেবার মত অবস্থায় থাকবে কিনা। এ কথাও জানতাম, অর্ধেক বন্ শহরটা ওর এই সতীত্বহানির ব্যাপারেই শুধু সোচ্চার হয়ে উঠবে না, একথাও বলবে যে, 'আর তা ঘটেছিল ঠিক পরীক্ষার আগে।' (এবং তা পরে প্রমাণিতও হয়েছিল।) এমন কি ওর দলের মেয়েদের কথাও আমি ভেবেছি। ওদের কাছে এটা একটা হতাশার কারণ হবে। বোর্ডিং স্কুলের একটা ছেলে একবার

'দেহতত্ত্বের খুঁটিনাটি' ব্যাখ্যা করেছিল। সে-ব্যাপারেও আমার খুব
পুরুষত্ব বিষয়েও। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছিল, ঐ 'রক্ত-মাংসের আক
ব্যাপারটা আমি আদৌ যেন অনুভব করছিলাম না। আমি এ কথাও ভে
ছিলাম, মারীর বাবার দেওয়া চাবি দিয়ে খুলে ওদের বাড়িতে ঢুকে মারীর
যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা, তবে আমার কাছে অন্য কোনও পথ খোলা ছি
কাজেই ঐ চাবিটা আমাকে ব্যবহার করতেই হল। মারীর ঘরের এক
জানলা। তাও রাস্তার দিকে। ওই খোলা জানলার ঘরটাতে রাত
অবধি আমরা এত বেশী ব্যস্ত ছিলাম যে আমাকে থানায় যেতে হতে
কিন্তু ওই ব্যাপারটা সেদিন আমাকে মারীর সঙ্গে করতেই হতো। এমন
ডাক্তারখানাতেও গিয়েছিলাম, আমার ভাই লেয়োর কাছ থেকে ধার-করা প
দিয়ে একটা পদার্থ কিনেছিলাম, স্কুলে ওরা বলত, ওটা খেলে পৌরুষ বাড়ে
ডাক্তারখানায় পেঁছে আমি লাল টকটকে হয়ে উঠেছিলাম, আমার ভাগ্য ভা
একজন পুরুষ আমার কাছে এসেছিল সেই ওষুধটা বিক্রি করবার জন্য। কিন্
আমার স্বর এত নিচু পর্যায়ে ছিল যে, সে আমাকে 'জোরে এবং পরিষ্কার' করে
বলতে বলেছিল, আমি কী চাই। সেটা পাবার পর আমাকে দাম দিতে
হয়েছিল একজন মহিলার ওখানে। মহিলাটি তার মাথা নাড়তে নাড়তে আমার
দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। মহিলাটি অবশ্যই আমাকে চিনত। পরদিন যখন
সে সব জানতে পেরেছিল তখন হয়ত সে নিজেকে দোষী বলে গালমন্দ
করেছিল, কিন্তু করে থাকলে অনর্থক করেছিল। কেননা দোকান থেকে বেরিয়ে
দুটো রাস্তা পার হয়ে এসেই আমি প্যাকেটটা খুলে পিলগুলো ড্রেনে ফেলে
দিয়েছিলাম।

সাতটার সময়, যখন সব সিনেমা শুরু হয়ে গেছে, আমি গেলাম গুডেন-
আউগগাসেতে, চাবিটা হাতেই ছিল। কিন্তু দোকানের দরজা ছিল তখনও
খোলা। আমি ভেতরে ঢুকতেই মারী ওপরের সিঁড়ি থেকে গলা বাড়িয়ে
জিজ্ঞেস করল, 'কে ওখানে?' আমি বললাম, 'আমি'—বলেই ছুটে সিঁড়ি
বেয়ে উঠে গেলাম। ও আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। আমি
তাকালাম না ওর দিকে, ওকে স্পর্শও করলাম না; কিন্তু বাধ্য করলাম
ওকে ঘরের ভিতরে ঢুকতে। আমরা বেশী কথা বলি নি, কেবল পরস্পরকে
দেখেছি আর মুচকি হেসেছি। আমি বুঝতে পারছিলাম না, ওকে তুমি বলব না
আপনি বলব। ও ওর মায়ের কাছ থেকে পাওয়া ধূসর পাতলা ড্রেসিং গাউ-

গায়ে দিয়েছিল। ওর কালো চুল পিছন দিকে একটা সবুজ ফিতে দিয়ে বাঁধা। পরে যখন আমি ওর ড্রেসিং গাউনের বাঁধনটা খুলেছিলাম তখন লক্ষ করেছি, ওটা ওর বাবার মাছ ধরবার একটা সুতো। ও এত আশ্চর্য হয়ে গেছিল যে, আমাকে কিছু বলতে হয় নি, ও ঠিকই বুঝতে পেরেছিল, আমি কি চাই। 'যাও', ও বলেছিল, কিন্তু ও তা একান্ত যান্ত্রিকভাবে বলেছিল, আমি জানতামও ও-কথা বলবেই, আর আমরা দু'জনেই জানতাম, যান্ত্রিক হলেও ও তাই বলতে চেয়েছিল। কিন্তু 'আপনি চলে যান' না বলে 'যাও' বলতেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। ওই সামান্য কথার মধ্যেই এমন একটা মিষ্টি ধ্বনি ছিল যে, আমার মনে হয়েছিল সারাটা জীবনের জন্য ওই যথেষ্ট। আমার তখন প্রায় কান্না পাবার দশা। ও এমনভাবে কথাটা বলেছিল যে, আমি বুঝতে পেয়ে গিয়েছিলাম, ও জানত, আমি আসব, অন্ততপক্ষে ও একেবারে অবাক হয় নি। 'না, না', আমি বলেছিলাম, 'আমি যাব না—কোথায় যাব আমি?' ও মাথা নেড়েছিল। 'আমি কি তবে বিশ মার্ক ধার করে কোলন চলে যাব—তারপরে তোমাকে বিয়ে করব?'—'না', ও বলেছিল, 'কোলন যেও না।' আমি ওর দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, আমার আর কোনও ভয় ছিল না। আমি একটা কচি ছেলে না, ও-ও যথেষ্ট বড় হয়েছে। ও যেখানে ড্রেসিং গাউনটা আঁকড়ে ধরেছিল সেদিকে তাকালাম, ওর টেবিল আর জানলাটাও দেখলাম। আমার ভালই লাগল, কোথাও ওর কোন পাঠ্য বই ছড়ানো নেই, কেবল সেলাই-এর দু-একটা জিনিস আর একটা সেলাই-এর নমুনা। আমি নীচে গিয়ে দোকানের দরজায় তালা লাগিয়ে এলাম। চাবিটা রাখলাম, গত পঞ্চাশ বছর ধরে যেখানে ওটা রাখা হয়—লজেন্সের বয়াম আর খাতার গাদার মাঝখানে। ওপরে এসে দেখি ও বিছানার এক কোণে বসে কাঁদছে। আমি এসে বিছানার আর এক কোণে বসলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে দিলাম ওকে। ও ওর জীবনের এই প্রথম সিগারেট টানতে থাকল আনাড়ির মত। আমরা হেসেও ছিলাম খুব। কারণ ও এমন অদ্ভুতভাবে ঠোঁটটা সরু করে ধোঁয়া ছাড়ছিল যে, তা প্রায় ছেনালির মত, দেখাচ্ছিল। একবার যখন হঠাৎ ওর নাক দিয়ে ধোঁয়া বের হল তখনও আমি হেসে ফেলেছিলাম—কেমন নষ্ট মেয়ের মত তখন দেখাচ্ছিল ওকে। অবশেষে আমরা গল্প করতে শুরু করলাম, আমরা অনেক গল্প করেছিলাম। ও বলেছিল ওর কোলন-এর সেই মেয়েদের কথা মনে পড়ছে, যারা এ 'ব্যাপারটা' পয়সার জন্য করে আর বিশ্বাস করে, এ ব্যাপারটার মূল্য পয়সা দিয়ে শোধ হতে পারে;

কিন্তু ওর মতে এ ব্যাপারটা পয়সায় শোধ হয় না। যে পুরুষেরা ওদের কাছে যায় তাদের থেকে এ ব্যাপারটার বিনিময়ে পয়সা নিয়ে সেই মেয়েরা তাদের স্ত্রীদের কাছেই আসলে ঋণী হয়। মারী চায় না ওদের মত ও-রকম ঋণী হতে। আমিও অনেক কথা বলেছিলাম, আমি বলেছিলাম, আমি তথাকথিত দৈহিক প্রেম বা অন্য প্রেম বিষয়ে যা পড়েছি সবই বাজে কথা। আমি কখনই একটা থেকে আর একটাকে আলাদা করতে পারি নি। ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ওকে আমার সুন্দর লাগে কিনা, ওকে আমি ভালবাসি কিনা। আমি বলেছিলাম, ও-ই হচ্ছে একমাত্র মেয়ে যার সঙ্গে আমি এ 'ব্যাপারটা' করতে চেয়েছি, আর ওই ব্যাপারের কথা মনে পড়লেই আমি একমাত্র ওর কথাই ভেবেছি, যখন বোর্ডিং স্কুলে ছিলাম তখনও; শুধু ওর কথা। তারপর মারী উঠে বাথরুমে গেল, আমি বিছানায় বসে সিগারেট খেতে খেতে যে জন্মনিরোধক পিলগুলি আমি ড্রেন-এ ঢেলে দিয়েছিলাম, সেগুলোর কথা ভাবতে লাগলাম। আমার আবার ভয় শুরু হল, বাথরুমের দরজায় গিয়ে টোকা দিলাম। মারী একটুকাল দ্বিধায় চুপ করে থেকে আমাকে ঢুকতে বলল, আমি ভিতরে গেলাম। ওকে দেখামাত্র আমার ভয় কেটে গেল। ও চুলে হেয়ার-ওয়াটার ঘষছিল আর ওর দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল, তারপর পাউডার মাখল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী করছ ওসব তুমি?'

'সাজছি', ও বলল। ওর চোখের জল পাউডারের ওপর দিয়ে দাগ কেটে গড়িয়ে পড়ছিল, বড্ড পুরু করে পাউডার মেখেছিল মারী। একটু থেমে আবার বলল, 'তুমি আবার চলে যাবে না তো?' আমি বললাম 'না।' আমি বাথটবের একটা ধারে বসে ভাবছিলাম দু'ঘণ্টায় হবে কিনা, ও তখন ও-ডি-কোলন মাখছিল। আধ ঘণ্টার ওপর সময় আমরা নষ্ট করে ফেলেছি। স্কুলে কিছু ছেলে ছিল যারা এসব ব্যাপারে সব জানত, বলত কুমারীকে মহিলা করা বড় কঠিন। সারাক্ষণ আমার মাথায় গুণ্টার-এর কথা ঘুরছিল। গুণ্টার সবসময় সীগফ্রিডকে আগে পাঠাত, আমার আরও মনে পড়ছিল 'এ ব্যাপারের' পরে নিবেলুঙ-এর সেই ভয়ঙ্কর রক্তস্নানের কথা, মনে পড়েছিল স্কুলের সেদিনের কথা, যখন নিবেলুঙ গাথা পড়ান হচ্ছিল, আমি উঠে দাঁড়িয়ে ফাদার হুনিবাল্ডকে বলেছিলাম, 'আসলে তো ব্রুনহিল্ড সীগফ্রিডের স্ত্রী ছিল', তাতে ফাদার হেসে বলেছিল, "কিন্তু বাছা, বিয়ে হয়েছিল তার ক্রিমহিল্ড-এর সঙ্গে।' আমার এত রাগ হয়েছিল শুনে যে, আমি বলেছিলাম, ওটা একটা তৈরী ব্যাখ্যা, আর আমার

কাছে ওটা নিতান্তই 'গুরুগিরি' মনে হয়। ফাদার হুনিবাল্ড তাতে রেগে গিয়ে টেবিল চাপড়ে তার জ্ঞানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'এ জাতীয় অসম্মান' তার অসহ্য লাগে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে মারীকে বললাম, 'কেঁদো না, কেঁদো না'। ও কান্না থামিয়ে পাউডার ঘষে আবার চোখের জলের দাগ মুছে ফেলল। ঘরে যাবার আগে আমরা বারান্দার জানালার কাছে একটু দাঁড়ালাম, রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম একটু সময়। সেটা জানুয়ারি মাস, ভেজা রাস্তা, গাঁচের ওপর হলদে আলো, ওপাশে মুদির দোকানে সবুজ আলোয় লেখা, এমিল শ্মিৎস্। শ্মিৎসকে আমি চিনতাম, কিন্তু জানতাম না, ওর নাম এমিল; আমার মনে হল 'এমিল'-এর সঙ্গে 'শ্মিৎস্' মানায় না। আমরা মারীর ঘরে ঢোকার আগে আমি দরজাটা একটু ফাঁক করে ভিতরের আলোটা নিভিয়ে দিলাম।

ওর বাবা যখন বাড়ি এলেন আমরা তখনও ঘুমাই নি। তখন প্রায় এগারটা, ভদ্রলোক সিঁড়ি বেয়ে ওঠবার আগে সিগারেট নিতে দোকানে ঢুকলে আমরা শব্দ শুনতে পেলাম। আমরা দু'জনেই ভাবছিলাম, বোধহয় টের পেয়ে যাবেন; একটা সাংঘাতিক ঘটনা তো ঘটে গেছে। কিন্তু তিনি কিছুই টের পান নি, একটু সময় দরজায় কান পেতে চলে গেছেন। জুতা খুলে ছুঁড়ে ফেলার শব্দ শুনলাম আমরা, একটু পরে ওঁর ঘুমের ঘোরে কাশির শব্দ কানে এল। আমি ভাবছিলাম, উনি ব্যাপারটা কিভাবে নেবেন। উনি তখন আর ক্যাথলিক নন, অনেক আগেই গীর্জা ছেড়ে দিয়েছেন, আমার কাছে সব সময় তিনি 'বুর্জোআ সমাজের মিথ্যা যৌন নীতি' নিয়ে গাল পাড়তেন, আর 'বিবাহ-সংক্রান্ত বিষয়ে পাদ্রীদের প্রতারণা'র ব্যাপারে রাগারাগি করতেন। আমি তবুও ঠিক জানতে পারছিলাম না, তিনি মারীর সঙ্গে যে ব্যাপারটা করেছি তা নির্ঝঞ্ঝাটে মেনে নেবেন। ওঁকে আমার ভালই লাগত, উনিও আমাকে ভালই বাসতেন। একবার ভাবলাম ওই রাত্রেই ওঁর ঘরে যাই। গিয়ে ওঁকে সব বলি। তখনই আমার আবার মনে হল, আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, একুশ, মারীরও যথেষ্ট বয়স হয়েছে, উনিশ, তাছাড়া পুরুষদের পক্ষে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সততা রক্ষা করা গোপনে কিছু করার চেয়েও কষ্টসাধ্য। অধিকন্তু আমার মনে হল, আমি যতটা ভাবছি ওঁর ততটা আসে যায় না। আমার পক্ষে বিকেলবেলা ওঁর কাছে গিয়ে 'মিঃ ডেয়ারকুম, আমি আজ রাত্রে আপনার মেয়েকে নিয়ে শুতে চাই' বলা অসম্ভব ব্যাপার। অবশ্য যা ঘটে গেছে তা উনি সময়মত ঠিকই জানতে পারবেন।

কিছুক্ষণ পরে মারী উঠে পড়ল, অন্ধকারে আমাকে চুমু খেয়ে বিছানার চাদর তুলে নিল। ঘরের ভিতরটা একদম অন্ধকার, বাইরে থেকে কোন আলো আসছিল না, আমরা পুরু পর্দাগুলি টেনে দিয়েছিলাম। আমি ভাবলাম, ও কি-করে জানল এখন চাদর তুলে নিতে হয় আর জানলা খুলে দিতে হয়। চাপা গলায় ও আমাকে বলল, আমি বাথরুমে যাচ্ছি, তুমি এখানে পরিষ্কার হও। এই বলে আমার হাত ধরে টেনে তুলল বিছানা থেকে, অন্ধকারের মধ্যে আমার হাত ধরে কোণের দিকে যেখানে হাতমুখ ধোবার গামলা ছিল সেখানে নিয়ে গেল, আমার হাতটা টেনে টেনে দেখিয়ে দিল গামলা, সাবানের বাক্স, জলের কুঁজো, তারপর বিছানার চাদর বগলদাবা করে বেরিয়ে গেল। আমি পরিষ্কার হয়ে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছিলাম। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, ধোপের চাদর আনতে মারীর এত দেরি হচ্ছে কেন। আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল, আর আনন্দ হচ্ছিল এই ভেবে যে, ওই হতচ্ছাড়া গুন্টার-এর কথা ভাবতে ভয় করছে না। কিন্তু মারীর যদি কিছু একটা হয়, ভেবে আমার ভয় করতে লাগল। বোর্ডিং স্কুলে ওরা ভয়ঙ্কর সব খুঁটিনাটির গল্প করত। চাদর ছাড়া খালি তোষকের ওপর শুয়ে থাকতে আরাম লাগছে না। তোষকটা পুরনো, একেবারে চ্যাপ্টা মেরে গেছে। আমার গায়ে কেবল গেঞ্জি, কাজেই শীত করছিল। আবার মারীর বাবার কথা মনে এল, সবাই ভাবত উনি বুঝি কম্যুনিস্ট। কিন্তু যুদ্ধের পর যখন তাঁর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হবার কথা, তখন কম্যুনিস্টরাই এমন ব্যবস্থা করেছিল যাতে উনি চেয়ারম্যান না হতে পারেন। আর আমি যতবারই নাৎসীদের সাথে কম্যুনিস্টদের তুলনা করতে গেছি উনি ক্ষেপে গেছেন, বলেছেন 'শোন ছোকরা, সাবান কারখানার মালিকের চালানো যুদ্ধে গিয়ে মরা আর কোনো একটা ব্যাপারে বিশ্বাস করে মরার মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ আছে।' উনি আসলে কি-যে ছিলেন তা আমি আজও জানি না। একবার যখন কিংকেল আমার সামনে ওঁকে একজন 'প্রতিভাশালী সাম্প্রদায়িক গোঁড়া' বলেছিল তখন আমি শুধু কিংকেলের মুখে থু-থু ছিটোতে বাকি রেখেছি। যে-সামান্য কজন আমার মধ্যে শ্রদ্ধা জাগাতে পেরেছিলেন, এই বুড়ো ডেয়ারকুম তাঁদের একজন। তিনি ছিলেন রোগা এবং খিটখিটে, বয়স আন্দাজে দেখতে বুড়ো। খুব বেশী সিগারেট খাওয়ার জন্যে ভদ্রলোকের শ্বাসকষ্ট ছিল। মারীর জন্য অপেক্ষা করবার সবটা সময় আমি ওঁর শোবার ঘরে কাশির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, আমার বিশ্রী লাগছিল, যদিও জানতাম ওটা আমার কাশি নয়। উনি আমাকে, একবার

বলেছিলাম, 'বড়লোকদের বাড়িতে, এই যেমন তোমাদের বাড়িতে, ঝি-এর ঘর উঠতি বয়সের ছেলেদের ঘরের ঠিক পাশেই থাকে কেন, তুমিও জান নিশ্চয় ? আমি বলছি শোন, ওটা আদিম স্বভাব আর করুণা মেশান অতি প্রাচীন এক পরিকল্পনা।' মনে হচ্ছিল উনি নিচে নেমে এসে মারীর বিছানায় আমাকে দেখলে ভাল হতো, কিন্তু ওর কাছে গিয়ে বলার মত কিছু একটা করতে আমি চাচ্ছিলাম না।

বাইরে ফর্সা হয়ে এল। আমার শীত করছিল আর মারীর ঘরের দুর্দশা আমাকে অভিভূত করছিল। ডেয়ারকুমদের পড়তি অবস্থার কথা সবাই জানত, ওই পড়তির কারণ তারা বলত মারীর বাবার 'রাজনৈতিক গোঁড়ামি।' ওদের একটা ছোট ছাপাখানা ছিল, আর ছোট্ট একটা প্রকাশনী। একটা বই-এর দোকানও ছিল, কিন্তু এখন মাত্র এই ছোট্ট কাগজপত্রের দোকানটাই আছে। এখানে স্কুলের বাচ্চাদের কাছে বিক্রি করার জন্য লজেন্স চকলেটও রাখা হয়। আমার বাবা একবার আমাকে বলেছিল, 'গোঁড়ামি মানুষের কতটা সর্বনাশ করতে পারে দেখ, ওই ডেয়ারকুমই যুদ্ধের পর রাজনীতি করত বলে সবচেয়ে বড় সুযোগ পেয়েছিল, একটা নিজস্ব কাগজ বার করবার।' অথচ আশ্চর্যের কথা, বুড়ো ডেয়ারকুমকে আমার কখনও গোঁড়া মনে হয় নি। আমার বাবা বোধহয় গোঁড়ামি আর স্থির সিদ্ধান্তের মধ্যে গন্ডগোল করে ফেলেছিল। মারীর বাবা 'প্রার্থনা পুস্তক' বিক্রী করতেন না, যদিও তাতে করে বিশেষত পালা-পার্বণে কিছু মুনাফা করার সম্ভাবনা ছিল।

মারীর ঘরের ভেতর ভোরের আলো এসে পড়তে বুঝতে পারলাম, আসলে ওরা কত গরীব। ওর আলমারীতে ঝুলছিল তিনটে পোশাক, একটা গাঢ় সবুজ রঙ-এর। আমার মনে হচ্ছিল ওকে ওটা একশ বছর ধরে পরতে দেখেছি। একটা হলদেটে, ওটারও প্রায় শেষ দশা। আর সেই অদ্ভুত গাঢ় নীল রঙ-এর পোশাকটা, ওটা ও মিছিলে যেতে পরে। আর সেই বটলগ্রীণ রঙ-এর পুরনো ওভারকোটটা। মাত্র তিন জোড়া জুতো ওর। একবার মনে হয়েছিল উঠে গিয়ে টানা খুলে দেখি, ওর ভেতরের জামা-টামা কী আছে, কিন্তু ইচ্ছেটা টিকল না। ভাবলাম, আমি যখন যথার্থই বিয়ে করব তখনও বউয়ের টানা খুলে তার ভেতরে পরার জামা খুঁজতে পারব না। ওর বাবা বেশ অনেকক্ষণ হল আর কাশছেন না। শেষমেশ মারী যখন এল তখন ছ'টা বেজে গেছে। বরাবর ওর সঙ্গে আমার যা করবার ইচ্ছে ছিল তা করেছি বলে আমার বেশ লাগছিল। আমি ওকে চুমু

খেলাম আর ওকে হাসতে দেখে খুশী হলাম। ওর হাত দুটো আমার গলা জড়িয়ে আছে,—হাত দুটো বরফের মত ঠাণ্ডা। আমি ওকে চাপাগলার জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করছিলে?'

ও বলল, 'কী আর করব, বিছানার চাদর-টাদর কেচে দিলাম। তোমাকে কাচা চাদর এনে দিতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু আমাদের আছেই মাত্র চারটে। দুটো বিছানায় পাতা আর দুটো ধোপা বাড়ি।' আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে ওকে ঢেকে ফেললাম আর ওর বরফের মত ঠাণ্ডা হাত দুটো আমার বগলের মধ্যে চেপে রাখলাম। মারী বলল, হাত দুটো ওখানে চমৎকার আছে- যেন পাখির বাসায় ঘুম খাচ্ছে পাখি। যাই বল, সে পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এল।

'চাদর-টাদরগুলি তো তাই বলে মিসেস হুধারকে দেওয়া যায় না, সেই আমাদের সব কাচাকুচি করে। তাহলে আমরা যা করেছি তাই নিয়ে সারা শহরে কথা হতো, আর ফেলে দিতেও চাচ্ছিলাম না। একবার ভেবেছিলাম, দিই ফেলে, তারপর মনে হল, তাতে ত আমারই ক্ষতি।'

'একটু গরম জলও ছিল না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ও বলল, 'না, বয়লারটা অনেকদিন ধরে খারাপ হয়ে আছে।'

তারপর ও একদম হঠাৎই কাঁদতে শুরু করল। এখন কাঁদবার কি হল জিজ্ঞেস করতে ও বলল চাপা গলায়, 'হায় ভগবান, আমি যে ক্যাথলিক, তুমি তো জান সে কথা—'

আমি বললাম, যে-কোন মেয়ে, সে ক্যাথলিকই হোক কিম্বা ইভানগেলিস্ট এ সময়ে সবাই কাঁদে। আমি জানি কেন কাঁদে। ও আমার দিকে প্রশ্নভরা চোখে তাকাল। আমি বললাম, 'কারণ সত্যি সত্যিই সতীত্ব বলে একটা কিছু আছে।' ও কেঁদেই চলল, আমি আর জিজ্ঞেস করলাম না, কান্নার কী হল। আমি জানতাম, ও এক বছরের ওপর মেয়েদের এই দলটাতে আছে আর বরাবর ওদের সঙ্গে মিছিলে গেছে, ঐ মেয়েদের সঙ্গে ও নিশ্চয় সবসময় ভার্জিন মেরীর কথা বলেছে—এখন ওর নিজের কাছে নিজেকে ভণ্ড মনে হচ্ছে, বিশ্বাসঘাতক মনে হচ্ছে। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ওর পক্ষে তা কতটা বিশ্রী। সত্যিই বিশ্রী, কিন্তু আর সামলাতে পারি নি, বলেছিলাম, আমি বরং ওই মেয়েদের সঙ্গে কথা বলব। শুনে ও চমকে উঠেছিল, বলেছিল, 'কী বলবে—কাকে বলবে?' —'তোমার ওই মেয়েদের'। আমি বলেছিলাম, 'সত্যিই ব্যাপারটা বিশ্রী দাঁড়াল, তোমার দিক থেকে। যদি তেমন বোঝ তো বলো, আমি জোর করে করেছি।'

ও হেসে ফেলেছিল, 'না, তার কোনও মানে হয় না। তুমি ওদের কী বলতে চাও ?'

আমি বলেছিলাম, 'আমি কিছুই বলব না, আমি স্রেফ ওদের ক'টা মূকাভিনয় দেখাব, আর কিছু ক্যারিকেচার। ওরা তখন ভাববে—আহা, এই সেই শ্রীয়ার, যে মারীর সাথে ব্যাপারটা করেছে—তাহলেই দেখবে ব্যাপারটা একদম অন্যরকম দাঁড়াবে, শুধু কানে কানে গুজগুজ ফিসফিস-এর চেয়ে ঢের ভাল।'

ও একটু ভেবে, হেসে আস্তে করে বলেছিল, 'তোমাকে বোকা বলা যায় না। তারপর আবার হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল। কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আমি আর এখানে মুখ দেখাতে পারব না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ?' ও কিন্তু শুধু কাঁদছিল আর মাথা নাড়ছিল।

আমার বগলের তলে ওর হাত দুটো ক্রমশ গরম হয়ে উঠেছিল, আর ও-দুটো যত গরম হচ্ছিল, আমারও তত ঘুম পাচ্ছিল। তারপর একসময় ওর হাত দুটোই আমার কাছে গরম লাগছিল। ও যখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি ওকে ভালবাসি কিনা, আমি ওকে সুন্দরী মনে করি কিনা, আমি বলেছিলাম, সে তো জানা কথা ; ওর ইচ্ছে আমি সেই জানা কথাগুলোই উচ্চারণ করি, ওর শুনতে ভাল লাগবে। আমি তখন ঘুমের ঘোরে বিড় বিড় করে বলেছিলাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়, তুমি খুব সুন্দর, আমি তোমাকে ভালবাসি।

মারী উঠে হাত মুখ ধুয়ে এসে পোশাক পরছিল তখন আমার ঘুম ভেঙে গেল। ওর কোনও লজ্জা ছিল না, আর আমার কাছেও ওর ওই অবস্থা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখাটা নিতান্তই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। আগের চেয়েও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, কি সাধারণ ওর কাপড়-চোপড়। ও যখন সব বাঁধছিল বা বোতাম লাগাচ্ছিল, আমি ভাবছিলাম সব সুন্দর সুন্দর জিনিসের কথা, আমার টাকা থাকলে যা ওকে কিনে দিতাম। আমি তো কতবার দোকানের সামনে দাঁড়িয়েপড়ে স্কার্ট, পুলোভার, জুতো আর ব্যাগ দেখেছি, আর মনে মনে কল্পনা করেছি ওকে ও-সব কেমন মানাবে। কিন্তু টাকাপয়সার ব্যাপারে ওর বাবা এমন ছিলেন যে, আমি কোনওদিন ওর জন্য কিছু কিনে আনতে সাহস পাইনি। উনি একবার বলেছিলেন, 'গরীব হওয়াটা বিশ্রী, তবে ওই চলে যাচ্ছে অবস্থাটাও বাজে, বেশীর ভাগ লোকেরই অবশ্য সেই অবস্থা।'—'আর বড়লোক হওয়া ?' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সেটা কেমন ?' জিজ্ঞেস করে আমি লজ্জিত হয়ে উঠেছিলাম।

তিনিও আমার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে লাল হয়ে উঠে বলেছিলেন, 'শোন ছোকরা, অত ভাবনা চিন্তা যদি বাদ না দাও তো তোমার কপালে দুঃখ আছে। আমার যদি সে-সাহস থাকত আর থাকত সেই বিশ্বাস যে, এই পৃথিবীতে কিছু একটা করা সম্ভব, তাহলে, জান আমি কী করতাম?' আমি বলেছিলাম, 'না'। 'তাহলে আমি', বলতে গিয়ে আবার লাল হয়ে উঠেছিলেন, 'একটা সমিতি গড়ে তুলতাম, যেখানে শুধু বড়লোকের ছেলেদের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা হতো। ওইসব গবেটগুলো সমাজের যা কিছু সমস্যা সব এই গরীবের ছেলেদের ওপর চাপায়।'

মারীর কাপড় পরা দেখতে দেখতে আমার অনেক কথাই মনে হচ্ছিল। আমার ভালও লাগছিল আবার দুঃখও হচ্ছিল, ওর কাছে ওর ওই দেহটা কত স্বাভাবিক। পরে, আমরা দু'জনে যখন হোটেলে হোটেলে ঘুরে বেড়াতাম তখন আমি সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওর হাতমুখ ধোওয়া আর কাপড়-চোপড় পরা দেখতাম। যদি বাথরুমটা বিছানায় শুয়ে দেখা যায় এমন সুবিধামত জায়গায় না থাকত তবে আমি গিয়ে বাথটবে শুতাম। সেদিনের সেই সকালে, ওর ঘরে, আমার ইচ্ছা হচ্ছিল ওর ওই বিছানায় শুয়ে থাকতে আর ইচ্ছা হচ্ছিল, ওর কাপড় পরা যেন শেষ না হয়। ও সুন্দরভাবে ঘাড়, হাত আর বুক ধুয়ে, দাঁত মাজতে শুরু করেছিল, চমৎকার। আমি নিজে সুযোগ পেলেই সকালের হাতমুখ ধোওয়া ব্যাপারটা চেপে যেতাম আর দাঁতমাজা আমার কাছে যন্ত্রণার ব্যাপার ছিল। আমি বরং সোজা বাথটবে যেতাম। কিন্তু মারীকে ওইসব করতে দেখতে আমার ভাল লাগত। ওর কাজ কি পরিষ্কার আর কত স্বাভাবিক, এমন কি টুথপেস্ট-এর টিউবে ঢাকনাটা প্যাঁচ দিয়ে লাগানোর ভঙ্গিটাও কত সুন্দর। আমার ভাই লেয়োর কথাও মনে পড়ছিল। ও ছিল বেশ গোছান এবং চটপটে স্বভাবের। ও প্রায়ই বলত, আমার ওপর ওর 'বিশ্বাস' আছে। ওর সামনে তখন স্কুলের শেষ পরীক্ষা, আর আমার কাছে ওর কেমন যেন একটা লজ্জা ছিল যে, ওটা ও সেরে এনেছে এই উনিশ বছর বয়সেই এদিকে আমি একুশ বছর বয়েসেও দু' ক্লাশ নিচে পড়ে থেকে নীবেলুঙ-এর ব্যাপার নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলাম। লেয়োও মারীকে চিনত, কী একটা ব্যাপারে, ক্যাথলিক আর ইভাঞ্জেলিস্ট যুব-সংস্থার গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় উদারতা প্রসঙ্গে কোন এক আলোচনাসভায় আলাপ হয়েছিল। এ সময়ে লেয়ো আর আমি, দু'জনেই আমাদের বাবা-মাকে কোন হোস্টেলের এক বিবাহিত ম্যানেজার যুগল বলে ভাবতাম। লেয়ো যখন জানতে পারল,

বাবার একজন ভালবাসার মানুষ আছে পনের বছরেরও ওপর, ও খুব আঘাত পেয়েছিল। আমাকেও ব্যাপারটা আহত করেছিল, তবে তা ঠিক চারিত্রগত কারণে নয়। আমি বেশ বুঝতাম, মায়ের ঐ অদ্ভুত চাপা-স্বভাবের দরুন তার সঙ্গে বিবাহিত হওয়াটা বেশ কষ্টকর ব্যাপার। আ, ও কিম্বা উ শব্দওয়ালা কথা মা কদাচিৎ বলত, আর মায়ের যেমন ধরন, লেয়োর নামটা ছেঁটে লে করে নিয়েছিল। মায়ের প্রিয় কথা ছিল, 'আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছি'—আর তার পরই প্রিয় ছিল, 'নীতিগতভাবে আমিই ঠিক বলছি, তবে যুক্তিপূর্ণ হলে আমি সব কথাই শুনতে রাজী আছি।' বাবার ঐ একজন ভালবাসার লোক আছে জেনে আমি আঘাত পেয়েছিলাম রুচির দিক থেকে। বাবার পক্ষে ব্যাপারটা কেমন বেমানান মনে হয়েছিল আমার। কারণ বাবার প্রকৃতিতে আবেগ কি উচ্ছলতা ছিল না কিছু। আমাকে মেনে নিতে হয়েছিল যে ওটি একরকম নার্স বা ওই 'চিত্তমুক্তিদায়িনী' কোন ব্যাপার। (তাহলে অবশ্য আবার ভালবাসার লোক কথাটা বেমানান)। প্রকৃতপক্ষে মহিলাটি ছিল সুন্দরী, একজন মিষ্টি স্বভাবের গায়িকা. দারুণ বুদ্ধিমতী কিছু ছিল না সে। বাবা তার জন্য বিশেষ কোনও প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে দেয় নি কোনদিন। সে ব্যাপারে বাবা ছিল অত্যন্ত সচেতন। আমার কাছে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা রীতিমত ঝঞ্জেটে মনে হয়েছিল, লেয়োর লেগেছিল দারুণ খারাপ। ওর আদর্শে লেগেছিল। আর আমার মা লেয়োর অবস্থাটার কথা বলতে গিয়ে বলেছিল, 'লে বিপদে পড়েছে'। তারপর লেয়ো যখন একবার স্কুলে খুব খারাপ ফল করল তখন মা ওকে নিয়ে মনস্তাত্ত্বিকেরকাছে যেতে চেয়েছিল। আমিই চেষ্টা করে সে-যাত্রা ঠেকিয়েছিলাম। আমি প্রথমে লেয়োকে নারী-পুরুষের সম্পর্কটা যতটা জানতাম বুঝিয়ে বলেছিলাম আর ওর পড়াশুনার ব্যাপারে খুব করে সাহায্য করেছিলাম, ফলে ও আবার ভাল ফল করাতে মা আর ওকে মনস্তাত্ত্বিকের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে নি।

মারী গাঢ় সবুজ রঙের পোশাকটা পরল। পোশাকের চেনটা আটকাতে ওর অসুবিধা হচ্ছিল, কিন্তু ওকে সাহায্য করবার জন্য উঠলাম না। দেখতে খুব ভাল লাগছিল ও কেমন হাত দিয়ে পিঠের দিকটায় টানছিল. ওর সাদা চামড়া, কাল চুল আর গাঢ় সবুজ পোশাক। ও নার্ভাস হয় নি দেখেও আমার ভাল লাগছিল। অবশেষে ও বিছানার সামনে এল, আমি উঠে ওর চেনটা টেনে দিলাম। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওরকম বিশ্রী সকালে ও ওঠে কেন? ও জবাবে বলেছিল, ওর বাবা শেষ রাত্রের দিকেই ঠিকমত ঘুমোয় আর ন'টা

অবধি বিছানায় থাকে। ওকে নিচে গিয়ে খবরের কাগজগুলো ভেতরে আনতে হয় আর দোকান খুলতে হয়। কারণ অনেক সময় স্কুলের বাচ্চারা সকালেই আসে খাতা, পেন্সিল কি লজেন্স কিনতে। আর 'তাছাড়া, সাড়ে সাতটার আগেই তোমার পক্ষে এ বাড়ির বাইরে যাওয়া ভাল। আমি যাচ্ছি এখন কফি বানাতে, পাঁচ মিনিট বাদে নিচে রান্নাঘরে চলে আসবে আস্তে করে।'

নিচে রান্নাঘরে গিয়ে নিজেকে কেমন বিবাহিতা মনে হল, মারী আমাকে কফি দিয়ে একটা রুটি সেঁকছিল। ও মাথা নাড়তে নাড়তে বলেছিল, 'হাতমুখ ধোয়া নেই, চুল আঁচড়ানো নেই, তুমি কি এইভাবেই ব্রেকফাস্ট করতে যাও?' আমি বলেছিলাম, 'হ্যাঁ। বোর্ডিং স্কুলের ওরাও পারে নি আমাকে সকালে ওঠার, নিয়মিত হাতমুখ ধোয়ার সহবত শেখাতে।' 'তা হলে তুমি কর কী?' ও জিজ্ঞেস করেছিল, 'একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো নিশ্চয় করতে হয় নিজেকে?'

'আমি ও-ডি-কোলন্ দিয়ে মুখ মুছে ফেলি', বলেছিলাম।

'তাতে খরচ বড্ড বেশী', বলেই মারী লজ্জা পেয়েছিল।

'হ্যাঁ', আমি বলেছিলাম, 'কিন্তু আমি ওটা ওমনি পাই। আমার এক মামার কাছ থেকে, মামা ও-জিনিসের কোম্পানীর মস্ত অফিসার।' অপ্রস্তুত অবস্থায় আমি রান্নাঘরটার চারদিক দেখতে থাকলাম, যদিও আমি ওটা খুবই চিনি। ছোট্ট আর অন্ধকার, দোকানের পেছনদিকের ঘর যেমন হয়। কোণে ছোট্ট উনোনটা, মারী তাতে নিবু নিবু আঁচ করে রেখেছে। অন্য সব গিন্নিরা যেমন করে, রাত্রে ভেজা খবরের কাগজ দিয়ে কয়লার টুকরোগুলো ঢেকে রাখে, সকালে খুঁচিয়ে দিয়ে কাঠ আর কয়লা দিয়ে আঁচ তোলে। কয়লার আঁচের এই গন্ধ আমার জঘন্য লাগে, সকালের দিকে রাস্তার ওপর কেমন ঝুলে থাকে। এই ছোট্ট ভ্যাপসা রান্নাঘরের মধ্যে সেদিন তা ঝুলছিল। ঘরটা এত ছোট যে মারী যতবারই উঠে উনোন থেকে কফির কেটলিটা নামাতে যাচ্ছিল ততবারই ওকে চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে রাখতে হচ্ছিল, বোধহয় ওর ঠাকুরমা আর ওর মা-ও ঠিক অমনি করতে বাধ্য হত। ওই রান্নাঘরটা আমি তো খুব ভাল করেই চিনতাম, কিন্তু সেদিন সকালেই প্রথম ওটাকে অত্যন্ত পানসে মনে হল। হয়তো সেই প্রথম জানলাম, পানসে ভাব কাকে বলে—যে কাজ করতে ভাল-লাগা মন্দ-লাগার প্রশ্ন নেই সেই কাজ করতে বাধ্য হওয়া। এই ছোট বাড়ির বাইরে গিয়ে কোনও রকম দায়-দায়িত্ব নিতে আমার আদৌ ইচ্ছা করছিল না। ইচ্ছা করছিল না মারীর সঙ্গে যা করেছি তার জন্য মেয়েদের কাছে কি লেয়োর কাছে

স্বীকারোক্তি করতে। এমন কি আমার বাবা-মাও কোথাও না কোথাও ও-কথা জানবে। আমার খুব ইচ্ছা করছিল জীবনের শেষদিন অবধি ওখানে থেকে গিয়ে লজেন্স আর খাতা বিক্রি করি, রাত্রে ওপরে মারীর পাশে ঘুমোই, সত্যি ইচ্ছা করছিল ঘুমোতে। সেদিন সকালে ওঠার আগে যেমন ওর হাতদুটো চেপে ধরে ঘুমিয়েছিলাম। ঐ পানুসে ভাবটা আমার বিশ্রী লাগছিল আবার চমৎকারও লাগছিল। কফির কেটলী আর রুটি, সবুজ পোশাকের ওপর মারীর রঙ-ওঠা নীল-সাদা এ্যাপ্রন ; মনে হচ্ছিল, শুধু মেয়েদের কাছেই বুঝি ওই পানসে জীবনটা ওদের দেহের মত স্বভাবিক। ভাবতে গর্ব হচ্ছিল যে, মারী আমার স্ত্রী কিন্তু নিজেকে যতটা পরিণত মনে করা উচিত এখন থেকে, ততটা পরিণত মনে হচ্ছিল না। আমি উঠে টেবিলের ওপাশে গিয়ে মারীকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, 'রাত্রে উঠে গিয়ে বিছানার চাদর ধুয়েছিলে, সে-কথা তোমার মনে আছে?' ও মাথা নেড়েছিল। 'আর সে-কথাও ভুলবো না', ও বলেছিল, 'তুমি আমার হাত দুটো চেপে ধরে রেখে গরম করে তুলেছিলে,—এবার তোমাকে যেতে হবে। সাড়ে সাতটা প্রায় বাজে, বাচ্চারা আসতে শুরু করেছে।'

খবরের কাগজের প্যাকেটগুলো ভেতরে এনে সেগুলো খুলতে সাহায্য করেছিলাম মারীকে। ওপাশে শ্মীৎস তার সবজির গাড়ি নিয়ে তক্ষুনি এসেছিল বাজার থেকে, আমি এক লাফে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলাম যাতে আমাকে দেখতে না পায়—কিন্তু লোকটা আমাকে দেখে ফেলেছিল। শয়তানের চোখও বুঝি প্রতিবেশীদের মত অত তীক্ষ্ম নয়। আমি সেই দোকানে দাঁড়িয়ে সকালের টাটকা কাগজগুলো দেখছিলাম, ওগুলোর জন্য বেশীর ভাগ লোকই পাগল। কিন্তু আমার একমাত্র সন্ধ্যার কাগজ আর বাথটবে কাগজ পড়াতেই উৎসাহ। বাথটবে সকালের সবচেয়ে রাশভারী কাগজও আমার কাছে সন্ধ্যার কাগজের মত হালকা মনে হয়। সেদিনের কাগজের হেডলাইন, 'স্ট্রাউস, পরিপূর্ণ পরিণতি!' সম্পাদকীয় বা হেডলাইন তৈরির কাজটা একটা কমপিউটার মেশিনকে দিলেই বোধহয় ভাল হত। মূর্খতার একটা মাত্রা আছে। দোকানের দরজায় শব্দ হল, একটা ছোট্ট মেয়ে এল দোকানে, আট কিম্বা ন' বছর, কালো চুল আর গালদুটো লাল টুকটুকে, বগলে প্রার্থনার বই। বললে, 'লজেন্স দাও দশ ফেনীর।' আমি জানতাম না দশ ফেনীতে ক'টা লজেন্স হয়, বয়াম খুলে একটা ঠোঙায় কুড়িটা গুণে দিতে গিয়ে জীবনে প্রথম লজ্জা পেলাম, বয়ামের মোটা কাঁচে আমার আঙুলগুলো অনেক বড় দেখাচ্ছিল, ওগুলো তেমন পরিষ্কার

ছিল না। চৌওয়ার কুড়িটা লজেন্স গুণে দিতে দেখে মেয়েটা অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি বলেছিলাম, 'ঠিক আছে, যাও', বলে ওর দশ ফেনীটা নিয়ে ক্যাশ বাক্সের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম। মারী আবার এলে ওকে আমি গর্বের সঙ্গে দশ ফেনীটা দেখিয়েছিলাম, ও হেসেছিল।

'এবার তোমাকে যেতে হবে।' ও বলেছিল।

'কেন বলত?' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তোমার বাবা নিচে আসা অবধি এখানে থাকতে পারি না?'

'বাবা যখন নিচে আসবে, ন'টার সময়, তখন তোমাকে আবার এখানে আসতে হবে। যাও', বলেছিল, 'আর কারও কাছ থেকে লেয়ো শোনার আগে তুমি নিজে সব কথা তোমার ভাইকে বলে দিও।'

'হ্যাঁ', আমি বলেছিলাম, 'তুমি ঠিক বলেছ—আর তুমি', আমি আবারও লাল হয়ে উঠেছিলাম, 'তুমি স্কুলে যাবে না?'

'আজ যাব না', ও বলেছিল, 'আর কোনও দিনই যাব না। তাড়াতাড়ি আসবে।'

ওর কাছ থেকে যেতে মন চাইছিল না, ও আমাকে দোকানের দরজা অবধি এগিয়ে দিয়েছিল। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আমি ওকে চুমু খেয়েছিলাম, যাতে ওপাশে শমীৎস্ আর তার স্ত্রী দেখতে পায়। ছিপের বঁড়শী গিলে ফেলে তারপর তা হঠাৎ আবিষ্কার করা মাছের মত ওরা ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে ছিল।

আমি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম, একবারও ফিরে তাকাইনি পেছনে। শীত করছিল, কোটের কলারটা তুলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছিলাম, একটুখানি ঘুরে বাজারের মধ্যে দিয়ে ফ্রানৎসিসকানারস্ট্রাসে ধরে এগিয়ে কোব্লেনৎসারস্ট্রাসের মোড়ে একটা চলতি বাসে লাফিয়ে উঠেছিলাম। কণ্ডাক্টর মহিলাটি দরজা খুলে দিয়েছিল, তার সামনে ভাড়া দেবার জন্য দাঁড়াতে আঙুল নেড়ে সাবধান করেছিল, আর মাথা নেড়ে আমার সিগারেটের দিকে ইঙ্গিত করেছিল। আমি ওটা নিভিয়ে কোটের পকেটে রেখে ভেতর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে কোবলেন্ৎসারস্ট্রাসের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম মারীর কথা। আমার চেহারার কিছু একটা লক্ষ করে আমার কাছের লোকটা বিরক্ত হয়েছিল। লোকটা তো কাগজটা নামিয়ে—'স্ট্রাউস্, পরিপূর্ণ পরিণতি' উপেক্ষা করে চশমাটা নাকের ওপর ঠেলে নামিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করে বলেই ফেলল, 'ইনক্রেডিবল, ভাবাই যায় না।' ওর পেছনে বসা মহিলাটিও

সে বক্তব্যে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়ল। আমি একটা গাজরের বস্তায় হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে মহিলাটির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

অথচ এই প্রথম অনিচ্ছাসত্ত্বেও মারীর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ওর চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়েছি, আমার গায়ে ছাইরঙা পরিষ্কার একটা সাধারণ কোট, আমার দাড়িও এমন কড়া নয় যে, একদিন না কামালেই আমি, 'ভাবাই যায় না' পর্যায়ে পড়ব। আমি খুব লম্বাও না খুব বেঁটেও না, আমার নাকও তেমন লম্বা নয় যে আমার পাসপোর্টে বিশেষ চিহ্ন হিসাবে তার উল্লেখ থাকবে। সেখানে বিশেষ চিহ্নের ঘরে লেখা আছে—নেই। আমি নোংরাও ছিলাম না বা মাতালও না, গাজরের বস্তার মালিক মহিলাটি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, চশমা চোখে লোকটার চেয়েও বেশী। লোকটা শেষবারের মত অবাকভাবে মাথা নেড়ে চশমাটা আবার ঠেলে দিয়ে স্ট্রাউসের পরিণীনিতে মনযোগ দিল। কিন্তু মহিলাটি নিঃশব্দে শাপ-শাপান্ত করে যেতে থাকল, নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়ায় তা জানতে পারছিল না বটে তবে ঘন ঘন মাথা নেড়ে সে যা বলতে চাইছে না, তা আর সব যাত্রীকে বোঝাতে চাচ্ছিল যে, তা টের পাচ্ছিলাম। আজ অবধি আমি জানি না ইহুদীরা কেমন দেখতে, তাহলে মেনে নিতে পারতাম যে আমাকে তাই ভেবেছিল। আমার কিন্তু মনে হয়, আমার চেহারায় নয়, বাসের বাইরে তাকিয়ে মারীর কথা ভাববার ফলে আমার দৃষ্টি ওরকম অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। ওই নীরব শত্রুতা আমাকে নার্ভাস করে তুলেছিল, একটা স্টপ আগেই নেমে পড়েছিলাম। একটু হেঁটে গিয়ে এবার্ট আলের কাছে রাইনের দিকে মোড় নিয়েছিলাম।

আমাদের বাগানের বীচ গাছগুলোর গুঁড়ি সব কালো, তখনও ভেজা ভেজা টেনিস কোর্ট ঝকঝকে, সমান আর লাল। রাইনের স্টিমারের ভোঁ শুনতে পাচ্ছিলাম, বাড়ির ভেতরে ঢুকতে রান্নাঘরে আন্নার গলা শুনতে পেলাম—গজগজ করছিল। আমি কেবল শুনলাম, 'কিছু যদি ভাল হয়—ভাল হয়—কিচ্ছু না।' রান্নাঘরের খোলা দরজার দিয়ে হাঁক দিলাম, 'আমার ব্রেকফাস্ট দরকার নেই, আন্না।' দৌড়ে গিয়ে বসবার ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওক কাঠে মোড়া, শিকারের সব নিদর্শনে ভরা সেই ঘর আমার কোনও দিন অত অন্ধকার মনে হয় নি। পাশের গানের ঘরে লেয়ো শোপ্যাঁর একটা মাজুরকা বাজাচ্ছিল। সে সময় ওর মিউজিক পড়ার ইচ্ছা ছিল, সাড়ে পাঁচটায় উঠত, স্কুলে যাবার আগে রেওয়াজ করতে। ওর বাজনায় আমি যেন দিনের অন্য এক সময়ে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম, তখন আমি ভুলেই গেছিলাম, ও বাজাচ্ছিল। লেয়ো

আর শোপাঁ্যা যেন খাপ খায় না। কিন্তু, ও এত ভাল বাজাচ্ছিল যে আমি ওকে ভুলে গিয়েছিলাম। পুরনো কালের বাজনার মধ্যে শোপাঁ্যা আর শুব্যার্টই ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমি জানি, আমাদের মিউজিক টিচার ঠিকই বলত, মোৎসার্ট স্বর্গীয়, বেটোফেন অসাধারণ, গ্লুক অপ্রতিদ্বন্দ্বী আর বাখ্ অসামান্য। বাখ্-এর কথায় আমার মনে পড়ে তিন ভলিউমের 'মতবাদের' বইয়ের কথা, আমি হতবাক হই। কিন্তু শুব্যার্ট আর শোপাঁ যেন এই জগতের, আমারই মত যেন। ওগুলো শুনতেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। রাইনের দিকে কাঁদুনে উইলোগুলোর সামনে ঠাকুর্দার চাঁদমারির টার্গেটগুলো নড়ছে, ফুরমানকে বোধহয় বলা হয়েছিল ওগুলো সাফ্ সুফ্ করতে। আমার ঠাকুর্দা মাঝে মাঝে দু'চারজন পুরনো বন্ধু-বান্ধব জড়ো করে, তখন বাড়ির সামনের ছোট্ট জায়গায় পনেরটা বিশাল বিশাল গাড়ি এসে দাঁড়ায়, পনের জন ড্রাইভার, হয় বাড়ির সীমানায় গাছপালার আড়ালে ঠাণ্ডায় কষ্ট পায় কিম্বা পাথরের চত্বরে বসে স্কাট খেলে। আর পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের কেউ একজন বারো পয়েণ্ট পেলেই শ্যাম্পেনের বোতল খোলার আওয়াজ পাওয়া যায়। মাঝে-মধ্যে ঠাকুর্দা আমাকে ডেকে পাঠাত আর আমি ঐ সব বুড়োদের সামনে ভাঁড়ামি করতাম, আদেনাওয়ারকে নকল করতাম কিম্বা এরহার্দকে—ওসব ছিল নিতান্তই সহজ। কিম্বা হয়তো একটা ক্যারিকেচার দেখাতাম—ডাইনিংকার-এর ম্যানেজার। আমি যত বিশ্রীভাবেই দেখাতে চাই না কেন, ওরা হেসে গড়াগড়ি যেত, বলত, 'দারুণ মজা'। তারপর যখন আমি একটা টোটার খালি বাক্স কিম্বা একটা ট্রে নিয়ে চক্কর দিতাম, ওরা নোট ফেলত। এইসব উন্মাসিক বুড়োদের আমার বেশ ভালই লাগত, ওদের সঙ্গে আমার এমনি কোনও সম্পর্ক ছিল না, চীনের সরকারী কর্মচারীদেরও আমার ওমনি ভাল লাগতে পারত। ওদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মন্তব্যও করত, 'দারুণ'—'চমৎকার'। কেউ কেউ আবার দু'টো তিনটে শব্দও বলে ফেলত, 'ছেলেটার ভেতরে জিনিস আছে' কিম্বা 'ওর প্রতিভা আছে।'

শোপাঁ্যা শুনতে শুনতে সেই প্রথম মনে হয়েছিল, একটা কাজ খুঁজতে হবে, সামান্য কিছু অর্থ উপার্জন করা দরকার। ঠাকুর্দাকে বলতে পারতাম, ক্যাপিটালিস্টদের সম্মেলনে একটা শো করবার সুপারিশের জন্য, কিম্বা বোর্ড অফ ডিরেক্টার সম্মেলনে আমোদ দেবার জন্য। আমি তো 'বোর্ড অফ ডিরেক্টার্স' নামে একটা ক্যারিকেচার তৈরিই করে ফেলেছিলাম।

লেয়ো এ ঘরে আসতেই শোপ্যাঁ উধাও। লেয়োবেশ লম্বা, আর ফরসা। ওর ওই রিমলেস্ চশমা পরা চেহারায় ওকে দেখায় যেন একজন সুপারিন্‌টেনডেণ্ট, কিম্বা একজন সুইডিস জেসুইট্। ওর কালো প্যাণ্টের কড়া ইস্তিরির দাগ শোপ্যাঁর শেষ চিহ্নও মুছে ফেলেছিল। কড়া-ইস্তিরি প্যাণ্টের ওপর সাদা পুলোভারটা বড্ড নিখুঁত দেখাচ্ছিল, তেমনি ওর পুলোভারের গলার ওপরে বেরিয়ে-আসা লাল শার্টের কলারটা। যখনই দেখি কেউ এমনি অযথা চেষ্টা করছে স্বচ্ছন্দ ভাব দেখাতে, আমার মনটা গভীর বিষাদে ভরে ওঠে, তেমনি এথেলব্যার্ট, গেরেনট্রুড রাশভারী নামগুলোও। হেনরিয়েটের মত দেখতে না হয়েও লেয়োর সঙ্গে ওর কতটা মিল তাও আমি লক্ষ্য করেছিলাম—ওলটানো নাক্, নীল চোখ, চুলের ধরন প্রায় এক—কিন্তু ঠোঁট দুটো নয়। হেনরিয়েটের মধ্যে যেসব জিনিস সুন্দর আর উজ্জ্বল মনে হতো, লেয়োর বেলায় সে সবই কেমন করুণ আর সন্ত্রস্ত। ওকে দেখলে বোঝাই যায় না যে, ও ক্লাসের সেরা জিমনাস্ট, ওকে দেখলে বরং জিমনাস্টিক থেকে রেহাই-পাওয়া ছেলে বলে মনে হতো। অথচ ওর বিছানার ওপর একগাদা সার্টিফিকেট ঝোলান আছে—আর সেগুলো সবই জিমনাস্টিক-এ পাওয়া।

ও আমার দিকে ছুটে এসে, আমার থেকে দু-এক পা দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ, ওর অপ্রস্তুত হাত দুটো দু'পাশে একটু ছড়ান, বলল, 'হান্স, কী হয়েছে?' ও আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল, না, তার একটুখানি নিচে, লোকে যেমন করে কোনও একটা বিশেষ দাগ সম্বন্ধে কাউকে সচেতন করতে চায় সেইভাবে। তখন আমার খেয়াল হল, আমি কাঁদছিলাম। শোপ্যাঁ বা শুব্যার্ট শুনলে আমি বরাবরই কাঁদি। ডানহাতের তর্জনী দিয়ে জলের ফোঁটা দুটো মুছে ফেলে বলেছিলাম, 'আমি জানতাম না, তুই এত ভাল শোপ্যাঁ বাজাতে পারিস। মাজুরকাটা আর একবার বাজা না!'

'পারব না', ও বলেছিল, 'আমাকে স্কুলে যেতে হবে। ফার্স্ট পিরিয়ডটা খুব জরুরী।'

'মায়ের গাড়িতে তোকে আমি পৌঁছে দেব', বলেছিলাম।

'ওই বাজে গাড়িটা চড়তে আমার আদৌ ভাল লাগে না।' ও বলেছিল, 'তুই তো জানিস্, আমার ঘেন্না করে।' মা সেবার এক বান্ধবীর কাছ থেকে 'সাংঘাতিক সস্তায়' একটা রেসিং কার কিনেছিল, কোনও কিছুতে যদি বড়লোকী দেখাবার কোনও সম্ভাবনা থাকে, লেয়ো সে ব্যাপারে বড্ড স্পর্শকাতর। ওকে

ক্ষেপাবার একটা মাত্র উপায় ছিল—সেটা আমাদের বড়লোক বাবা-মা নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা। ও তখন রেগেমেগে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ত।

'এবারটি না হয় গেলি', বলেছিলাম। যা, পিয়ানোতে গিয়ে বস, বাজা। তোর একবারও জানতে ইচ্ছে করছে না, 'আমি কোথায় ছিলাম?'

ও লাল হয়ে উঠেছিল। মেঝের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'না, আমি তা জানতে চাই না।'

'আমি একটা মেয়ের কাছে ছিলাম', বলেছিলাম, 'একজন মহিলার সঙ্গে ছিলাম—আমার স্ত্রীর সঙ্গে।'

'আচ্ছা?' চোখ না তুলেই ও বলেছিল। 'বিয়েটা কবে হল?' ও তখনও ওর বোঝার মতন হাত দুটো নিয়ে কী করবে বুঝতে পারছিল না, হঠাৎ মাথা নিচু করে আমার পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করলে আমি ওকে হাত ধরে দাঁড় করিয়েছিলাম।

'মেয়েটা মারী, মারী ডেয়ারকুম', আমি বলেছিলাম চাপা গলায়। ও ওর কনুইটা আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলেছিল, 'ঈশ্বরের দোহাই, কক্ষনো না।'

ও আমার দিকে বিরক্ত চোখে তাকিয়ে আপন মনে কি যেন গজগজ করছিল।

'কী রে।' জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী বলছিস তুই?'

'গাড়িতেই যেতে হবে', বলেছিলাম—'আমাকে পৌঁছে দিবি?'

'হ্যাঁ' বলে ওর কাঁধে হাত রেখে বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে দিয়ে ওর পাশে পাশে হেঁটে গিয়েছিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে দেখার হাত থেকে রেহাই দিতে চেয়েছিলাম ওকে। 'যা, চাবিটা নিয়ে আয়' বলেছিলাম, 'মা তোকে চাবি দিতে ইতস্তত করবে না—কাগজপত্র আনতে ভুলে যাস নে যেন—আর, লেও্রো শোন, আমার কিছু টাকাকড়ি দরকার—তোর কাছে আছে কিছু এখনও?'

'ব্যাঙ্কে আছে', বলেছিল, 'তুলে নিতে পারবি?'

'জানি না', বলেছিলাম, 'বরং তুই আমাকে টাকাটা পাঠিয়ে দিস্‌।'

'পাঠিয়ে দেব?' ও জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুই চলে যাচ্ছিস নাকি?'

'হ্যাঁ'। বলেছিলাম আমি, ও মাথা নেড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গিয়েছিল।

ও যখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তখনই প্রথম আমার খেয়াল হয়েছিল

বে, আমি চলে যাচ্ছি। আমি রান্নাঘরে যেতে আন্না গজগজ করতে করতে আমাকে অভ্যর্থনা করেছিল। রেগেমেগে বলেছিল, 'আমি ভেবেছিলাম, তুমি ব্রেকফাস্ট খাবে না।'

'না, ব্রেকফাস্ট আমার চাইনে' আমি বলেছিলাম, 'এক কাপ কফি হলেই চলবে।' আমি পরিষ্কার করা টেবিলের কাছে গিয়ে বসে দেখছিলাম আন্না কেমন করে উননের পাশে কফির পট থেকে ছাঁকনিটা নিয়ে একটা কাপের ওপর রেখে কফি ছাঁকছিল। আমরা রোজ সকালে এই ঝিয়েদের সাথে ব্রেকফাস্ট করতাম। খাবার ঘরে বসে কেউ সাজিয়ে-গুজিয়ে দেবে, তবে খাব, ওসব আমাদের বিশ্রী লাগত। তখন কেবল আন্না ছিল রান্নাঘরে। দু'নম্বর ঝি, নরেট্টে ছিল মায়ের কাছে, শোবার ঘরে, মাকে ব্রেকফাস্ট দিচ্ছিল আর পোশাক-আসাক স্নো-পাউডার নিয়ে খুব গল্প করছিল। খুব সম্ভব মা তখন তার সুন্দর দাঁতে গমের অঙ্কুর চিবোচ্ছিল, তার সারা মুখে কোনও একটা পাতা-বাটা লেপে দেওয়া, নরেট্টে তাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছিল। হয়ত ওরা সবে সকালের প্রার্থনা সেরেছে—প্রার্থনায় হয়ত ছিল গ্যোটে আর লুথারের উদ্ধৃতি আর অতিরিক্ত হিসেবে চরিত্র গঠনের পাঠ। কিম্বা নরেট্টে হয়ত মাকে পড়ে শোনাচ্ছিল মার সেলাইয়ের পত্রিকা থেকে পারগেটিভের বিজ্ঞাপন। মায়ের একটা আস্ত ফাইল-ভর্তি আছে সব ওষুধের বিজ্ঞাপন, ভাগ ভাগ করা 'হজমী', 'হার্ট', 'নার্ভ'। মা যখনই কোন ডাক্তার পেত হাতের কাছে, জেনে নিত 'নতুন ওষুধ' কি বের হল। ওই করে ডাক্তারের ভিজিট বাঁচাত। আর যদি ডাক্তারদের মধ্যে কেউ ওষুধের নমুনা পাঠাত তো মা একেবারে আত্মহারা হয়ে যেত।

আমি আন্নার পেছনটা দেখছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার দিকে ঘুরে আমার দিকে তাকাতে হবে ভেবে ও লজ্জা পাচ্ছে। আমরা পরস্পরের অনুরাগী ছিলাম, যদিও আমাকে সহবত শেখাবার একটা চেষ্টা ছিল ওর সবসময়। আর তা ও কখনো চেপে রাখতে পারত না। ও পনেরো বছর হল আমাদের বাড়িতে আছে। মা ওকে মায়ের এক খুড়তুতো ভাই-এর কাছ থেকে এনেছি ভাইটি ছিল একজন ইভাঞ্জেলিস্ট ফাদার। আমার বাড়ি ছিল পোস্টডাম-এ। আর আমরা, ইভাঞ্জেলিস্ট হয়েও স্থানীয় রাইন এলাকার টানে কথা বলি দেখে ওর কেমন অদ্ভুত, প্রায় অস্বাভাবিক লাগত। আমার ধারণা, একজন ইভাঞ্জেলিস্ট যদি ব্যাভেরিয়ার টানে কথা বলে তো ওর কাছে সে শয়তানের অবতার ছাড়া কিছু নয়। রাইন এলাকা ওর খানিকটা ধাতস্থ হয়ে এসেছে। ও লম্বা, পাতলা

চেহারায়। ওর বেশ গর্ব যে ওর 'চালচলন ভদ্রঘরের মেয়েদের মত।' ওর বাবা ছিল কোথাকার একজন ক্যাশিয়ার। সেই জায়গা সম্বন্ধে আমি কেবল জানি যে, তার নাম ছিল আই, আর, ৯। আম্মাকে বলে কোনই লাভ হত না যে, আমরা ওই আই, আর, ৯-এর মধ্যে নই, ছেলেমেয়েদের সহবত শেখানোর ব্যাপারে সে কখনই না বলে পারত না—'আই, আর, ৯-এ থাকলে এমনটা কখনই হতে পারত না।' এই আই, আর, ৯ যে কি ব্যাপার আমি কখনও বুঝতে পারিনি, তবে ইতিমধ্যে জেনে গেছি, ওই অদ্ভুত চরিত্র গঠনের প্রতিষ্ঠানে আমার নাকি জমাদারের কাজ পাবারও কোন সম্ভাবনা নেই। বিশেষ করে আমার হাতমুখ ধোয়ার ব্যাপার সব সময় আম্মা আই, আর, ৯-এর উল্লেখ করত। আর আমার 'ওই যে জঘন্য অভ্যাস, যতক্ষণ সম্ভব বিছানায় শুয়ে থাকা', ছিল ওর কাছে একটা গা ঘিনঘিনে করা ব্যাপার, যেন আমার কুষ্ঠ হয়েছে। অবশেষে ও কফির পট্টা নিয়ে ঘুরে টেবিলের কাছে এল চোখ দুটো নামিয়ে। ভাবখানা এমন যেন একজন নান্ এক দুশ্চরিত্র বিশপের পাল্লায় পড়েছে। মারীর দলের মেয়েদের মত ওর জন্যও আমার কষ্ট হচ্ছিল। আম্মা ওর ওই নান্সুলভ আন্দাজে ঠিক বুঝতে পেরে গিয়েছিল, আমি কোথায় ছিলাম, ওদিকে আমার মা হয়ত এতটুকুও টের পেত না যদি আমার তিন বছর ধরে গোপনে বিয়ে করা একটা বউ থাকত। আমি আম্মার হাত থেকে পট্টা নিয়ে কফি ঢেলে ওর হাত ধরে ওকে বাধ্য করেছিলাম আমার দিকে তাকাতে। ও ওর ফ্যাকাশে নীল চোখে তাকিয়েছিল, চোখের পাতা কাঁপছিল, দেখতে পেয়েছিলাম, ও সত্যি সত্যিই কাঁদছিল। 'ধুত্তোর, আম্মা', বলেছিলাম আমি 'তাকিয়ে দেখ আমাকে। তোমার ঐ আই, আর, ৯-এও তো বাপু লোকে লোকের চোখের দিকে পুরুষের দৃষ্টিতে তাকায়।'

'আমি পুরুষ নই', ফোঁস করে উঠেছিল আম্মা। আমি ওকে ছেড়ে দিলাম। ও উনুনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। পাপ, আর লজ্জা, সোডোম আর গোমোড়া নিয়ে গজগজ করতে লাগল—। আমি ওর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলাম, 'ঈশ্বরের দিব্যি আম্মা, এক পলক ভেবে দেখ সোডোম আর গোমোড়ায় সত্যি সত্যি তারা কি করেছিল।' ওর কাঁধ থেকে আমার হাতটা ধাক্কা মেরে নামিয়ে দিল। আমি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ওকে বললাম না যে, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ওই ছিল আমার একমাত্র জন যার সঙ্গে আমি মাঝে-মধ্যে হেনরিয়েটেকে নিয়ে গল্প করতাম।

লেয়ো তত্‌ক্ষণে বেরিয়ে এসে গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত হয়ে কেবল ঘড়ি দেখছিল। আমি কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম, 'মা জানতে পেরেছে, আমি যে বাইরে ছিলাম?' 'না', জবাব দিয়ে লেয়ো আমাকে গাড়ির চাবিটা দিয়ে গ্যারেজের দরজা খুলে পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। আমি মায়ের গাড়িটা বার করে এনে লেয়োকে তুলে নিলাম। ও মনোযোগ দিয়ে ওর হাতের নখ দেখছিল। 'আমি পাশবইটা নিয়ে এসেছি', ও বলল, 'টেলিফনে ব্যাঙ্কে যাব। কোথায় পাঠাব টাকাটা?'—'বুড়ো ডেগ্নারকুমকে পাঠিয়ে দিস, আমি বললাম।' 'এবার তবে চল', ও বলল, 'খুব দেরি হয়ে গেছে।' আমি খুব জোরে চালালাম গাড়িটা। বাগানের পথ বেয়ে আমাদের সদর দরজা পেরিয়ে ট্রাম স্টপে একটুক্ষণের জন্যে এসে থামলাম। যেন বাধ্য হলাম থামতে। স্কুলে যাওয়ার পথে এই স্টপ থেকেই হেনরিয়েটে ট্রামে উঠেছিল। হেনরিয়েটের বয়সী দু'চারটি মেয়ে ট্রামে উঠল। আমরা ট্রামটা পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলাম ওরা হাসছে, হেনরিয়েটে যেমন হেসেছিল। ওদের মাথায় নীল টুপি আর গায়ে ফার-এর কলার লাগান ওভারকোট। আবার যদি যুদ্ধ বাধে, যুদ্ধ, আমার বাবা-মা যেমন হেনরিয়েটের বেলায় করেছিল, ওদের বাবা-মাও ওদের যুদ্ধে পাঠাবে, হাত খরচা বাবদ কিছু টাকা আর দু'চারটে স্যান্ডউইচ দিয়ে পিঠ চাপড়ে বলবে 'ভাল থেকো।' ওই মেয়েদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে খুব ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু চুপ করে থাকলাম। ভুল বুঝবে। এই রকম একটা গাড়িতে চাপলে মেয়েদের দিকে হাত নাড়াও যায় না। আমি একবার পার্কে একটা বাচ্চা ছেলেকে আধখানা চকোলেট দিয়েছিলাম আর ওর নোংরা কপালের ওপর থেকে সোনালী চুলগুলো সরিয়ে দিয়েছিলাম। ও কেঁদে কেঁদে চোখের জলে নাকের জলে সারা মুখ কপাল ভরিয়ে ফেলেছিল, আমি ওকে কেবল শান্ত করতে চেয়েছিলাম। তাইতেই দুই মহিলার সঙ্গে আমার এক বিশ্রী ঝামেলা বেধে গিয়েছিল, ওরা তো পাগলা হয়ে প্রায় পুলিশ ডাকতেই যাচ্ছিল। তাদের গালাগালির চোটে নিজেকে প্রায় দানব বলেই মনে হচ্ছিল আমার। কেননা, একজন মহিলা কেবল বারে বারেই আমাকে বলছিল, 'নোংরা স্বভাবের লোক কোথাকার।' 'নোংরা স্বভাবের লোক কোথাকার।' যাচ্ছেতাই কাণ্ড। ঐ ঝামেলায় পড়ে আমার শুধু মনে হচ্ছিল, আমি যেন সত্যি সত্যি একটা যৌনবিকৃতির ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছি।

কোব্লেনৎসার স্ট্রাসেতে পড়ে আমি প্রবলবেগে গাড়ি চালিয়ে চলেছিলাম আর খুঁজছিলাম কোন মন্ত্রীর গাড়ি, পেলে আচ্ছা করে আঁচড় কেটে দিতাম। মায়ের

গাড়ির চাকার কাছে ধারাল রড বেরিয়েছিল, ওই দিয়ে দিব্যি অনায়াসে অন্যের গাড়িতে আঁচড় কাটা যায় ; কিন্তু অত সকালে কোন কেবিনেট মন্ত্রীই পথে বের হয়নি। আমি লেয়োকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে, তুই সত্যি সত্যিই আর্মিতে যাচ্ছিস ?' ও লাল হয়ে উঠে মাথা ঝাকাল, বললে, 'আমরা ঐ নিয়ে আলোচনা করেছি নিজেদের মধ্যে। আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, ওতে করেই গণতন্ত্রকে সমর্থন করা হবে।'—'বেশ ভালই', উত্তর দিয়েছিলাম, 'যা ভাঁড়ামি কর গে। আমার মাঝে-মধ্যে দুঃখ হয় এই ভেবে, আমাকে আর্মিতে যেতে কেউ বাধ্য করবে না।' লেয়ো আমার দিকে তাকিয়েছিল, তার চোখে জিজ্ঞাসা ; কিন্তু আমি ওর দিকে তাকাতেই ও মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। প্রশ্ন করেছে, 'কেন ?' 'আহ্, আমার বড্ড ইচ্ছে হয়, যে মেজরটা আমাদের এখানে থাকত, যে ফ্রাউ ভানেকেলকে গুলি করতে চেয়েছিল, তাকে একবার দেখি। সে নিশ্চয় ইতিমধ্যে কর্নেল কিম্বা জেনারেল হয়ে গেছে।' ওর প্রশ্নের জবাবে বললাম আমি। আমি বেঠোফেন স্কুলের সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়েছিলাম, ও এখানে নামবে। ও নামল না। মাথা নেড়ে বলল, 'না, এখানে না, ওই হস্টেলের পেছনটায় পার্ক কর।' আমি আবার চালিয়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম সেখানে। ও নামল। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমার হাতে ও হাত রাখল। ও হাসছিল বটে, কিন্তু বেশ কষ্ট হচ্ছিল হাসতে। ও হাঁটছিল। তখনও আমার হাতে ওর হাত। আমার মন তখন অন্যখানে অনেক দূরে। আমি বুঝতে পারছিলাম, লেয়ো কেন উদ্বিগ্ন চোখে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। আমি কেবলই বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম। সবে আটটা বাজতে পাঁচ, হাতে যথেষ্ট সময় তখনও। 'তুই তা হলে সত্যি সত্যিই মিলিটারীতে যেতে চাস না', আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'কেন যাব না', রাগ করে উঠে লেয়ো বলল, 'গাড়ির চাবিটা দে।' ওকে চাবিটা দিয়ে মাথা নেড়ে হাঁটতে শুরু করলাম। সারাটা সময় আমি ভেবেছিলাম হেনরিয়েটের কথা। আর লেয়ো যে মিলিটারীতে যাবে সেটাও আমার কাছে পাগলামি বলে মনে হয়েছিল। আমি পার্ক পেরিয়ে ইউনিভার্সিটির পাশ দিয়ে বাজারের দিকে গেলাম। আমার শীত করছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল মারীর কাছে যাই।

আমি যখন এলাম দোকানটা তখন বাচ্চা-কাচ্চায় ভর্তি। বাচ্চারা তাকের ওপর থেকে লজেন্স, স্লেট পেন্সিল, ইরেজার এই সব নিয়ে বুড়ো ডেরারকুমকে পয়সা দিচ্ছিল। আমি দোকানের ভেতর দিয়ে পেছনের ঘরটার দিকে চলে

গেলাম। বুড়ো তাকিয়েও দেখল না। আমি উননের কাছে গিয়ে হাত দুটো কফির কেটলির গায়ে সেঁকতে লাগলাম। ভাবলাম মারী যে-কোনও মুহূর্তে এসে যাবে। আমার সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল, ভাবছিলাম মারীর কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে নেব ; না, দাম দিয়ে কিনে নেব। আমি কাপে কফি ঢালতে গিয়ে দেখি টেবিলের ওপর তিনটি কাপ। দোকানের ভেতরটা শান্ত হয়ে এলে আমি কাপটা রেখে দিলাম। মারী কাছে থাকলে ভাল হতো। উননের পাশের ওয়াশ-বেসিনে হাতমুখ ধুয়ে সোপ-কেসের পাশে রাখা নখের ব্রাশটা দিয়ে মাথাটা আঁচড়ে নিলাম। জামার কলারটা ঠিক করলাম, টাইটা টেনে জায়গা মত বসিয়ে দিলাম, হাতের নখগুলোকে পরীক্ষা করলাম, ওগুলো পরিষ্কারই আছে। হঠাৎ আমার মনে হল, ও-সবই আমাকে করতে হয়েছিল যদিও আগে কখনও ও-সব করিনি।

আমি সবে বসেছি তখন ওর বাবা এলেন। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার মতই বিব্রত অবস্থা ছিল তাঁর, আমার মতই লজ্জাগ্রস্ত। তবে রাগ ছিল না, কেবল খুব গম্ভীর হয়েছিলেন। যখন কফির পটের জন্যে হাত বাড়ালেন, আমি মাথা ঝুঁকিয়েছিলাম, বেশী নয়, তবে নজরে পড়ার মত। তিনি মাথা নেড়ে কফি ঢেলে নিয়ে কেটলিটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, 'ধন্যবাদ' ; তিনি তখনও আমার দিকে তাকিয়ে দেখেননি। রাত্রে ওপরের ঘরে মারীর বিছানায় শুয়ে শুয়ে ব্যাপারটা চিন্তা করে নেবার সময় নিজেকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছিল। ওঁর সিগারেটের প্যাকেটটা টেবিলের ওপর পড়ে আছে দেখে একটা সিগারেট খেতে খুবই ইচ্ছা করছিল, অন্য সময় হলে ঠিক একটা তুলে নিতাম। কিন্তু এখন নিতে সাহস হল না। বিশাল টাকের চার-পাশের অগোছাল পাকা চুল নিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসে থাকতে দেখে ওঁকে আমার বেশ বুড়ো মনে হচ্ছিল। আমি আস্তে করে বলেছিলাম, 'হেয়ার ডেয়ারকুম, আপনি কিছু বলুন।' সে অবশেষে টেবিলে চাপড় মেরে আমার দিকে তাকিয়ে চশমার ওপর দিয়ে দেখতে দেখতে বলেছিলেন, 'যত্ত সব, এমন না হলে কি চলত না ? একেবারে—সারাটা পাড়া জানাজানি হয়ে গেল !' আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম যে, তিনি হতাশ হননি কিংবা মান-সম্মানের কথা তোলেননি। 'এমনটা করার কি দরকার ছিল শুনি ?—তুমি তো জান, ওর ওই হতভাগা পরীক্ষাটার জন্য আমরা কি রকম উঠে পড়ে লেগেছিলাম—এখন', হাত দুটো একসঙ্গে ধরে আবার খুলে দিলেন যেন একটা পাখি ছেড়ে দিলেন, বললেন 'কিছু

হল না।'—'মারী কোথায় ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'চলে গেছে', তিনি বললেন, 'ক্যোলনে গেছে।'—'কোথায় বললেন ?' চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আমি, 'কোথায় ?' —'শান্ত হও, আস্তে কথা বল—আস্তে, আস্তে', বলেছিলেন, 'সব কথা জানতে পারবে। মনে হচ্ছে এবার তুমি ভালবাসা, বিবাহ, ইত্যাদি প্রসঙ্গ টানবে—তার দরকার নেই—কিছু ভেব না, যেমন চলছ, চল। তোমার ভবিষ্যৎটা কি হবে সেইটে দেখার জন্যে আমি এখন উৎসুক। এখন তুমি যেতে পার।' ওর পাশ কাটিয়ে যেতে সাহস হচ্ছিল না। দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিলাম, 'ওর ঠিকানাটা কি ?' —'এই যে', টেবিলের ওপর দিয়ে আমার দিকে একটা কাগজের টুকরো ঠেলে দিয়েছিলেন। 'আর কিছু চাই', চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, 'আরও কিছু ? দাঁড়িয়ে আছ কেন ?'—'আমার কিছু টাকাকড়ি দরকার', শুনে হেসে ফেলেছিলেন, দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। হাসিটা ছিল অদ্ভুত। রুক্ষ আর বিরক্তি মেশানো। আমার বাবার সম্বন্ধে কথা বলবার সময় ওঁকে একবার ওরকম হাসতে দেখেছিলাম। 'টাকাকড়ি', বলেছিলেন, 'বেশ মজার কথা তো ; ঠিক আছে, এস, এস'। আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন ক্যাশবাক্সের কাছে, বাক্স খুলে দু'হাত ভরে খুচরো তুলে এনে খাতা আর খবরের কাগজের ওপর ছড়িয়ে দিলেন, দশ ফেনী, পাঁচ ফেনী আর ফেনী অনেকগুলো। আমি একটু ইতস্তত করে আস্তে আস্তে ওগুলো সব জড়ো করতে লাগলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম হাতের তেলো দিয়ে টেনে নেব, শেষে আবার একটা একটা করে তুলে, গুণে গুণে পকেটে রাখতে লাগলাম। উনি তাকিয়ে দেখছিলেন। মাথা ঝুঁকিয়ে মানিব্যাগ বার করে একটা পাঁচ মার্কের কয়েন এগিয়ে দিলেন। আমরা দু'জনেই লাল হয়ে উঠেছিলাম, 'মাপ করো', আস্তে আস্তে বলেছিলেন 'মাপ করো, ভগবান—মাপ করো'। ভেবেছিলেন আমি বুঝি অপমানিত বোধ করছি, কিন্তু আমি ওঁর অবস্থাটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। বলেছিলাম, 'আমাকে এক প্যাকেট সিগারেট দিন না', উনি তখুনি পেছনের তাক-এ হাত বাড়িয়ে আমাকে দু' প্যাকেট সিগারেট দিয়েছিলেন। কাঁদছিলেন। আমি তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে ওর গালে চুমু খেয়েছিলাম। একমাত্র পুরুষ যাকে আমি কখনও চুমু খেয়েছি।

৮

হস্‌ফ্‌নার মারীকে পোশাক পরতে দেখবার সুযোগ পাবে কিম্বা মারী টুথপেস্টের টিউবের ঢাকনায় প্যাঁচ লাগাচ্ছে দেখতে পাবে সেই ভাবনা আমাকে পাগল করে তুলছিল। আমার পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছিল, আর ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ মার্ক পর্যায়ে 'শো' করবার কোন সুযোগ পেতে পারি কিনা সে বিষয়ে আমি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছিলাম। আমার যন্ত্রণার আর এক কারণ, মারীর টুথপেস্টের ঢাকনার প্যাঁচ লাগানোর ব্যাপারে হস্‌ফ্‌নার-এর কোনও উৎসাহই হয়ত নেই, এই ভাবনা। আমার যৎসামান্য অভিজ্ঞতা অনুসারে ক্যাথলিকদের খুঁটিনাটি তলিয়ে দেখবার সামান্যতম ক্ষমতাও নেই। হস্‌ফ্‌নার-এর ফোন নম্বর আমার কাগজটায় লেখা ছিল, কিন্তু সে নম্বর ডায়াল করবার মত মানসিক অবস্থা তখন আমার ছিল না। কিছুই বলা যায় না নীতিগত বিপর্যয়ের চাপে কে কখন কি করতে বাধ্য হয়, আর হয়ত এমনও হতে পারে হস্‌ফ্‌নারকে সত্যি সত্যিই বিয়ে করে ফেলেছে মারী। এখন যদি শুনি মারী বলছে, ইয়েস, মিসেস হস্‌ফ্‌নার বলছি—তখন ব্যাপারটা কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না। লেয়োর সঙ্গে কথা বলবার জন্য আমি ডাইরেক্টরীতে থিয়োলজী স্কুল খুঁজেছি কিন্তু পাইনি, অথচ আমি জানি দুটো জায়গাই আছে, লেয়োনিনুম আর আলব্যার্টিনুম। অবশেষে ফোনটা তুলে এনকোয়ারীর নম্বরটা ডায়াল করবার শক্তি জড়ো করতে পারলাম; কানেক্‌শানও পেয়ে গেলাম। ওদিকে যে মেয়েটা ফোন ধরেছিল, সে রাইন এলাকার টানে কথাও বলেছিল। কখনো কখনো রাইন এলাকার টানে কেউ কথা বলছে শুনতে আমি ভেতরে ভেতরে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠি যে, কোন হোটেল থেকে কিংবা যে-কোন জায়গা থেকে বন্‌-এর কোন একটা টেলিফোন হাউস-এ ফোনও করে বসি। এবং সে কেবল ওই নির্ভেজাল অসামরিক ভাষা শুনবার জন্যই, ওতে সেই 'R'-এর উচ্চারণ নেই, যে ধ্বনিটা বলতে গেলে সামরিক শৃংখলার মূলে ভিত্তি।

মাত্র পাঁচবার শুনেছিলাম 'দয়া করে অপেক্ষা করুন', তারপরেই একটা মেয়ের গলা শুনতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি ঐ সব জায়গাগুলোর নাম চাই যেখানে ক্যাথলিক পাদ্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।' আমি বলেছিলাম, 'ডাইরেক্টরীতে থিয়োলজী স্কুল খুঁজেছি, পাইনি।' মেয়েটা হেসে উঠেছিল,

বলেছিল ঐসব 'জায়গাগুলো'-কে, মেয়েটি উচ্চারণেও বিশেষ শব্দে দিব্যি কোটেশন মার্ক দিতে পারে—বলে কনভিকট্, আমাকে সে দুটোরই ফোন নম্বর দিয়েছিল। টেলিফোনে মেয়েটির কথা শুনে আমি অনেকটা সুস্থ বোধ করেছিলাম। ওর স্বর বেশ স্বাভাবিক শোনাচ্ছিল, শালীনতার ভান ছিল না, উচ্ছলতাও না, অধিকন্তু স্বর ছিল রীতিমত রাইন এলাকার। ফোনোগ্রাম পাঠাবার ব্যবস্থাও করে উঠতে পেরেছিলাম, কার্ল এমন্ডস্‌কে একটা টেলিগ্রামও পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

যারা নিজেদের বুদ্ধিমান মনে করে, কেন যে তারা সবাই বন্-এর প্রতি ঘেন্না প্রকাশ করা একটা মস্ত দায়িত্ব মনে করে সেটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না। বন্-এর বরাবরই একটা টান আছে, স্বপ্নাচ্ছন্ন টান। যেমন অনেক মহিলার থাকে. আমি তাদের দেখলেই অনুভব করতে পারি যে, তাদের মধ্যে একটা ঘোর ভাবের স্বাদু আছে। অবশ্য বন্ কখনো বাড়াবাড়ি সহ্য করে না, অথচ এখানকার লোকেরা একে নিয়ে বাড়াবাড়িটাই বেশী করে। একটা শহরের বাড়াবাড়ি সহ্য হয় না এটা ব্যাখ্যা করে বোঝান যায় না—ওটা আসলে একটা দুর্লভ গুণ। তা ছাড়া এটাও সবাই জানে যে, বন্-এর আবহাওয়া পেনশন পাওয়া লোকেদেরই উপযোগী, এখানকার জল-হাওয়ার সঙ্গে ব্লাডপ্রেসার-এর একটা ভাব আছে। বন্-এর সঙ্গে যা আদৌ মানায় না তা হচ্ছে এই আত্মরক্ষামূলক অস্বস্তি। মিনিস্ট্রির পদস্থ লোক, নির্বাচিত সদস্য. জেনারেল প্রভৃতির সঙ্গে কথা বলবার যথেষ্ট সুযোগ আমি বাড়িতে পেয়েছি, কেননা মা ছিল আসলে পার্টি পিসী। ওরা সকলেই কেমন যেন খিটখিটে মেজাজ নিয়ে থাকত, আত্মরক্ষার ব্যাপারে কেমন যেন একটা প্রায় কাঁদো কাঁদো ভাব সকলের। বন্‌কে নিয়ে ওদের মুখে যেন একটা শহীদের বিদ্রূপাত্মক হাসি সব সময় লেগে থাকে। আমি এই অকারণ ব্যতিব্যস্ত ব্যাপারটার অর্থ বুঝি না। একজন মহিলা, যার স্বাদু হচ্ছে তার তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব. সে যদি হঠাৎ উদ্দামভাবে 'ক্যান-ক্যান' নাচতে শুরু করে তবে ধরে নিতে হবে, সে নেশাচ্ছন্ন, কিন্তু একটা পুরো শহরকে নেশাচ্ছন্ন করা সম্ভব নয়। একজন বুড়ো মাসিমা গোছের লোক পুলোভার বোনা কুরুশ কাঁটায় টেবিল ক্লথ বোনা বা শেরী পরিবেশন করা শেখাতে পারে—তাই বলে তার কাছে তো আর আশা করতে পারি না যে, সে সমকামিতার ওপর ঝাড়া দু'ঘণ্টা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং প্রাঞ্জল বক্তৃতা দেবে কিংবা নারীঘটিত কেচ্ছা শুরু করে দেবে। বন্-এর সবাই তো সেই করুণ আশা নিয়েই আছে। ভুল আশা, ভুল লজ্জা,

ভুল অনুমান—অস্বাভাবিক,কৃত্রিম। এমনকি, যদি পবিত্র গীর্জার কোনও প্রতিনিধি সৎ মেয়ের অভাব সম্পর্কে নালিশ করে তাহলেও আমি অবাক হব না। বাড়িতে একবার এক পার্টিতে আলাপ হয়েছিল এক রাজনৈতিক দলের লোকের সঙ্গে। সে বেশ্যাবৃত্তি প্রতিরোধ সমিতির সভ্য ছিল। আমার কাছে সে বন্-এ যে সৎ মেয়ের কত অভাব তাই নিয়ে অনেকক্ষণ ফিসফিস করে নালিশ জানিয়েছিল। প্রচুর সরু সরু গলি, বই-এর দোকান, ছাত্র-সমিতি, ছোট ছোট কেক-রুটির দোকান, তার পেছন দিকে কফিঘর ইত্যাদি নিয়ে বন্ সত্যিই তেমন খারাপ ছিল না।

লেয়োকে টেলিফোন করার আগে আমার জন্মস্থান বন্‌কে একবার দেখে নেবার জন্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ব্যালকনিতে গেলাম। বন্-ক্যাথেড্রাল, সাবেক-কালের সম্ভ্রান্ত প্রাসাদের ছাত, বেঠোফেনের স্মৃতিস্তম্ভ, ছোট্ট বাজার, প্রাসাদ কানন, পার্ক, বন্—শহরটা সত্যি সুন্দর। বন্-এর নসিব—বন্-এর নসিবে কেউ বিশ্বাস করে না। ওপরে আমার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আমি বুক ভরে বন্-এর বাতাসে নিশ্বাস নিলাম। অবাক কাণ্ড তাতে আমি অনেকখানি সুস্থবোধ করলাম। কয়েক ঘণ্টার জন্যে বায়ু পরিবর্তনের পক্ষে বন্ অসামান্য বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে পারে।

ব্যালকনি থেকে সরে গেলাম, ঘরে গিয়ে কোনও রকম ইতস্তত না করে লেয়ো যেখানকার ছাত্র সেখানকার নম্বর ডায়াল করলাম। আমি বেশ বিব্রত বোধ করছিলাম। লেয়ো ক্যাথলিক হবার পর আমি ওকে আর দেখিনি। ওর ধর্মান্তরের কথা ও আমাকে জানিয়েছিল ছেলেমানুষীভরা নিখুঁত এক চিঠি দিয়ে—লিখেছিল, 'প্রিয় ভাই, এতদ্দ্বারা আমি তোমাকে জানাইতেছি যে, যথেষ্ট চিন্তা করিয়া ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হইবার এবং পাদ্রী-জীবন বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছি। আশা করি, আমার জীবনের এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে মৌখিক আলোচনার সুযোগ অদূর ভবিষ্যতে পাইব। তোমার প্রিয় ভাই লেয়ো।' 'আমি' দিয়ে চিঠি শুরু করা এড়িয়ে যাবার প্রচণ্ড চেষ্টা, 'আমি তোমাকে জানাইতেছি' না লিখে 'এতদ্দ্বারা আমি তোমাকে জানাইতেছি' লেখার সাবেকী ধরন একমাত্র লেয়োকেই মানায়। যে মার্জিত রুচির সঙ্গে ও পিয়ানো বাজায় তা নেই। সব ছকে বাঁধা ভাব আমার বিষাদকে বাড়িয়ে তোলে। এভাবে চললে ও অবশেষে এক সম্ভ্রান্ত, শুভ্রকেশ বিশপ বা তার চেয়েও বড় কিছু হবে। এ ব্যাপারে—এই চিঠি লেখার ধরনে—বাবা এবং

লেয়োর একই দুরবস্থা। যে কোনও ব্যাপারেই লিখুক না কেন মনে হবে সবজীসংক্রান্ত ব্যাপার বুঝি।

ওখানে কেউ এসে দয়া করে টেলিফোন ধরতে বেশ খানিকটা সময় নেয়। গীর্জার এই ঢিলেমিতে বিরক্ত আমার তখনকার মেজাজ অনুযায়ী কড়া ভাষা ব্যবহার করতে যাব, এমন সময় কে একজন ওপাশে ফোন ধরল, একটা চমক লাগার মত ফ্যাশফেশে গলায় বলল, 'বলুন'? আমি হতাশ হয়ে গেলাম। আমি আশা করেছিলাম কোন নান্-এর এক কোমল গলা, যার গন্ধ হবে পাতলা কফি আর শুকনো কেক্-এর মত, তার বদলে একজন হেঁপো পুরুষ, আর তার গায়ে মটরশুটি আর বাঁধাকপির গন্ধ। এমন এক দম বন্ধ করা গন্ধ যে আমি কাশতে শুরু করে দিয়েছিলাম।

'মাপ করবেন।' শেষমেশ বললাম আমি, 'থিয়োলজীর ছাত্র লেয়ো শ্নীয়ার-এর সঙ্গে কথা বলতে পারি?

'কার সঙ্গে কথা বলছি?'

বললাম, 'শ্নীয়ার', বোঝা গেল, শব্দটা তার বোধগম্য হল না। লোকটা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল, আমি আবার কাশতে শুরু করে দিয়েছিলাম, নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'আমি বানান করছি—এস সি এচ্ যেমন স্কুল, নর্থপোল, ইডা, এমিল, রিচার্ড।' 'কি বলছেন সব?' লোকটা বলল অবশেষে। আমার মনে হল, আমার জানা যাবতীয় হতাশা যেন তার গলায় শুনলাম। ওরা বোধহয় একজন ভাল মানুষ, বয়স্ক প্রফেসরকে, যিনি পাইপ খান তাঁকে টেলিফোনে বসিয়ে দিয়েছে। তাড়াহুড়ো করে কয়েকটা ল্যাটিন শব্দ জড়ো করে বেপরোয়াভাবে বলে ফেললাম, 'Sum frater leonis'। নিজের কাছে নিজেকেই দোষী মনে হল, অনেকের কথা মনে পড়ল যাদের কখনো-সখনো ইচ্ছে হয় – যারা কখনো কোন ল্যাটিন শব্দ শেখেনি তাদের সঙ্গে ল্যাটিন ভাষায় কথা বলতে।

অবাক কান্ড! লোকটা খিক্ খিক্ করে হেসে উঠে বলল, 'Frater tuus est in refectorio—খেতে বসেছে', একটু জোরে বলল, 'ওরা সবাই খেতে বসেছে আর খাবার সময় ব্যাঘাত করা যাবে না।'

বললাম, 'ব্যাপারটা খুব জরুরী'।

'পরিবারের কেউ কি মারা গেছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না', আমি বললাম, 'তবে প্রায় সেই রকমই।'

'তাহলে, সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ?' সে জানতে চাইল।

'না, তবে আভ্যন্তরীণ দুর্ঘটনা।' আমি বললাম।

'আঃ', এবার তার গলাটা একটু নরম শোনাল, 'আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ।'

'না', আমি জবাব দিলাম, 'আত্মা, সম্পূর্ণ আত্মার ব্যাপার।' বুঝলাম শব্দটা কোনদিন ও শোনেনি, কেমন বরফের মত জমে গেল।

'হায় ভগবান', আমি বললাম, 'একটা মানুষের দেহও থাকে আবার আত্মাও থাকে, সেকথা মানবেন তো।'

লোকটার মুখে বিড়বিড় শব্দ শুনে মনে হল এ ব্যাপারে তার সন্দেহ আছে। পাইপ টানার ফাঁকে বলল, 'আউগুস্টিন বোনাভেন্টুরা—কুসানুস—আপনি ভুল পথে চলেছেন।'

'আত্মা', আমি গোঁয়ার্তুমি করে বললাম, 'দয়া করে গ্রীয়ারকে বলবেন, তার ভাইয়ের আত্মিক সংকট উদ্বেগজনক। সে যেন খাওয়া শেষ হলেই ফোন করে।'

'আত্মা', ঠাণ্ডা গলায় বলল লোকটা, 'ভাই, উদ্বেগজনক।' এমন গলায় বলল যেন, জঞ্জাল, আবর্জনা কি দুধের বালতির কথা বলছে। আমার ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত মনে হল। আর যাই হোক, ওখানে তো ছাত্রদের ভবিষ্যতে আত্মার শান্তির ব্যবস্থা সম্বন্ধে শেখানো হয়, তাই আত্মা শব্দটা তো লোকটার জানা উচিত। 'ব্যাপারটা খুবই জরুরী', বললাম।

লোকটা কেবল 'হুম, হুম' করল, লোকটা বুঝতেই পারছিল না যে, আত্মা-সংক্রান্ত ব্যাপার কিছু জরুরী হতে পারে।

'আমি বলব', বলল সে, 'স্কুলের ব্যাপারটা কী যেন ?'

'কিছু না', জবাব দিলাম, 'কিছু না। এ ব্যাপারে স্কুলের কোনও সম্পর্ক নেই। আমি নামের বানানটা করবার জন্য শব্দটা ব্যবহার করেছিলাম।'

'আপনি বুঝি বিশ্বাস করেন, ওরা স্কুলে বানান করা শেখে। আপনি সত্যি সত্যিই তা বিশ্বাস করেন ?' লোকটার উৎসাহ দেখে মনে হল, তার প্রিয় বিষয় নিয়ে কথা তুলেছি। 'বড্ড বেশী নরম আজকালকার ব্যবস্থা' চেঁচিয়ে বলল সে, 'বড্ড বেশী নরম।'

বললাম, 'নিশ্চয়, স্কুলে অনেক বেশী বেত চালান উচিত।'

'তাই তো উচিত, তাই না,' উজ্জ্বল স্বরে বলল সে।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বিশেষ করে মাস্টারদের পেটানো উচিত খুব করে।

মনে আছে তো আপনার, আমার ভাইকে খবরটা দিতে হবে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। লিখে নিয়েছি', সে বলল, 'জরুরী আত্মঘটিত ব্যাপার। স্কুলসংক্রান্ত ব্যাপারটা এবার শুনুন, আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই সুবাদে আপনাকে একটা পরামর্শ দেব?'

'ওঃ, অবশ্যি দেবেন।' আমি সায় দিলাম।

'আউগ্‌সটিনুস-এর কথা বাদ দিন। নিপুণ কৌশলে সাজান-গোছান সাবজেক্‌টিভিটি থিয়োলজীর পাশ দিয়েও যায় না। আর তা কিশোর প্রাণের যথেষ্ট ক্ষতিও করে। দু'চারটে ডায়ালেক্‌টিক্যাল এলিমেণ্ট ঢুকিয়ে জার্নালিসম করা ছাড়া ওটা আর কিছুই নয়। আমার এই পরামর্শের জন্য রাগ করলেন না তো?'

'না, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, আমার আউগ্‌সটিনুসকে আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।' বললাম আমি।

'ঠিক', প্রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সে, 'পুড়িয়ে ফেলুন। ঈশ্বর আপনার সহায়।' আমি প্রায় ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তা কেমন অপ্রয়োজনীয় মনে হল, তাই রিসিভারটা স্রেফ রেখে দিয়ে ঘাম মুছলাম। আমি অত্যন্ত গন্ধকাতর আর ঐ বাঁধাকপির কড়া গন্ধ আমার অলস নার্ভগুলোকে নাড়া দিচ্ছিল। গীর্জার কাণ্ডকারখানার কথাও ভাবছিলাম: অবশ্য ওরা যদি একজন বয়স্ক লোককে বুঝিয়ে দিতে চায়, সে এখনও কাজের যোগ্য, তো ভাল কথা। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না, কানে কম শোনে এবং খামখেয়ালী এমন এক বুড়োকে টেলিফোনে বসাবার মানেটা কি। বাঁধাকপির ঐ গন্ধ আমি বোর্ডিং স্কুল থেকে চিনি। সেখানে একজন পাদ্রী আমাদের বুঝিয়েছিল যে, বাঁধাকপি চিত্তচাঞ্চল্য দমন করে; কিন্তু কেউ আমার কিংবা অন্য কারো চিত্তচাঞ্চল্য দমন করছে ভাবতেও আমার গা ঘিন ঘিন করে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ওরা দিনরাত শুধু ঐ 'রক্তমাংসের ক্ষুধা'র কথাই ভাবে। কোথাও কোন এক রান্নাঘরে নিশ্চয় এক নান্‌ বসে আছে যে রান্নার ফর্দ তৈরি করে। তখন ডাইরেক্টরের সঙ্গে সে ওই ব্যাপার নিয়ে কথা বলে। দু'জনে মুখোমুখি বসে, ও নিয়ে কথা বলে না বটে তবে ভাবে, ফর্দে লেখা প্রত্যেক খাদ্য প্রসঙ্গে জানে: এতে উপশম হবে, এতে উত্তেজনা হবে। এরকম একটা দৃশ্য আমার কাছে পরিষ্কার অশ্লীলতা বলে মনে হয়। ঠিক বোর্ডিং স্কুলের ওই জঘন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফুটবল খেলার মত; আমরা সবাই জানতাম, ওই খেলা আমাদের ক্লান্ত

করে ফেলবে, যাতে করে মেয়েদের চিন্তা আমাদের মাথায় আর না আসে। কথাটা ভাবলে ফুটবল খেলায় আমার বিতৃষ্ণা জন্মায়। আর যখন মনে হয়, আমার ভাই লেয়োকে বাঁধাকপি খেতে হয় যাতে তার চিত্তচাঞ্চল্যের উপশম হয়, তখন দারুণ ইচ্ছে হয় ওখানে গিয়ে সব বাঁধাকপির মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড ঢেলে দিই। ওখানে ওই ছেলেদের এমনিতেই যা সব করতে হয় তাই যথেষ্ট কষ্টকর, তার কাছে আবার বাঁধাকপি কোথায় লাগে! রক্তমাংসের পুনরুজ্জীবন এবং অনন্ত জীবন ইত্যাদি দারুণ দারুণ সব অবিশ্বাস্য বিষয়ে প্রত্যেক দিন জ্ঞান নেওয়া নিঃসন্দেহে বিশ্রী রকম কঠিন—তার ওপরে আবার ঈশ্বরের আঙুর বাগানে চাষ করে বেড়ান এবং দেখা কি যৎসামান্য ফল মিলল তা থেকে। মারীর যেবার গর্ভপাত হয়, হাইনরিখ বেলেন সেবার আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছিল। সে আমাকে ব্যাপারটা সব বুঝিয়ে দিয়েছিল। আমার সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে বলতো 'ঈশ্বরের আঙুর বাগানের আনাড়ী কর্মী', সেটা মেজাজের দিক থেকেই হোক, কিম্বা প্রাপ্তির দিক থেকে।'

পাঁচটার সময় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আমি তাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছিলাম, হেঁটে যাচ্ছিলাম আমরা। কারণ ট্রামে যাবার মত পয়সা আমাদের ছিল না। বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে সে যখন পকেট থেকে চাবির গোছা বার করছিল, তখন রাতের ডিউটি সেরে ফেরা শ্রমিকের সঙ্গে তার বিশেষ তফাৎ ছিল না—ক্লান্ত। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আমার মনে হচ্ছিল তখন গীর্জায় গিয়ে তার পক্ষে 'ম্যাস' পাঠ অসম্ভব, সেইসব রহস্যময় খুঁটিনাটি কথা, মারী প্রায়ই আমাকে যা বলত। মারী সব সময় আমাকে ওসব বলত। হাইনরিখ দরজা খুলতে দেখা গেল সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার বাড়ির মালকান, এক বিষণ্ণ বয়স্কা মহিলা। পায়ে চটি। নগ্ন পায়ের চামড়া একদম হলুদ; কোন মানুষ নয়, তার মা কি বোনও না, সে খেঁকিয়ে উঠেছিল, 'এর মানে কী, এর মানে?' এই ক্লিষ্ট নিকৃষ্ট অবিবাহিত জীবন! যাক গে গোল্লায় যাক; আমি এতটুকু আশ্চর্য হইনা যখন দেখি, কোনও কোনও ক্যাথলিক বাবা-মা তাদের যুবতী মেয়েকে কোনও পাদ্রীর বাড়িতে পাঠাতে ভয় পায়। আর এইসব হতভাগা ব্রহ্মচারীরা যদি কখনও কোনও কাণ্ড করে বসে তাতেও আমি আশ্চর্য হই না।

লেয়োর কনভেণ্ট-এর ঐ বুড়ো কালা পাইপখোরকে আবার ফোন করতে যাচ্ছিলাম প্রায়। তার সঙ্গে 'রক্তমাংসের ক্ষুধা' প্রসঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছা

হচ্ছিল। আমার পরিচিত কাউকে ফোন করতে সাহস হচ্ছিল না। এই অপরিচিত লোকটা হয়ত আমাকে অনেক ভাল বুঝতে পারবে। লোকটাকে জিজ্ঞেস করতে খুব ইচ্ছা হচ্ছিল ক্যাথলিসিজম সম্বন্ধে আমার ধারণা ঠিক কিনা। আমার কাছে এ পৃথিবীতে মোট চারজন ক্যাথলিক আছে—পোপ জোহান্নেস, আলেক্‌ গিয়েস্‌, মারী আর গ্রেগরি। গ্রেগরি এক নিগ্রো বক্সার, এখন বুড়ো হয়ে গেছে, সে এখন বিভিন্ন জায়গায় কসরত দেখিয়ে কায়ক্লেশে বেঁচে আছে। একবার তো প্রায় বিশ্বচ্যাম্পিয়নই হয়ে গেছিল! তারপর জলসায় জলসায় পালোয়ানের খেলা দেখিয়ে কোনও মতে খোরাক চালাত। খেলা দেখিয়ে বেড়াবার সময় প্রায়ই আমাদের সঙ্গে দেখা হতো ওর। লোকটা ছিল খুব সৎ, প্রকৃত ধার্মিক, নিয়মিত গীর্জায় যেত, ধর্মসেবীদের তৃতীয় বর্গের সভ্য ছিল সে। তার বিশাল বক্সারের পাটার মত বুকে সে তার খ্রীস্টীয় সন্ন্যাসীর ফলকটা সব সময় ঝুলিয়ে রাখত। বেশির ভাগ লোকেরই ধারণা ছিল, লোকটা জড়ভরত। কারণ কথা প্রায় বলতই না, শশা আর রুটি ছাড়া বিশেষ কিছুই খেত না। কিন্তু গায়ে এত জোর ছিল যে, আমাকে আর মারীকে পুতুলের মত হাতে করে ঘরময় বয়ে বেড়াতে পারত। আরও দু'চারজন ছিল, যাদের ক্যাথলিক হবার সম্ভাবনা খুব বেশি ছিল : কার্ল এমন্ডস্‌ আর হাইনরিখ বেলেন, এমনকি 'ৎস্যুফ্‌নারও। মারীর বেলা আমার সংশয় শুরু হয়েছিল; ওর ঐ 'মেটাফিসিক্যাল শক' আধিদৈবিক আঘাত ব্যাপারটা আমি বুঝতাম না। এই যে মারী এখন ৎস্যুফনার-এর কাছে গিয়ে আমার সঙ্গে যা করত সেই সব করছে—এ সব তো ওর বইগুলোতে ব্যভিচার এবং কুমারী জীবন অপবিত্র করার অপরাধ বলে পরিষ্কার লেখা আছে। ওর মেটাফিসিক্যাল শক্‌-এর একমাত্র কারণ কেবল আমার রেজিস্ট্রী বিয়েতে আপত্তি এবং আমাদের সন্তানদের ক্যাথলিক প্রথায় মানুষ করতে আমার অনিচ্ছা। আমাদের তখন সন্তানই হয়নি। কিন্তু ওদের কি পোশাক পরাব, ওদের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলব, ওদের কি ভাবে মানুষ করব এসব নিয়ে কথা বলতাম। ঐ ক্যাথলিক প্রথা ছাড়া আর সব ব্যাপারেই আমরা একমত ছিলাম। আমি 'ব্যাপ্‌টাইজ' করতে দিতেও রাজী ছিলাম। মারী বলেছিল, আমাকে লিখে দিতে হবে, নইলে গীর্জায় গিয়ে আমাদের বিয়ে হবে না। আমি যখন গীর্জায় গিয়ে বিয়ে করতে রাজী হলাম তখন দেখা গেল যে, আমাদের রেজিস্ট্রী বিয়েও করতে হবে—তখন আর আমার ধৈর্যে কুলাল না, আমি বললাম, তবে আমাদের আরও একটু অপেক্ষা

করতে হবে, খুব বেশি নয়, এই বছরখানেক। তাতে ও কেঁদে ফেলেছিল— আমি নাকি ঠিক বুঝতে পারছি না, যেখানে সন্তানদের ব্যাপটাইজ করবার কোনও সম্ভাবনা নেই, সেখানে ওর বেঁচে থাকাটা কী বিশ্রী ব্যাপার। ব্যাপারটা বিশ্রীই বটে। কারণ বেরিয়ে পড়ল যে, আমরা এই এক প্রসঙ্গ নিয়েই পাঁচ বছর ধরে শুধু কথা কাটাকাটি করে চলেছি। আমি সত্যি সত্যিই জানতাম না গীর্জায় বিয়ে করতে যাবার আগে রেজিস্ট্রী বিয়ে করতে হয়। একজন পরিণত বয়সের নাগরিক এবং একজন 'দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ' হিসেবে আমার তা নিশ্চয় জানা উচিত ছিল। কিন্তু আমি তা স্রেফ জানতাম না, এই যেমন আমি ক'দিন আগেও জানতাম না যে, হোয়াইট ওয়াইন ঠাণ্ডা আর রেড ওয়াইন সামান্য গরম পরিবেশন করতে হয়। এ কথা অবশ্য জানতাম যে, বিয়ে রেজিস্ট্রী বলে একটা অফিস আছে; সেখানে কোন একটা বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয় আর সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, কিন্তু আমি ভাবতাম ওসব গীর্জায় অবিশ্বাসী লোকদের জন্য এবং যারা সরকারকে একটু খুশি করতে চায় তাদের জন্য। যখন জানতে পারলাম, বিয়ের আগে গীর্জায় যেতেই হয় তখন আমার বেশ রাগ হয়েছিল, আর তারপর মারী যখন বলতে শুরু করল যে, আমাদের সন্তানকে ক্যাথলিক প্রথায় মানুষ করবার সম্মতি আমাকে লেখাপড়া করে দিতে হবে তখন আমাদের খুব ঝগড়া হয়েছিল। এই লিখিত সম্মতি আদায় করে নেবার ব্যাপারটা আমার আদৌ ভাল লাগেনি। ব্যাপারটা আমার কাছে আগাগোড়াই ব্ল্যাকমেইল মনে হয়েছিল, ওর যেমন ইচ্ছে তেমনভাবেই সন্তানদের মানুষ করবে, ইচ্ছে হলে তাদের ক্রাইস্টেন করবে, তা তো ও নিশ্চয় করতে পারত। বাধা তো ছিল না কোনও।

সেদিন সন্ধ্যায় মারীর অবস্থা বেশ খারাপ ছিল। ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল আর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বেশ চেঁচিয়ে কথা বলছিল। আমি বললাম, আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি সবকিছু করতে রাজী, লিখে-পড়ে দিতেও আপত্তি নেই। তাতে ও রেগে গিয়েছিল, 'সেটা করবে এখন স্রেফ দায় এড়ানোর জন্য। এই প্রচলিত নিয়মগুলোর সত্যে বিশ্বাস করে নয়।' উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'হ্যাঁ।' কারণ আমি সত্যি সত্যিই ঝামেলা এড়িয়ে যেতে চেয়েছি। আর সারাজীবন মারীকে আমার কাছে পাবার জন্য গীর্জায় যেতেও রাজী হয়েছি, এমন কি আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যাথলিক হতেও রাজী শুধু ওকে আমার কাছে রাখবার জন্য। আমার অবস্থা করুণ হয়ে উঠেছিল, আমি নাটকীয়ভাবে

বলেছিলাম, বিমূর্ত ধর্মীর শৃংখলার কথায় আমার জেলখানার ঠাণ্ডাঘরের কথা মনে পড়ে। ওকে কাছে পাওয়ার জন্যে আমি ক্যাথলিক হতে চাইছি শুনে মারী খুব অপমান বোধ করেছিল ; কিন্তু আমার মনে হয়েছিল আমি এতে করে একটা দারুণ প্রশংসা করেছি ওকে। ও বললে, 'এটা এখন আর তোমার আমার ব্যক্তিগত কথা নয়, কথা হচ্ছে নিয়ম শৃংখলা নিয়ে।'

তখন সন্ধ্যা। হ্যানোভার-এর একটা হোটেলে তখন আমি। ওইসব দামী হোটেলগুলোর একটাতে, যেখানে এক কাপ কফি চাইলে তিনপো কাপ কফি পাওয়া যায়। ওইসব হোটেলের মানুষগুলো এত কেতাদুরস্ত যে তাদের কাছে পুরো কাপ কফিটা একটা হ্যাংলামির পর্যায়ে পড়ে। আর কেতা কাকে বলে তা ওইসব হোটেলে যারা থাকতে আসে তাদের চেয়ে ওখানকার চাপরাশীরা অনেক ভাল বোঝে। এই হোটেলগুলোতে থাকার সময় আমার মনে হতে যেন আমি কোন বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ এবং বৈচিত্র্যহীন বোর্ডিং স্কুলে আছি। তখন আমার মরার মত ক্লান্ত অবস্থা—পর পর তিনটে শো। বিকেলে কিছু ইস্পাত ব্যবসায়ীদের সামনে, তারপর হবু মাস্টারমশাইদের সামনে। সন্ধ্যায় একটা জলসায়, সেখানে হাততালির বহর এত কম ছিল যে, আমার অদূরবর্তী পতনের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। তারপর যখন এই অপদার্থ হোটেলটায় এসে ঘরে বীয়ার দিয়ে যেতে বলেছিলাম তখন হেড্ চাপরাশী টেলিফোনে এমন অসম্ভব ঠাণ্ডা গলায় 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার' বলেছিল যেন আমি গোবর সার চেয়েছি। একটা রুপোর মগে ভরা বীয়ার এনে দিয়েছিল। আমার খুব অবসন্ন লাগছিল, আমি কেবল চাইছিলাম—কিছু বীয়ার খেয়ে, একটুখানি লুডো খেলে, স্নান করে, সন্ধ্যার কাগজ পড়ে মারীর পাশে ঘুমিয়ে পড়তে। ডান হাতটা ওর বুকের মধ্যে আর আমার মুখটা ওর মাথার এত কাছে রেখে যাতে ঘুমের মধ্যেও চুলের গন্ধ পেতে পারি। আমার কানে তখনও ঐ দায়সারা হাততালির শব্দ বাজছিল। তার চেয়ে ওরা সবাই যদি বুড়ো আঙুলগুলো মাটির দিকে দেখাত তাহলে বোধহয় অনেক ভাল হতো। ওই ক্লান্তিকর, দায়সারা হাততালি এই রুপোর মগের বীয়ারের মতই স্বাদহীন। তখন কোনও দার্শনিক আলোচনা করবার মত মনের অবস্থাই আমার ছিল না।

'আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, হান্স,' ও বলেছিল, গলাটা একটু নামিয়ে। ও একবার খেয়ালও করেনি, ও বোধহয় ভুলেই গিয়েছিল যে, 'ব্যাপারটা' আমাদের কাছে বিশেষ অর্থপূর্ণ। খাটের পায়ের দিকে পায়চারি করতে করতে কথা বলবার

সময় মারী সিগারেট শূন্যে হাতটা এমন সুন্দরভাবে নাড়ছিল যে, ছোট ছোট ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো বিন্দুর মত দেখাচ্ছিল। ও ইতিমধ্যে সিগারেট খাওয়া শিখেছিল। হাল্কা সবুজ পুলোভার গায়ে ওকে সুন্দর দেখাচ্ছিল—সাদা চামড়া, চুল আগের চেয়েও কালো, ওর গলায় সেই প্রথম লক্ষ্য করি ত্রিবলী। আমি বলেছিলাম, 'একটুখানি দয়া কর। আমাকে একটু ঘুমোতে দাও। কাল সকালে ব্রেকফাস্ট খাবার সময় আবার ওসব কথা হবে। বিশেষ করে ঐ 'ব্যাপারটা' নিয়ে।' কিন্তু ওর কোনও খেয়ালই ছিল না। ঘরে দাঁড়িয়েছিল বিছানার সামনে। আমি ওর ঠোঁট দেখতে পাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল সেখানে এই ব্যাপার তোলার এমন একটা উদ্দেশ্য ছিল যাতে ওর নিজেরই কোন সম্মতি ছিল না। ও যখন সিগারেটে টান দিচ্ছিল তখন ওর ঠোঁটের চারপাশে এমন কতকগুলো ভাঁজ লক্ষ্য করেছিলাম যেগুলো আগে কখনও দেখিনি। ও মাথা নাড়তে নাড়তে আমার দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলে আবার ঘরে পায়চারি শুরু করেছিল।

'আমি ঠিক বুঝতেই পারছি না', বলেছিলাম ঘুম-জড়ানো গলায়, 'প্রথমে আমরা ঐ জবরদস্তি লেখাপড়া নিয়ে কথা কাটাকাটি করলাম—তারপর রেজিস্ট্রী বিয়ে নিয়ে—এখন আমি দুটোতেই রাজী, অথচ তুমি যেন আগের চেয়েও বেশী রেগে উঠেছ।'

'হ্যাঁ', ও বলেছিল,'আমার কাছে সবটাই বড় বেশী হড় বড়ে মনে হচ্ছে, আমি সন্দেহ করছি, তুমি একটা মীমাংসা এড়িয়ে যেতে চাইছ। আসলে তুমি কি চাইছ বল ত?'

'তোমাকে,' আমি বলেছিলাম। আমি জানি না কোনও মহিলাকে এর চেয়ে মিষ্টি কিছু বলা যায় কিনা। 'এস, আমার পাশে এসে শোও আর অ্যাশট্রেটা নিয়ে এস। এতে করে কথা বলার অনেক সুবিধা হবে।' ওর সামনে 'ব্যাপার' শব্দটা আর উচ্চারণ করতে পারিনি। ও মাথা নাড়ল, অ্যাশট্রেটা আমার সামনে বিছানার ওপর রেখে জানলার সামনে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল। আমি ভয় পেলাম। বললাম, 'এই আলোচনার কি একটা যেন আমার বিশেষ ভাল ঠেকছে না। আলোচনার সবটা ঠিক তোমার কথা বলে মনে হচ্ছে না।'

'তবে কার কথা বলে মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল সে খুব আস্তে। আমি ওর ওই হঠাৎ মৃদু হয়ে যাওয়া স্বরে ভুল করে বসলাম।

বললাম, 'বন্-এর গন্ধ পাচ্ছি, সেই চক্রের, সম্মারবিল্ড আর ৎস্যুফনার-এর

—আর কি যেন সব নাম—তাদের।'

'বোধ হয়', সে ঘুরে না দাঁড়িয়েই বললে, 'বোধ হয়, তোমার চোখ যা দেখেছে তা তোমার কান শুনেছে বলে মনে করছে।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না', ক্লান্ত স্বরে আমি বললাম, 'তুমি কী বলতে চাইছ?'

'আহা, তুমি যেন জান না যে, এখানে ক্যাথলিকদের কনফারেন্স হচ্ছে।' মারী জবাব দিল।

'পোস্টার দেখেছি', আমি বললাম।

'আর হেরিব্যার্ট আর সম্মারউইল্ড এখানে আসতে পারে, একথা তোমার মাথায় ঢোকেনি বুঝি?'

আমি জানতাম না, শ্‌স্‌ফ্‌নার-এর ডাকনাম হেরিব্যার্ট। ও ওই নামটা উচ্চারণ করতেই বুঝতে পারলাম একমাত্র ওর কথাই বলছে মারী। আমার মনে পড়ে গেল সেই হাত ধরাধরি করে হাঁটার কথা। আমি লক্ষ্য করেছিলাম হ্যানোভারে যা মানায় নান্‌ আর ক্যাথলিক পাদ্রীতে মিলে শহরে এখন সংখ্যাটা যেন তার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু এটা আমি ভাবিনি যে মারীর সঙ্গে এখানে তাদের কারোর দেখা হয়ে যাবে। আর তা হলেই বা—দু' চারদিন কাজ না থাকলে তো আমরা মাঝে মধ্যে বন্‌-এ গেছি, আর তখন মারী সেই পুরো 'চক্র' চুটিয়ে উপভোগ করেছে।

'এখানে এই হোটেলে এসেছিল?' জানতে চেয়েছিলাম ক্লান্ত গলায়।

'হ্যাঁ', ও বলেছিল।

'আমার সঙ্গে দেখা করাওনি কেন?'

'তুমি তো এখানে ছিলে না বললেই হয়', জবাব দিয়েছিল মারী, 'এক সপ্তাহ ধরে শুধু ঘুরে বেড়িয়েছ—ব্রাউনশ্বোয়াইগ, হিল্ডেসহাইম, সেলে…'

'কিন্তু, এখন তো আমি এখানে, ওদের ফোন কর, আমরা নিচে বারে গিয়ে কিছু একটা খাই।'

'ওরা চলে গেছে, আজ বিকেলে রওনা হয়ে গেছে ওরা।'

বললাম, 'আমার ভাল লাগছে এই ভেবে যে, তুমি এ ক'দিন ধরে চুটিয়ে 'ক্যাথলিক হাওয়ায়' দম নিতে পেরেছ, হলই বা আমদানী করা।' ওটা আমার কথা নয় ওরই কথা। মাঝে-মধ্যে ও বলত, ক্যাথলিক হাওয়ায় দম নিতে হবে।

মারী বললে, 'তুমি রাগ করছ কেন', ও তখনও রাস্তার দিকে মুখ করে

দাঁড়িয়ে, আবার সিগারেট খাচ্ছিল, আর সেটাও আমার কেমন কেমন লাগছিল, কেমন যেন ওর সঙ্গে মানায় না, ঐ ঘন ঘন সিগারেট খাওয়া, ও যেভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছিল সেই রকম অচেনা মনে হচ্ছিল তখন।

'আমি রাগ করিনি', বললাম, 'তুমি জান সেটা, শুধু একটিবার বল, তুমি তা জান।' ও কোন জবাব দেয়নি, কেবল মাথাটা নেড়েছিল একটু। আর আমি ওর মুখের যেটুকু দেখতে পেয়েছি তাতেই বুঝতে পেরেছি, কান্না চাপতে চেষ্টা করছে মারী। কিন্তু কেন? ওর তো কাঁদাই উচিত, চেঁচিয়ে আরও অনেকক্ষণ ধরে। তাহলে আমি উঠে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে পারতাম। আমি তা পারিনি। কেবল কর্তব্যের খাতিরে কিংবা রুটিন মাফিক কিছু করতে আমার ইচ্ছে হয়নি। আমি শুয়েছিলাম। আমি ৎস্যুফনার আর সম্মারউইল্ড-এর কথা ভাবছিলাম, মারী তিনদিন ধরে ওদের সঙ্গে চলাফেরা করছে, আমাকে এতটুকু জানায়নি পর্যন্ত। ওরা নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে কথা বলেছে। ৎস্যুফনার হচ্ছে আনকোরা পাদ্রীদের সমিতির সভ্য। আমি উঠব না ভাবছিলাম, এক মিনিট, আধমিনিট কিম্বা দু মিনিট ধরে দ্বিধা করেছি। তারপর যখন উঠে ওর কাছে গেলাম ও মাথা নেড়ে ওর কাঁধ থেকে আমার হাতটা নামিয়ে দিয়ে আবার কথা বলতে শুরু করেছিল, ওর ঐ 'মেটাফিজিক্যাল শক' আর নিয়মানুবর্তিতার কথা, এদিকে আমার মনে হচ্ছিল যেন বিশ বছর হয়ে গেছে আমি ওর সঙ্গে বিবাহিত। ওর গলায় একটা জ্ঞান দেওয়ার সুর, আমার এত ঘুম পাচ্ছিল যে, ওর যুক্তিগুলো ধরতে পারছিলাম না, ওগুলো আমার পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমি ওকে থামিয়ে জলসার ঘটনাটা বলেছিলাম, গত তিন বছরের মধ্যে ওই প্রথম অভিজ্ঞতা। জানালার সামনে আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম, নিচের রাস্তার ট্যাক্সিগুলোর যাওয়া-আসা দেখছিলাম, ক্যাথলিক কমিটির সভ্যদের স্টেশনে নিয়ে যাচ্ছিল। নিয়ে যাচ্ছিল নানদের, পাদ্রীদের আর গম্ভীর প্রকৃতির আনকোরাদের। একটা দলের মধ্যে শ্নীৎস্লারকে চিনতে পেরেছিলাম; একজন সুন্দরী-দেখতে নান্-এর জন্য ট্যাক্সির দরজা খুলে ধরেছিল। লোকটা যখন আমাদের বাড়িতে ছিল তখন ছিল ইভাঞ্জেলিস্ট। হয় ধর্ম পালটেছে অথবা ইভাঞ্জেলিস্ট পর্যবেক্ষক হিসাবে এখানে এসে থাকবে। ওর দ্বারা সবই সম্ভব। নিচে সুটকেস টানাটানি হচ্ছিল, হোটেল চাপরাশীদের হাতে বখশিস গুঁজে দেওয়া হচ্ছিল। ক্লান্তিতে আমার সব কেমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল, চোখের সামনে সব ঘুরছিল—ট্যাক্সি আর নানরা, আলো আর সুটকেস। কানের মধ্যে

একটানা বেজে চলেছিল সেই ধুনে, ক্লান্ত হাততালি। মারী তো সেই কখন তার নিরমানুবর্তিতায় বক্তৃতা থামিয়েছে, ও আর সিগারেটও খাচ্ছিল না। আমি যখন জানলা থেকে সরে আসি তখন ও আমার পেছন পেছন এল, আমার কাঁধে হাত রেখে চোখের ওপর চুমু খেল। 'তুমি কি মিষ্টি!' ও বলেছিল তখন, 'কী মিষ্টি আর কী ক্লান্ত'। কিন্তু আমি যখন ওকে জড়িয়ে ধরতে চাচ্ছিলাম, ও আস্তে আস্তে বলল, 'না, না, এখন না, প্লীজ।' আমি ভুল করেছিলাম, ওকে সত্যি সত্যিই ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমি পোশাক-পরা অবস্থাতেই বিছানায় পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর সকালে ঘুম ভাঙতে মারী চলে গেছে দেখে অবাক হইনি। আমি টেবিলের ওপর চিরকুটটা পেয়েছিলাম; 'সেই পথেই আমি যেতে বাধ্য, যে পথে আমাকে যেতে হবে।' ওর বয়স তখন প্রায় পঁচিশ, ওর আর একটু ভাল কিছু মনে পড়া উচিত ছিল। আমার তেমন খারাপ লাগেনি, কেবল মনে হয়েছিল লেখাটা যেন বড্ড কম! আমি সঙ্গে সঙ্গে বসে ওকে একটা লম্বা চিঠি লিখলাম। ব্রেকফাস্টের পর আর একটা, আমি রোজ ওকে চিঠি লিখতাম আর সেগুলো বন্-এ ফ্রেডেবয়েলদের ঠিকানায় পাঠাতাম, কিন্তু কোনও উত্তর পাইনি কোনদিন।

ফ্রেডেবয়েলদের ওখানেও বেশ সময় লেগেছিল, তারপর এল একজন টেলিফোন ধরতে। টেলিফোনের ঐ একটানা শব্দে আমি নার্ভাস হয়ে উঠেছিলাম, আমি মনে মনে আন্দাজ করে নিয়েছিলাম, ফ্রাউ ফ্রেডেবয়েল ঘুমোচ্ছে, টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, আবার ঘুমোচ্ছে, আবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। টেলিফোনের আঘাতে জর্জের ওর কানের যাবতীয় যন্ত্রণা আমি অনুভব করছিলাম। একবার প্রায় রেখে দিতে যাচ্ছিলাম, নিজের প্রয়োজনের অবস্থার কথা ভেবে ওটাকে বেজে যেতে দিলাম। খোদ ফ্রেডেবয়েলকে গভীরতম ঘুম থেকে তুলতে আমি এতটুকু অশান্তি বোধ করছিলাম না। নিশ্চিন্তে ঘুমোবার কোনও অধিকার নেই এ লোকটার।

লোকটা সবসময়েই ব্যস্তবাগীশ, একটা হাত বোধ হয় সব সময়ই টেলিফোনের ওপর থাকে, টেলিফোন করতে কিংবা ধরতে। মন্ত্রীদের সেক্রেটারীদের কাছ থেকে, সম্পাদকদের কাছ থেকে, সেনট্রাল কমিটিগুলোর কাছ থেকে কোনো সমিতি বা পার্টির কাছ থেকে কিছু শুনতে অথবা তাদের কিছু বলতে। ওর স্ত্রীকে আমার ভালই লাগে। ফ্রেডেবয়েল যেবার প্রথম ওকে নিয়ে ওদের 'চক্রে' আসে, মেয়েটি তখনও স্কুলে যেত। ওর তখনকার সেই বসে থাকবার ধরন, ওর সুন্দর চোখ দুটো দিয়ে সমাজতন্ত্র ও থিয়োলজী বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক অনুসরণ, আমাকে খুব কষ্ট দিত, ওকে দেখে আমার মনে হত, ওর বরং নাচের আসরে কি সিনেমায় গেলে ভাল হত। সম্মারহিবল্ডের ওখানে বৈঠক বসেছিল ; ভদ্রলোক আমাকে বারে বারেই জিজ্ঞেস করছিল, আপনার খুব গরম লাগছে নাকি, শ্রীয়ার ? আর আমি বলছিলাম, 'না, না,' যদিও আমার কপাল আর গাল বেয়ে ঘাম ঝরছিল। শেষমেশ আমি সম্মারহিবল্ড-এর ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, ওই আলোচনা আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। মহিলাটি নিজেই ওই কচকচানিতে উস্‌কানি দিয়ে বসেছিল। ওদের কথাবার্তা চলছিল প্রাদেশিকতার পরিমাণ এবং তার সীমা প্রসঙ্গে। তার মধ্যে হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে ও মন্তব্য করেছিল, বেন্-এর কিছু কিছু লেখা ওর কাছে 'বেশ ভালই লাগে'। ফ্রেডেবয়েল-এর বাগদত্তা হিসেবে ছিল ওর পরিচয়। সে একেবারে টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল কারণ কিংকেল তক্ষুনি তার বিখ্যাত 'বক্তৃতার ভঙ্গিতে' চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'সেকি, এটা ওকে এখনও শিখিয়ে-পড়িয়ে নাওনি ?' কাজেই সে নিজেই ব্যবস্থা নিল। পুরো পাশ্চাত্য জগতটাকে বাটালি বানিয়ে তাই দিয়ে বেচারী মেয়েটাকে চাঁচা-ছোলা করল। ওই মিষ্টি মেয়েটার অবস্থা তখন বেশ কাহিল। কিংকেল সবই বুঝি চেঁচে উড়িয়ে দিল। চাঁচগুলো ছিট্‌কে পড়েছিল। আর আমি ওই ভীরু ফ্রেডেবয়েলের ওপরে রেগে উঠেছিলাম। এই হেনস্তায় ও কোন বাধা দিচ্ছে না, কারণ কিংকেল আর ও একসঙ্গে কোন একটা নীতিগত ব্যাপারে বিশ্বাসের 'অঙ্গীকার' নিয়েছিল। এখন আর আমার একদম মনে নেই ওরা বামপন্থী না দক্ষিণপন্থী ছিল। তবে ওদের নিজস্ব পথ একটা ছিল। কিংকেল তখন ফ্রেডেবয়েল-এর ভাবী স্ত্রীকে শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করার নৈতিক দায়িত্ব বোধ করেছিল। সম্মারহিবল্ড এ ব্যাপারে টুঁ শব্দটি করেনি, অথচ সে কিংকেল আর ফ্রেডেবয়েল-এর বিপরীত

মতে বিশ্বাসী ছিল। আমি অবশ্য ঠিক মনে করতে পারছি না, কিংকেজ আর ফ্রেডেবয়েল বাম আর সম্মারহিল্ড ডান, কিংবা তার উল্টো ছিল। মারীও একটুখানি ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শিক্ষাটা ওকে বেশ প্রভাবিত করেছিল। আমি কোনমতেই আর ওকে বুঝিয়ে ফেরাতে পারিনি। কিংকেজের শিক্ষা পরবর্তীকালের ক্লাউ ফ্রেডেবয়েলকেও কম প্রভাবিত করেনি, সে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ঐ শব্দসর্বস্ব সংবাদ মেনে নিয়েছিল যা প্রায় ধর্মযাজকদের থেকে শুরু করে রেখ্‌ট্‌ অবধি ঝড়ের মত বয়ে গেছে। আমি ব্যালকনির হাওয়া খেয়ে ফিরে এসে দেখি সবাই ক্লান্ত হয়ে বসে 'পাঞ্চ' খাচ্ছে—এত ঝঞ্ঝাটের কারণ, ওই যে বলেছি, বেচারী মেয়েটি বলেছিল, বেন্‌-এর কিছু কিছু লেখা তার 'বেশ ভাল লাগে।'

এখন ফ্রেডেবয়েল-এর দুটি বাচ্চার মা সে, বাইশ বছর তখনও হয়নি, আর ওদের ফ্ল্যাটে যখন টেলিফোন বেজে চলেছে তখন আমি মনে মনে কল্পনা করে নিচ্ছি ও কেমন ফিডিং বোতল, পাউডারের কৌটো, কাঁথা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে, সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত অবস্থা ; আমার মনে পড়ছিল ওর বাচ্চার নেংটি আর কাঁথার পাহাড়ের কথা, আর ওর রান্নাঘর ভর্তি এঁটো বাসনের গাদা। একবার, ওদের আলোচনাচক্রে আমার যখন সবই দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল, আমি উঠে গিয়ে ওর কাজে সাহায্য করেছিলাম। টোস্ট সেঁকা, স্যান্ডউইচ তৈরি করা আর কফি বানান—এসব কাজ সম্বন্ধে আমি এটুকুই কেবল বলতে পারি যে, ওগুলো আমার কাছে বিশেষ বিশেষ আলোচনার চেয়ে কম বিতৃষ্ণাজনক।

একটা খুব শঙ্কিত স্বর বলল : 'হ্যাঁ, বলুন ?' ঐ স্বর শুনেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, রান্নাঘর, বাথরুম আর শোবার ঘর ভীষণ অগোছাল দেখাচ্ছে। আজ এখন কিন্তু প্রায় কোনও গন্ধই পাচ্ছিলাম না। কেবল ওর হাতে নিশ্চয় একটা সিগারেট আছে।

'শ্নীয়ার', আমি বললাম, আর আশা করলাম একটা আনন্দ-উজ্জ্বল স্বর শুনব। আমি ফোন করলেই যা সে প্রত্যেকবার করে। 'আঃ, আপনি বন্‌-এ ? কী মজা'—কিম্বা ওই জাতীয়। কিন্তু এবার নেমে এল একটা অপ্রস্তুত নীরবতা। প্রথমে চুপচাপ কিছুক্ষণ, তারপর সে আস্তে করে বলল, 'আঃ, ভাল কথা।' আমি বুঝতে পারছিলাম না কি বলি। আগে প্রতিবারই ও বলেছে, 'কবে আসছেন আমাদের এখানে, একটা কিছু দেখাতেন আমাদের।' আজ কোন কথা নয়। আমার খারাপ লাগছিল, নিজের জন্য ততটা নয় যতটা ওর জন্য।

নিজের ব্যাপারে আমার কেবল হতাশা বোধ হচ্ছিল, ওর জন্য আমার খারাপ লাগছিল। 'চিঠিগুলো', বললাম শেষমেশ অনেক কণ্টে, 'চিঠিগুলো, যেগুলো আমি মারীকে লিখেছিলাম আপনাদের ঠিকানায় ?'

'এখানে পড়ে আছে', ও বলল, 'না-খোলা ফেরত এসেছে।'

'কোন্ ঠিকানায় তবে ওগুলো পাঠিয়েছিলেন ?'

'আমি জানি না', ও জবাব দিল, 'আমার স্বামী পাঠিয়েছিল।'

'কিন্তু, ফেরৎ-আসা চিঠির ওপর লেখা ঠিকানাটা আপনি নিশ্চয় দেখে থাকবেন ?'

'আপনি কি আমাকে জেরা করছেন ?'

'ও না,' মৃদু গলায় বললাম, 'না, না, আমি কেবল বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করছিলাম। আমার লেখা চিঠিগুলোর কি হাল হয়েছে তা জানবার অধিকার হয়তো আমার আছে।'

'ওগুলো তো আপনি আমাদের জিজ্ঞেস না করেই এই ঠিকানায় পাঠিয়েছিলেন।'

'প্রিয় ফ্রাউ ফ্রেডেবয়েল,' বললাম, 'দয়া করে একটু মনুষ্যত্ব দেখান।'

খুব মৃদু হেসেছিল সে, অবশ্য তা শোনা গিয়েছিল, তবে বলেনি কিছু।

'তার মানে' আমি আবার বললাম, 'একটা জায়গা তো আছে, যেখানে এসে মানুষ, নীতিগত কারণেও মানুষের মত ব্যবহার করে।'

'তার মানে কি এই যে, আমি এতক্ষণ অমানুষের মত ব্যবহার করেছি ?'

'হ্যাঁ', আমি বললাম। ও আবার হাসল। সেই আগের মতন মৃদু তবুও শোনা যাবার মত।

'এ ব্যাপারটার জন্য আমি খুবই দুঃখিত', বলেছিল অবশেষে, 'কিন্তু এর বেশী আমি বলতে পারব না কিছু। আপনি আমাদের সবাইকে সাংঘাতিকভাবে হতাশ করেছেন।'

'ক্লাউন হিসেবে ?' জিজ্ঞেস করলাম।

বলল 'তাও বটে। তবে শুধু তাই নয়।'

'আপনার স্বামী বুঝি বাড়ি নেই ?'

'না,' ও বলল, 'আরও ক'দিন পরে ফিরবে। আইফেল-এ ভোটের বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'কী ?' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। ওটা আমার কাছে নতুন, 'তাই বলে

পি-ডি-ইউ-এর হয়ে নিশ্চয় নয়।'

'কেন নয়।' বলল এমন একটা গলায় যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে, ও ফোন রেখে দিতে চায়।

'তা বেশ,' আমি বললাম, 'যদি আপনাকে অনুরোধ করি ঐ চিঠিগুলো আমাকে ফেরৎ পাঠাতে, তবে কি বড্ড বেশী চাওয়া হবে?'

'কোথায়?'

'বন্-এ, এখানে আমার বন্-এর ঠিকানায়।'

'আপনি বন্-এ?' জিজ্ঞেস করল, আর আমার মনে হল যেন 'কি সর্বনাশ' কথাটা অতিকষ্টে চেপে গেল।

'রেখে দিচ্ছি,' আমি বললাম, 'আর এতটা মানবিকতার জন্য ধন্যবাদ।' ওর সঙ্গে রাগারাগি করার জন্য আমার খারাপ লাগছিল, আমার তখন শেষ অবস্থা। আমি রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজ থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতলটা বার করে একটা লম্বা চুমুক দিলাম। কিছুই হল না, আমি আর এক চুমুক খেলাম, তাতেও তেমন কিছু হল না। অন্তত ফ্রাউ ফ্রেডেবয়েলের কাছ থেকে এ ব্যবহার আমি সবচেয়ে কম আশঙ্কা করেছিলাম। ভেবেছিলাম, বিয়ের ওপর ও একটা লম্বা বক্তৃতা দেবে। মারীর সঙ্গে আমার আচরণ নিয়ে একটু গালমন্দ করবে। ও বেশ ভদ্র ও মার্জিতভাবে ওর গোঁড়ামি প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু আমি বন্-এ এসে যখনই ওকে ফোন করেছি সে আমাকে ঠাট্টা করে আসতে বলেছে ওর বাচ্চাদের ঘর আর রান্নাঘর গোছগাছ করতে সাহায্য করার জন্য। আমি নিশ্চয় ওর সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছিলাম, কিম্বা হয়ত ওর পেটে আবার বাচ্চা এসেছে তাই মেজাজটা খারাপ। আবার একবার টেলিফোন করে ওর আসল ব্যাপারটা জানবার সাহস আমার ছিল না। ও আমার সঙ্গে কি সুন্দর ব্যবহার করত। ফ্রেডেবয়েলই কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছিল, আমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করবার জন্য। এছাড়া আমি আর অন্য কিছু ভাবতে পারছিলাম না। আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি, বিবাহিত মহিলারা সম্পূর্ণ পাগলের মত তাদের স্বামীদের অনুসরণ করে। ফ্রাউ ফ্রেডেবয়েলের বয়স এত কম যে, বুঝতে পারেনি, ওর ওই অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা ব্যবহার আমাকে কতটা আহত করতে পারে। আর আমার মনে হয় না, ও বিশ্বাস করবে যে, ফ্রেডেবয়েল একটা সুবিধাবাদী বক্তৃতাবাজ, তাছাড়া আর কিছু নয়। ফ্রেডেবয়েল চায় কেবল ভবিষ্যৎ তৈরি করতে, যে কোনও মূল্যে, দরকার হলে তার ঠাকুমাকেও

'জাহান্নামে পাঠাবে' যদি ঠাকুমা কখনো কোন ঝাগড়া দেয়। সে নিশ্চয় তার স্ত্রীকে বলেছিল, 'শ্রীয়ারকে ভুলে যাও,' আর অমনি ও আমাকে স্রেফ ভুলে গেল। ওর স্ত্রী ওর আজ্ঞাবহ, যতদিন ওর ধারণা ছিল, আমাকে দিয়ে ওর কোন কাজ হবে ততদিন স্ত্রীকে তার স্বভাব মত চলতে দিয়েছিল, আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে দিয়েছিল, এখন আমার সঙ্গে সে তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ কঠোর ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। হয়ত এমনও হতে পারে আমিও ওদের প্রতি অন্যায় করেছি, আর ওরা ওদের বিবেকের অনুশাসন অনুযায়ী চলছে। ৎস্‌ফ্‌নার-এর সঙ্গে মারীর বিয়ে হয়ে থাকলে, মারীর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া ওদের পক্ষে নিঃসন্দেহে পাপ—ৎস্‌যুফ্‌নার একটা সমিতির এক বিশেষ ব্যক্তি। সে ফ্রেডেবয়েল-এর কাজে আসতে পারে, কাজেই ফ্রেডেবয়েল তাদের বিবেককে ঘাঁটাতে চায় না। সন্দেহ নেই, ওরা ভাল বা মন্দ কিছু একটা তখনই করে যখন তাতে তাদের নিজেদের কোন সুবিধে হয়। ফ্রেডেবয়েল-এর স্ত্রীর দিক থেকে আমার হতাশা যতখানি, ফ্রেডেবয়েল-এর দিক থেকে ততখানি নয়। কেননা, ফ্রেডেবয়েলকে নিয়ে আমি কখনও কোনও রকম আকাশকুসুম কল্পনা করিনি, এমন কি এই যে সি-ডি-ইউ-এর হয়ে ভোটের বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে তাতেও আমি তেমন অবাক হইনি।

ব্র্যাণ্ডির বোতলটা এবার আমি শেষবারের মত ফ্রিজ-এর মধ্যে রেখে দিলাম।

আমার খুব ইচ্ছা করছিল পর পর ফোন করে ক্যাথলিকগুলোকে আমার পথ থেকে সরিয়ে দিই। যে করেই হোক আমি সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছিলাম। এমন কি রান্নাঘর থেকে বসবার ঘরে আসতে আমি আর খোঁড়াচ্ছিলাম না।

এই ফ্ল্যাটের ড্রেসিংরুম এমন কি ঝাঁটা রাখবার ঘরটা অবধি পোড়ামাটি রঙের।

কিংকেলকে ফোন করবার ব্যাপারে আমি তেমন কিছু আশা করিনি—নম্বরটা তবুও ডায়াল করেছিলাম। সব সময় সে নিজেকে আমার শিল্প-ক্ষমতার একজন উৎসাহী স্তাবক বলে ঘোষণা করত—আর আমাদের পেশার জগৎটা যারা চেনে তারাই জানে যে, একজন স্টেজের কর্মীর সামান্য প্রশংসাতেও আমাদের বুক অহংকারে কেমন ফেটে পড়ে। আমার উদ্দেশ্য ছিল কিংকেলের খ্রীস্টান-সম্মত সান্ধ্য-বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটানো। আর ভেতরে ভেতরে একটা আশা ছিল,

মারী কোথায় আছে সে হয়ত তা বলে দেবে। কিংকেল ছিল ওদের 'চক্রে'র পাণ্ডা, থিয়োলজী পড়ছিল, কিন্তু এক সুন্দরীর পাল্লায় পড়ে পড়া ছেড়ে দেয়। উকিল হয়। সাতটি সন্তানের জনক এখন সে 'আমাদের সবচেয়ে ক্ষমতাবান সমাজ বিধায়কদের একজন' বলে গণ্য। হয়ত সত্যি সত্যিই তাই, আমি তা বলতে পারি না। ওর সঙ্গে পরিচয় হবার আগে মারী আমাকে ওর লেখা একটা প্রচারপত্র দিয়েছিল। 'নতুন ব্যবস্থার পথ' নামে ওই লেখাটা পড়বার পর, এবং পড়ে ভাল লেগেছিল বলে, আমার ধারণা হয়েছিল, লোকটা দেখতে হবে লম্বা, ফরসা আর কোমল স্বভাবের। তারপর যখন প্রথম দেখি, দেখলাম 'প্রাণশক্তিতে ঠাসা' একজন মোট্কা, বেঁটে, ঘন-কাল-চুল লোক সে, আমার বিশ্বাসই হয়নি, এই সেই লোক। আমার যেমন ধারণা ছিল, লোকটা তেমন দেখতে হল না বলেই হয়ত ওর প্রতি আমার অত বিতৃষ্ণা। মারী কিংকেল-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতে গেলেই বুড়ো ডেরারকুম সব সময় বলতেন, কিংকেল-ককটেইল-এর কথা—'সদা পরিবর্তনশীল পরিমাণের মার্কস এবং গুয়োর্ডিনি বা ব্লই এবং টলস্টয়-এর মিশেল।'

আমরা যেবার প্রথম নিমন্ত্রণ পেয়ে গেলাম, তখনই ঘটনাটা বিশ্রীভাবে শুরু হয়েছিল। আমরা বড্ড বেশী আগে পৌঁছে গিয়েছিলাম। বাড়ির পেছন দিকে চিৎকার করে ঝগড়া করছিল ছেলেমেয়েরা, ওদের চেঁচামেচির কারণ বোঝা গিয়েছিল—কাকে খাবার টেবিল পরিষ্কার করতে হবে তাই নিয়ে ঝগড়া। কিংকেল এসেছিল হাসতে হাসতে। তখনও সে কি যেন চিবোচ্ছে। আমাদের ওই আকস্মিক সকাল-সকাল পৌঁছে যাওয়ায় ওর বিরক্তি খুশি-খুশি ভাব দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে এসেছিল। সম্মারহিবল্ডও এসেছিল, চিবোতে চিবোতে নয়, এক গাল হাসি বয়ে হাত ঘষতে ঘষতে। কিংকেল-এর ছেলেমেয়েরা বিশ্রী ঝগড়া করছিল পেছনদিকে। তারই পটভূমিতে কিংকেল-এর স্মিত মুখ আর সম্মারহিবল্ড-এর গালভরা হাসি, মনে হচ্ছিল এক বিরক্তকারী বৈপরীত্য। বন্ধ দরজার ওপাশে চড়চাপড়, আর চিৎকারের বীভৎস শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম আমি, টের পাচ্ছিলাম, ঝগড়া আগের চেয়েও জোর কদমে চলছে। আমি মারীর পাশে বসে পেছনের ওই উল্টো পরিস্থিতির ফলে টাল সামলাতে পারছিলাম না, উত্তেজনার বশে ক্রমাগত একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলেছিলাম। ওদিকে সম্মারহিবল্ড মারীর সঙ্গে গল্প করছিল। সারা মুখে তার সেই 'ক্ষমার উদার হাসি' সব সময় টলটল করছিল। আমরা পালিয়ে যাবার পর সেই প্রথম আবার বন্-এ এসেছি। মারী উত্তেজনায়

ক্যাকাশে—সম্মানহানির আশঙ্কায় ভীত আবার গর্বও বোধ করছি খুব। মারীর অবস্থা আমি খুব ভাল বুঝতে পারছিলাম। ওর উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে 'গীর্জার সঙ্গে আবার মানিয়ে নেওয়া', আর সম্মারহিবল্ডও খুব ভাল ব্যবহার করছিল ওর সঙ্গে। কিংকেল আর সম্মারহিবল্ড সম্বন্ধেই যত ভয় ছিল ওর। ও সম্মারহিবল্ড-এর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, তারপর আমরা যখন আবার বসলাম, সম্মারহিবল্ড বলেছিল, 'আপনি কি কয়লাখনির মালিক শ্নীয়ারদের কেউ হন নাকি?' শুনে আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। লোকটা ঠিক জানত আমি কাদের ঘরের কে। বন্-এর প্রায় প্রত্যেকটি শিশুও জানত, মারী ডেয়ারকুম কয়লা খনির শ্নীয়রদের একজনের সঙ্গে নিজের সর্বনাশ করেছে—'স্কুলের পরীক্ষার ঠিক আগে। আর মারী ছিল এক ধর্মভীরু মেয়ে।' আমি সম্মারহিবল্ড-এর প্রশ্নের কোন জবাব দিইনি, লোকটা হেসে বলেছিল, 'আপনার ঠাকুরদার সঙ্গে আমি মাঝে-মধ্যে শিকারে যাই, আর আপনার বাবার সঙ্গে কখনও কখনও দেখা হয় বন্-এর ভদ্র সমিতিতে স্কাট খেলতে গিয়ে।' এতেও আমি বিরক্ত হচ্ছিলাম। লোকটা এত বোকা নয় যে, ভাববে ওই শিকারে যাওয়া বা ভদ্রসমিতিতে স্কাট খেলা আমাকে মুগ্ধ করবে। আর লোকটাকে দেখে মনে হয় না যে, সে কেবল কথা বলার ঝোঁকেই কথা বলে। আমি যাহোক মুখ খুলেছিলাম শেষমেশ, বলেছিলাম, 'শিকারে গিয়েছিলেন? আমার ত ধারণা ছিল, ক্যাথলিক পাণ্ডিতদের শিকারে যাওয়া বারণ।' আমার কথাটা একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা সৃষ্টি করেছিল। মারী লাল হয়ে উঠেছিল। কিংকেল উত্তেজিতভাবে ঘরময় ঘুরছিল। সে একটা কর্ক স্ক্রু খুঁজছিল। তার স্ত্রী তখনই সবে ঘরে ঢুকেছে আর একটা কাচের প্লেটে জলপাই রাখা ছিল, তার ওপরই কুচো নিমকিগুলো ঢেলে দিয়েছে। দেখে এমন কি সম্মারহিবল্ডও লাল হয়ে উঠেছিল, লোকটার মুখটা এমনিতেই বেশ লাল, কাজেই তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। আস্তে আস্তে কিন্তু একটু আহত গলায় বলেছিল, 'প্রটেসটানট্ হলেও আপনি অনেক কিছুই জানেন।' আমি জবাব দিয়েছি, প্রটেসটানট্ নই, তবু বিশেষ বিশেষ জিনিস আমার জানতে ইচ্ছে করে, কারণ মারীর তাতে খুব উৎসাহ। কিংকেল যখন আমাদের সবাইকে মদ পরিবেশন করছিল তখন একটু ক্ষুন্ন গলায় সম্মারহিবল্ড বলল, 'নিয়ম আছে, মিঃ শ্নীয়ার, কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে। আমার জন্ম এমন এক পরিবারে যেখানে 'হেড ফরেস্টার' হওয়াটা বংশের ধারা।' বলত যদি ফরেস্টার হওয়া, তো বুঝতাম, কিন্তু ওই যে বলল, হেড ফরেস্টার হওয়া তাইতেই—

আমার আবার বিরক্ত লাগল, কিন্তু আমি কিছু বললাম না, স্রেফ গোমড়া মুখ করে বসে থাকলাম। তারপর শুরু হল ওদের চোখে-চোখে কথা। ফ্রাউ কিংকেল চোখ দিয়ে সম্মারহিবল্ডকে বললে, 'ওকে ছেড়ে দিন। ওতো একেবারে বাচ্চা।' আর সম্মারহিবল্ড তাকে চোখের ভাষায় জবাব দিয়েছে, 'হ্যাঁ, বাচ্চা আর বেশ বয়ে-যাওয়া।' সবাইকে দেবার পর আমাকে মদ দিতে এসে কিংকেল চোখ দিয়ে আমাকে বলেছিল, 'হে ভগবান, সত্যি আপনি নিতান্ত কচি।' গলার স্বরে মারীকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাবা কেমন আছে? এখনও সেই আগের মতই?' বেচারী মারী এত ফ্যাকাশে আর বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে বোবার মত মাথা নেড়েছিল কেবল। সম্মারহিবল্ড বলেছে, 'হেয়ার ডেয়ারকুম না থাকলে আমাদের এই প্রাচীন সুন্দর নির্ঝঞ্ঝাট শহরটার কি যে হত।' শুনে আবার আমার বিরক্ত লেগেছিল, বুড়ো ডেয়ারকুম একবার আমাকে বলেছিলেন, 'সম্মারহিবল্ড চেষ্টা করেছিল ক্যাথলিক স্কুলের বাচ্চা, যারা তখনও ওর কাছ থেকে পেন্‌সিল আর লজেন্‌স কিনছে, তাদের আমার সম্বন্ধে সাবধান করে দিতে।' আমি বললাম, 'হেয়ার ডেয়ারকুম না থাকলে আমাদের এই প্রাচীন সুন্দর নির্ঝঞ্ঝাট শহরটা আরও নোংরা হয়ে উঠবে, লোকটা অন্তত হিপোক্রিট নয়।' কিংকেল আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে তার গ্লাসটা তুলে বলেছে, 'আপনাকে ধন্যবাদ হেয়ার শ্নীয়ার, আপনি আমাকে একটা ভাল টোস্‌টের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। আসুন, আমরা মার্টিন ডেয়ারকুম-এর স্বাস্থ্য পান করি।' আমি বলেছি, 'হ্যাঁ, ওঁর স্বাস্থ্য......আনন্দের সঙ্গে।' ফ্রাউ কিংকেল আবার তার চোখ দিয়ে তার স্বামীকে বললে, 'ছোকরা শুধু বাচ্চা এবং বয়ে যাওয়াই নয়, নির্লজ্জও বটে।' আমি কখনও বুঝে উঠতে পারিনি, কেন কিংকেল পরবর্তীকালে প্রতিবারই প্রসঙ্গসূত্রে 'আপনার সঙ্গের প্রথম সন্ধ্যাটা' সবচেয়ে সুন্দর বলত। আমাদের কিছু পরেই এসেছিল ফ্রেডেবয়েল, সঙ্গে এসেছিল তার ভাবী স্ত্রী, মনিকা সিলভ্‌স্‌ আর এক ফন সেভেয়ার্ন। ফন সেভেয়ার্ন সম্বন্ধে তার আসবার আগে বলা হয়েছিল যে, লোকটা যদিও সবে ক্যাথলিক হয়েছে, সে বড্ড বেশী এস. পি. ডি ঘেঁষা, সেটা স্বভাবতই আকাশ ভেঙে পড়ার মত একটা ঘটনা বলে বিবেচিত হত। ফ্রেডেবয়েলকে আমি সেই সন্ধ্যাতেই প্রথম দেখি, আর প্রায় আর সকলের মত ওর বেলাতেও আমার মনে হয়েছিল, সবকিছু সত্বেও আমাকে ওদের ভাল লেগেছিল আর সবকিছু সত্বেও ওদের কাউকে আমার ভাল লাগেনি, অবশ্য ফ্রেডেবয়েল-এর ভাবী স্ত্রী আর মনিকা

সিল্ভস্‌কে ছাড়া। ফন সেজ্‌রার্নকে আমার ভালও লাগেনি খারাপও লাগেনি। লোকটা একঘেয়ে আর মনে হচ্ছিল যেন, ওই রোমাঞ্চকর ঘটনা—ক্যাথলিক হয়েও এস-পি-ডি-র সভ্য থাকার গৌরবের ব্যাপারটা আলোচনায় টেনে আনতে বদ্ধপরিকর। হাসি হাসি মুখে একটা বন্ধু-বন্ধু ভাব; তবু ওর ওই একটু বেরিয়ে-থাকা চোখ দিয়ে সব সময় যেন বলছিল, দেখ তাকিয়ে, এই যে আমি! তবু ওকে আমার খুব একটা খারাপ লাগছিল না। ক্রেডেবয়েল আমার সঙ্গে বেশ গায়ে-পড়া ভাব করছিল, প্রায় ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে বেকেট আর ইয়োনেস্‌কো সম্বন্ধে কী সব কচ্‌কচ্‌ করছিল, তার থেকে আমার ধারণা হয়েছিল, লোকটা সব পড়েছে, আর আমি যখন বোকার মত বলে ফেলেছি যে, বেকেট পড়েছি তখন তার ঐ অদ্ভুত বড় হাঁ-অলা ফোলা ফোলা সুন্দর মুখটা সচ্ছল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল; লোকটা যাই বলে সবই আমার কেমন পরিচিত মনে হয়, মনে হয় কোথায় যেন পড়েছি। কিংকেল ওর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছিল, আর সমারউইল্ড তাকাচ্ছিল চারদিকে। তার চোখ বলছিল—তাহলে আমরা ক্যাথলিকরা, সময়ের থেকে পিছিয়ে পড়ে নেই। এ সবই হয়েছিল সেই প্রার্থনার আগে। খুব সম্ভব ফ্রাউ কিংকেলই হবে, যে বলেছিল, 'আমার মনে হয়, ওঁডলো, আমরা এখন প্রার্থনাটা সেরে নিতে পারি। হেরিব্যার্ট বোধ হয় আজ আর আসবে না।' ওরা সবাই মারীর দিকে তাকিয়েছিল, তারপর হঠাৎ আবার ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি হঠাৎ সকলে অদ্ভুতভাবে চুপ করে যাবার অর্থটা কী—হ্যানোভারের হোটেল ঘরেই আমি হঠাৎ জেনেছিলাম, ৎস্যুফ্‌নার-এর ডাক নাম হেরিব্যার্ট। সে এসেছিল তবে পরে, প্রার্থনা হয়ে গেলে তখন। সেই সন্ধ্যার আলোচনার মাঝপথে। আর আমার বেশ ভাল লেগেছিল, যখন দেখলাম ও আসতেই মারী উঠে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকাল ওর দিকে আর একটা অসহায় ভঙ্গি করে কাঁধটা নাড়ল। এ সবই ঘটেছে ৎস্যুফ্‌নার ঘরে ঢুকে সবাইকে অভিবাদন করে আমার পাশে এসে বসবার আগে। সমারউইল্ড তখন এক ক্যাথলিক লেখকের গল্প বলছিল, সেই লেখক বহুদিন এক ডাইভোর্স্‌ড্‌ মহিলার সঙ্গে ঘর করেছে, তারপর যখন সে সেই মহিলাকে বিয়ে করেছে তখন এক সম্মানিত বিশপ তাকে বলেছিল, 'কিন্তু প্রিয় বেসোহিব্‌স্‌, পারলেন না তাহলে তাকে পতিতালয়ে রেখে আসতে?' গল্পটা শুনে ওরা সবাই প্রাণ খুলে হেসেছিল; বিশেষ করে ফ্রাউ কিংকেল-এর হাসিটা

হয়েছিল প্রায় অশ্লীল। একমাত্র লোক যে হাসেনি সে হচ্ছে ৎস্যেফ্‌নার, আর সেইজন্য ওকে আমার খুব ভাল লাগছিল। মারীও হাসেনি। সম্মারহিবেল্ড গল্পটা বলেছিল নিশ্চয় আমাকে শোনানোর জন্য যে, ক্যাথলিক গীর্জা কত উদার, আপন এবং রসিক; আর আমি যে মারীর সঙ্গে বলতে গেলে পতিতালয়ে ছিলাম, সেকথা ওরা ভাবেনি। আমি ওদের বলেছিলাম এক শ্রমিকের কথা, লোকটা আমাদের বাড়ির কাছেই থাকত; নাম ছিল ফ্রেলিঙ্গেন আর সেও তার বস্তির ঘরে এক ডাইভোর্স্‌ড' মহিলার সঙ্গে ঘর করত, তার তিন বাচ্চার খাওয়া-পড়াও চালাত। একদিন এক পাদ্রী ফ্রেলিঙ্গেন-এর ওখানে এসে হাজির, গম্ভীর মুখে দারুণ ভয় দেখিয়ে বলল, 'এই অনাচার বন্ধ কর।' ফ্রেলিঙ্গেন লোকটা ছিল সৎ ক্যাথলিক। সে সত্যি সত্যি সেই সুন্দরী মহিলা আর তার বাচ্চাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। আমি আরও বলেছিলাম, সেই মহিলাটির দুরবস্থার কথা আর ফ্রেলিঙ্গেন কেমন করে মদ্যপ হয়ে ওঠে সেই কথা। ফ্রেলিঙ্গেন মহিলাটিকে সত্যিই ভালবাসত। আবার সেই বিশ্রী নিস্তব্ধতা, আমি কিছু একটা বললেই বরাবর যেমন হয়। কিন্তু সম্মারহিবেল্ড হেসে উঠেছিল, 'হেয়ার শ্নীয়ার, আপনি তাই বলে এই দুটো ঘটনার তুলনা করতে পারেন না, পারেন কি?' 'কেন পারব না?' আমি বলেছিলাম, 'পারি কিনা প্রশ্ন করেছেন এজন্যে যে, যেসেহিবংস্‌ সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না।' সে রেগে গিয়েছিল, 'গীর্জার তরফ থেকে সম্মানিত হয়েছে এমন লেখকদের মধ্যে সে হচ্ছে সবচেয়ে কোমল-প্রাণ।' আমিও রেগে গিয়েছিলাম, বলেছিলাম, 'আপনি কি জানেন ফ্রেলিঙ্গেন কতটা কোমল-প্রাণ ছিল—আর কেমন ধর্মভীরু শ্রমিক ছিল সে?' মানুষটা শুধু আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়েছিল, তারপর হতাশভাবে হাত দুটো ওপরে তুলেছিল। সবাই একটু চুপ, শুধু মনিকা সিলভ্‌স্‌-এর কাশির শব্দ শোনা গেছে। কিন্তু ফ্রেডেবয়েল ঘরে থাকতে ভাবনার কোনও কারণই নেই যে, আলোচনা বন্ধ হয়ে যাবে। একটুখানি চুপ হতেই সে লাফিয়ে পড়ে সেদিনের আলোচনার বিষয় টেনে আনল এবং 'দারিদ্র্যের সংজ্ঞার আপেক্ষিকতা' নিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টাটাক বলল। তখন কিংকেল সুযোগ পেল সেই লোকটার কথা বলবার, যে লোকটা পাঁচশো আর তিন হাজার মার্কের মধ্যে পড়ে শুধু নরক যন্ত্রণায় ভুগেছিল, আর ৎস্যেফনার আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে তার লজ্জায় লাল মুখ ধোঁয়ার আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করেছিল।

শেষ ট্রেনে কোলনে ফেরবার সময় মারীর আর আমার সমান দুরবস্থা। যাতায়াতের ভাড়াটা আমরা কোনোরকমে যোগাড় করেছিলাম, কেননা মারীর খুবই ইচ্ছা ছিল এই নিমন্ত্রণে যাবার। আমাদের শরীরের ওপরও খুব অত্যাচার গেছে, আমরা খেয়েছিলাম খুব কম আর অভ্যাসের তুলনায় অনেক বেশি মদ গিলেছিলাম। পথ যেন আর শেষ হতে চাচ্ছিল না! তবু তারপর কোলন্-ওয়েস্ট-এ নেমে আমাদের বাসা অবধি হেঁটে যেতে হয়েছিল, কারণ আমাদের কাছে আর পয়সা ছিল না।

কিংকেলের ওখানে সঙ্গে সঙ্গে একজন ফোন ধরেছিল। 'আলফ্রেড কিংকেল বলছি', বলেছিল এক আত্মসচেতন অল্পবয়সী গলা।

'শ্নীয়ার বলছি, আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'শ্নীয়র, থিয়োলজীস্ট না ক্লাউন?'

'ক্লাউন।'

'ও, আশা করি ব্যাপারটাকে বেশী গুরুত্ব দেবেন না।'

'গুরুত্ব?' ক্লান্ত গলায় শুধোলাম, 'কিসে অত গুরুত্ব দেব না!'

'সেকি, আপনি কাগজ পড়েন নি?'

'কোন্ কাগজ?'

'ভী স্টিম্মে বন্স্।'

'যা তা লিখেছে?' জিজ্ঞেস করলাম।

বললে 'আহ্, আমার তো মনে হয় ওটা প্রায় আপনার মৃত্যু সংবাদ। কাগজটা এনে পড়ে শোনাব?'

বললাম, 'না, ধন্যবাদ।' একটা প্রচ্ছন্ন স্যাডিস্ট তৃপ্তির সুর ছিল ছেলেটার গলায়।

ও বললে, 'আপনার কিন্তু ওটা একবার দেখা উচিত, ওর থেকে আপনার কিছু শেখার আছে।' হা ঈশ্বর, ওর দেখছি মাস্টারী করারও খুব ইচ্ছে।

'কে লিখেছে ওটা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কোন্ এক কোস্টার্ট, রুর এলাকার নিজস্ব সংবাদদাতা বলে উল্লেখ রয়েছে। লিখেছে বেশ চমৎকার, তবে বড্ড ঝাঁজ।'

বললাম, 'তা তো হবেই,' লোকটা তো আসলে খ্রীস্টান।'

'আপনি নন্ নাকি?'

'না,' আমি জবাব দিলাম, 'তা আপনার বাবার সঙ্গে কি কথা বলা যাবে না?'

'বাবাকে বিরক্ত করা বারণ, তবে আপনার জন্য তাকে বিরক্ত করতে রাজী আছি।'

এই প্রথম একজন স্যাডিস্ট আমার উপকারে এল।

বললাম, 'ধন্যবাদ।'

আমি শুনতে পেলাম ও ফোনটা টেবিলে রাখল এবং ঘরের মধ্যে দিয়ে চলে গেল। পেছন দিক থেকে আবার সেই বিশ্রী হিসহিস শব্দ কানে আসছিল, যেন পুরো একটা সাপের পরিবার নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে—দুটো পুরুষ সাপ আর একটা মেয়ে সাপ। যা আমার শোনবার বা দেখবার নয় তা দেখতে বা শুনতে পেলে আমার খুব খারাপ লাগে, আর টেলিফোনে গন্ধ পাবার অদ্ভুত ক্ষমতাটা কোনক্রমেই মজার ব্যাপার নয়, ওটা একটা বোঝার মত। কিংকেলের ফ্ল্যাটে মাংসের গন্ধ। যেন একটা আস্ত ষাঁড় রান্না হচ্ছে। পেছনের হিসহিস শব্দটা প্রাণান্তকর শোনাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন ছেলে বাবাকে কিংবা মা ছেলেকে খুন করছে। আমি লাওকোনকে স্মরণ করছিলাম। আর বলতে কি, এই হিসহিস শব্দ আর গালাগালি—আমি একটা হাতাহাতির শব্দও শুনতে পাচ্ছিলাম, হাউমাউ কান্নার শব্দও, 'জঘন্য জানোয়ার', 'বর্বর শুয়োর' জাতীয় গাল, কানে আসছিল—'জর্মন ক্যাথলিজম্-এর একজন বিদগ্ধ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি' নামে পরিচিত মানুষের বাড়িতে এসব ঘটনা আমাকে আদৌ উৎসাহিত করছিল না। আমার বোখুম-এর সেই অপদার্থ কোস্টার্ট-এর কথাও মনে পড়ছিল। এতটুকু সন্দেহ নেই লোকটা সন্ধ্যায় খবরের কাগজকে পুরো রিপোর্টটাই টেলি-ফোনে পাঠিয়েছিল অথচ আজ সকালেই আবার এসে নেওটা কুকুরের মত আমার বন্ধ দরজা আঁচড়াচ্ছিল আর ভান করছিল যেন খ্রীস্টান ভ্রাতৃত্বে তার কত আস্থা। বোঝা যাচ্ছিল কিংকেল আক্ষরিক অর্থে সর্বাঙ্গ দিয়ে চেষ্টা করছিল যাতে টেলিফোন ধরতে না হয়। পেছনের ভিন্ন ধরনের শব্দ আর নড়াচড়ার থেকে আরও আন্দাজ করতে পারছিলাম যে, ওর চেয়েও ওর স্ত্রীর আপত্তি আরও বেশী। ওদিকে ওর ছেলেও আমাকে এসে বলতে রাজী নয় যে, ওর ভুল হয়েছে, ওর বাবা বাড়ি নেই। হঠাৎ সব একদম চুপচাপ হয়ে গেল। একটা লোক রক্তক্ষরণে মরছে এমন হলে যেমন সব স্তব্ধ হয়ে যায় সেই

রকম ; সত্যিসত্যিই মৃত্যুর মত একটা স্তব্ধতা। তারপরে আমি শুনলাম হেঁচড়ে চলার আওয়াজ, একজন এসে টেবিল থেকে ফোনটা তুলে নিল, হয়তো ভেবেছিল ওদিকে ছেড়ে দিয়েছে, ফোনটা রেখে দিতে হবে। কিংকেলের বাড়িতে টেলিফোন কোথায় থাকে আমি বেশ মনে করতে পারছিলাম। যে তিনটে ব্যারক ম্যাডোনাকে কিংকেল সবচেয়ে খেলো জিনিস বলে সব সময়, তাদেরই একটার নিচে। মনে হচ্ছিল, কিংকেল ফোনটা রেখে দিলেই যেন ভাল করত। ওর জন্য আমার কষ্ট হচ্ছিল। আমার সঙ্গে কথা বলতে এখন ওর নিশ্চয় বিশ্রী লাগবে আর তাছাড়া আমি নিজে ওর সঙ্গে কথা বলে বিশেষ লাভ করব তাও মনে হচ্ছিল না, অর্থ বা সৎপরামর্শ কোনটাই পাব না। ওর গলায় যদি দম বন্ধ হওয়ার আভাস পেতাম তবে আমার কষ্ট আরও বাড়ত, কিন্তু ওর গলা বরাবরের মতই গমগমে আর প্রাণবন্ত। কে যেন একবার ওর গলার সঙ্গে পুরো একটা ট্রামপেট দলের তুলনা করেছিল।

'হ্যালো, শ্নীয়ার,' গম্‌গম্‌ করে উঠল গলা, 'ভারি খুশী হলাম, আপনি ফোন করেছেন। খুব ভাল কথা।'

'হ্যালো, ডক্টর।' আমি বললাম, 'একটা ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেছি।'

আমায় কথায় একমাত্র খারাপ শব্দ ছিল ওই ডক্টর, কারণ ওই ডক্টর ছিল— আমার বাবার যেমন—আনকোরা একটা সম্মান-সূচক খেতাব।

সে বলল, 'শ্নীয়ার, আমাদের সম্পর্কটা কি এমন যে, আপনি আমাকে ডক্টর বলে ডাকবেন?'

'আমাদের সম্পর্কটা সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই নেই।' আমি জবাব দিলাম। শুনে সে হেসে উঠল গম্‌গম্‌ করে—প্রাণবন্ত ক্যাথলিক, দিলখোলা, 'ব্যারক উচ্ছ্বাসে' ভরা স্বর, 'আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণার কোনও পরিবর্তন হয়নি, একই আছে।' সেটা বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। ওর কাছে আমি হয়তো এত নিচে পড়ে গেছি যে, আমাকে আরো নিচে ঠেলে ফেলার কোনও অর্থ নেই ওর দিক থেকে।

বললে, 'আপনি একটা ঝামেলায় পড়েছেন। তাতে কী, আপনার বয়স কম, উঠে পড়ে লাগুন, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।' 'উঠে পড়ে লাগুন' কথাটা শোনাচ্ছিল যেন আমার আই আর ৯-এর মত।

'কিসের কথা বলছেন?' আমি হাল্‌কা গলায় জানতে চাইলাম।

বললে, 'আবার কিসের কথা, আপনার শিল্পের কথা বলছি, আপনার

ভবিষ্যতের কথা।'

'আমি কিন্তু সেকথা আদৌ বলছি না। আপনি তো জানেন, শিল্প নিয়ে আমি নীতিগতভাবেই কখনো কথা বলি না, আর ভবিষ্যৎ নিয়ে তো কোন কারণেই না। আমি যা বলতে চাইছি সে হচ্ছে আমি মারীকে খুঁজছি, আমি তাকে চাই।'

সঠিক ব্যাখ্যা করা যাবে না, তবে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আর চেকুর তোলার মাঝামাঝি একটা শব্দ করল সে। আমি পেছনদিকের থিতিয়ে যাওয়া হিস্‌হিস্‌ শব্দ আবার শুনতে পাচ্ছিলাম, কিংকেল ফোনটা টেবিলে রেখে আবার তুলে নিয়েছিল, ওর গলাটা অনেক ক্ষীণ আর রুক্ষ শোনাচ্ছিল, মুখে ওর একটা সিগার রয়েছে।

'শ্নীয়ার,' ডাকল সে, 'যা হয়ে গেছে তা যেতে দিন। আপনার বর্তমান হচ্ছে শিল্প।'

'হয়ে গেছে?' জানতে চাইলাম, 'একবার চিন্তা করার চেষ্টা করুন তো, আপনার স্ত্রী হঠাৎ একদিন আপনাকে ছেড়ে অন্য পুরুষের কাছে চলে গেছে।'

এমনভাবে চুপ করে থাকল যেন আমাকে বুঝিয়ে দিতে চায় যে, পারলে যেতই।

তারপর সিগারটা চিবোতে চিবোতে বলল, 'ও আপনার স্ত্রী ছিল না, আর আপনাদের সাতটা বাচ্চাও নেই।'

'আচ্ছা, ও আমার স্ত্রী ছিল না বলছেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

বলল, 'আঃ, এই রোমাণ্টিক নৈরাজ্যবাদী বিলাস ছাড়ুন তো। পুরুষের মত হোন।'

'কী যাচ্ছেতাই বলছেন, আমি পুরুষমানুষ বলেই তো ব্যাপারটা আমার কাছে সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে—আর ঐ সাতটা বাচ্চা হতেই বা কতক্ষণ। মারী তো সবে পঁচিশ।'

'পুরুষ মানুষ বলতে, আমি বুঝি, যে নিজেকে সামলে নিতে পারে। জবাব দিল সে।'

বললাম, 'বেশ খৃস্টীয় শোনাচ্ছে।'

'হায় ভগবান, শেষকালে আপনি আমাকে শেখাচ্ছেন, কোন্‌টা খৃস্টীয়।'

'হ্যাঁ', আমি বললাম, 'আমি যতটা জানি, ক্যাথলিকমত অনুযায়ী বিবাহিত নারী পুরুষ স্যাক্রামেণ্ট ভাগ করে নেয়।'

'নিশ্চয়', বলল সে।

'আর দু'বার তিনবার রেজিস্ট্রী করে আর গীর্জায় বিয়ে করে কিংবা গীর্জায় বিয়ে না করে যদি স্যাক্রামেন্ট ভাগ না করে তাহলে বিয়ে বাতিল।'

'হুম্‌,' বলল সে।

'শুনুন, ডক্টর,' আমি বললাম, 'সিগারটা মুখ থেকে নামালে আপনার কি খুব অসুবিধা হবে। কথাবার্তা শোনাচ্ছে যেন আমরা শেয়ার নিয়ে আলোচনা করছি। আপনার ওই চিবোনোর শব্দটা আমার কাছে কেমন বিশ্রী ঠেকছে।'

'এই, শুনুন,' বলল সে, তবে এবার সিগারটা মুখ থেকে নামিয়ে, 'খেয়াল রাখবেন, আপনি ব্যাপারটা নিয়ে কেমন ভাবছেন সেটা আপনার ব্যাপার। ক্রয়লাইন ডেয়ারকুম, বোঝাই যাচ্ছে, অন্যরকম ভাবছে, আর তার মন যেমন চায় তেমনি করছে। আমি কেবল বলতে পারি, ঠিকই করছে।'

'আপনাদের ঐ ঘৃণ্য ক্যাথলিকদের কেউ তবে আমাকে বলছে না কেন, ও কোথায়? আসলে আপনারা ওকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছেন।'

'নিজেকে হাস্যাস্পদ করবেন না, শ্নীয়ার, আমরা মধ্যযুগে বাস করছি না।' বলল সে।

'মধ্যযুগে বাস করলেই ভাল হতো, তাহলে ও আমার রক্ষিতা হিসেবে স্বীকৃতি পেত আর তার জন্যে ওকে সব সময় বিবেকের দংশন সহ্য করতে হতো না। যা হোক ও ঠিক আবার আসবে।' আমি আশা প্রকাশ করলাম।

'আমি হলে অতটা নিশ্চিত হতাম না, শ্নীয়ার' কিংকেল বলল, 'সত্যিই দুঃখের কথা, স্পষ্টতই আপনার মধ্যে অধিবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান আদৌ নেই।'

'মারীর ব্যাপার সবই স্বাভাবিক ছিল যতদিন ও আমার আত্মার কথা ভাবত, কিন্তু আপনারা ওকে শেখালেন ওর নিজের আত্মার কথা ভাবতে। তার ফলে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে আমি, যার অধিবিদ্যা বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, সে আমিই মারীর আত্মা সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েপড়েছি। যদি ৎস্যুফ্‌নার-এর সাথে ওর বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকে তবেই ও প্রকৃত পাপ করেছে। আপনাদের ঐ আধ্যাত্মিক ব্যাপারের এটুকুই আমি বুঝেছি যে, ও যা করছে তা প্রকৃতপক্ষে পাপ। অনাচার আর বিবাহভঙ্গের অপরাধ, আর তাতে উস্কানি দিচ্ছে প্রেলাট সম্মারীছলভ।'

শুনে লোকটা সত্যি সত্যিই হাসতে পারল, যদিও হাসিটা তেমন প্রাণগমিয়ে

উঠল না।' বললে, 'সবটাই অদ্ভুত লাগে, যখন আপনি ভাবেন জর্মন ক্যাথলিসিজম-এর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে হেরিবার্ট বলতে গেলে ঐহিক প্রতিনিধি আর প্রেলাট সম্মারহ্বিল্ড হচ্ছে যাকে বলে আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি।'

আমি রেগে গিয়ে বললাম, 'আর আপনি তার বিবেক। আপনার জানতে বাকি নেই, আমি ঠিকই বলছি।' তিনটে ব্যারক ম্যাডোনার সবচেয়ে সস্তা মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ ভারি ভারি নিঃশ্বাস ফেলতে শুনলাম তাকে, তারপর বলল, 'আপনি সাংঘাতিকভাবে ছেলেমানুষ—হিংসে করার মত—'

'থামুন ডক্টর, থামুন, আপনার আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই, আমাকে হিংসে করারও দরকার নেই, মারীকে যদি ফিরে না পাই, আপনাদের সবচেয়ে সম্মানিত মানুষটিকে খুন করব। আমি ওকে খুন করব। আমার ক্ষতি হবার মত আর কিছুই নেই।' সাফ বলে দিলাম আমি।

চুপ করে থেকে সিগারটা আবার মুখে পুরল কিংকেল।

আবার বললাম, 'আমি জানি, আপনার বিবেক হন্যে হয়ে উঠেছে। জানি আমি যদি ৎস্যুফনারকে খুন করি, আপনার তাতে বড় যায় আসে না। সে আপনাকে পছন্দ করে না, আর তা ছাড়া আপনার চোখে সে বড্ড বেশী দক্ষিণপন্থী। অন্যদিকে সম্মারহ্বিল্ড রোম-এর ব্যাপারে আপনার পক্ষে মস্ত বড় সহায়। যদিও রোম-এ আপনি অতি বামপন্থী বলে নিন্দিত। অবশ্য আমার বিনীত অভিমত ওটা অত্যন্ত বাজে ধারণা।'

'কি যা-তা বলছেন, শ্নীয়ার। কি হয়েছে আপনার?'

'ক্যাথলিকরা আমাকে নার্ভাস করে, কারণ ওরা আমাকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে।' আমি বললাম।

'আর প্রটেস্টানটরা?' জিজ্ঞেস করে হাসল সে।

বললাম, 'ওরা যেভাবে বিবেক নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, তাতে আমি বিরক্ত হই।'

'আর এথিস্টরা?' তখনও হাসছে কিংকেল।

'ওরা একঘেয়ে, কারণ ওরা সব সময় কেবল ঈশ্বর নিয়ে কথা বলে।'

'তা আপনি কী, আসলে?'

'আমি একজন ক্লাউন।' বললাম, 'অবশ্য এই মুহূর্তে আমার যা দুর্নাম তার চেয়ে একজন ক্যাথলিক ভাল। অতএব একটি ক্যাথলিক প্রাণীকে আমার

নিতান্তই দরকার—মারীকে দরকার অথচ ওকেই আপনারা ছিনিয়ে নিয়েছেন।'

'বাজে কথা শ্রীয়ার; ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। আমরা বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি।' বলল কিংকেল।

'বটেই তো', আমি জবাব দিলাম, 'ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমি রাজদরবারের একজন উপযুক্ত ভাঁড় হতে পারতাম। তখন ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল কিনা তা নিয়ে কার্ডিনালরাও মাথা ঘামাত না। এখন রাস্তার প্রতিটি ক্যাথলিক মারীর অসহায় বিবেক নিয়ে লাফালাফি করছে। একটা চোথা কাগজ ওর নেই বলে ওকে অনাচারী হতে, বিবাহভঙ্গে বাধ্য করছে। আপনার ওই ম্যাডোনাগুলো, ডক্টর, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হলে আপনাদের ধর্মচ্যুত করত, গীর্জা থেকে তাড়িয়ে দিত আপনাদের। আপনি বেশ জানেন, ওগুলো ব্যাভেরিয়া আর টিরোল-এর গীর্জা থেকে চুরি করা—আপনার অজানা নয় যে, গীর্জার সম্পত্তি লুঠ আজকের দিনেও কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য।'

'শুনুন শ্রীয়ার, আপনি কি ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে চান? আপনার কাছে এমন আশা করিনি।' বলল সে।

'বছরের পর বছর ধরে আপনি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলিয়ে এসেছেন আর আমি কথা প্রসঙ্গে সামান্য একটা কথা বলেছি, একটা সত্য ঘটনার উল্লেখ করেছি—যা হয়তো ব্যক্তিগত বলে মনে করা যেতে পারে, অমনি আপনি ক্ষেপে গেলেন? আমার আবার টাকা হলে একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ রাখব, আমার হয়ে যে খুঁজে বার করবে আপনার ওই ম্যাডোনাগুলো কোথা থেকে এসেছে।' আমি জবাব দিলাম।

সে আর হাসছিল না তখন। কাশছিল কেবল। আমি বুঝতে পারলাম, ও তখনও বুঝে উঠতে পারেনি, আমি সত্যি বলছি, না ঠাট্টা করছি কিনা। 'রেখে দিন, কিংকেল', বললাম, 'ফোন রেখে দিন, নইলে আমি টিকে থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনের কথা বলতে আরম্ভ করব। আপনাকে আর আপনার বিবেককে একটা শুভরাত্রি কামনা করছি।' ওর মাথায় কিন্তু তখনও ঢোকেনি কথাটা। কাজেই আমাকেই প্রথমে ফোনটা রেখে দিতে হলো।

১০

আমি ভালই জানতাম, আমার প্রতি কিংকেলের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। অনুরোধ করলে হয়তো অর্থ সাহায্যও করত। কিন্তু সিগার মুখে করে ওর ঐ মেটাফিজিক্স নিয়ে বক্তৃতা আর আমি ম্যাডোনোর কথা তুলতেই হঠাৎ ওর ক্ষেপে ওঠা, আমার এমনই অসহ্য লাগল যে, ওর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতেই আর আমার ইচ্ছে রইল না। এমন কি ওর স্ত্রী বা ক্লাউ ফ্রেডেবয়েল-এর সঙ্গেও না। মরুক গে ক্লাউ। খোদ ফ্রেডেবয়েলকে আমি কোন না কোন সুযোগে থাপ্পড় মারবই। ওর সঙ্গে 'স্পিরিচুয়াল' অস্ত্র নিয়ে লড়াই করা অর্থহীন। আজকাল আর ডুয়েল হয় না বলে মাঝেমধ্যে আপসোস হয় আমার। ৎস্যুফনারের সঙ্গে মারীকে নিয়ে আমার ব্যাপারটা একমাত্র ডুয়েল লড়েই নিষ্পত্তি করা যেত। হ্যানোভার-এর একটা হোটেলে বসে একদিকে নিয়ম মেনে চলা, লিখিত স্বীকৃতির দাবি আর অন্য দিকে দিনের পর দিন গোপনে শলাপরামর্শ চালানোর কথা ভাবতেও জঘন্য লাগে। দ্বিতীয়বার গর্ভপাত হবার পর মারী এত বেশী ভেঙে পড়েছিল, এত নার্ভাস হয়ে পড়েছিল যে, বারে বারে গীর্জায় ছুটে যেত আর আমার কিছু করবার না থাকলে সন্ধ্যেবেলা ওর সঙ্গে থিয়েটার, কনসার্ট বা কোনও বক্তৃতায় না গেলে খিটখিট করত। যদি আমি বলতাম, 'এস আমরা লুডু খেলি'—যেমন আমরা খেলতাম, বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আর চা খেতে খেতে, তবে ও আরো বেশী খিটখিট করে উঠত। আসলে ও ভালমানুষী করত, আমাকে শান্ত রাখার জন্য বা ভালবাসা দেখাবার জন্য আমার সঙ্গে লুডো খেলত। ছয় বছরের বাচ্চাদের জন্য যেসব সিনেমা হয় তাতে আমার যেতে খুব ভাল লাগে, ও সেখানেও আর যেত না আমার সঙ্গে।

পৃথিবীতে বোধহয় এমন কেউ নেই যে, একজন ক্লাউনকে বুঝতে পারে, এমনকি একজন ক্লাউনও আর একজন ক্লাউনকে বোঝে না—সেখানে কেবল ঈর্ষা আর পরশ্রীকাতরতা। মারী আমাকে খানিকটা বুঝত, সম্পূর্ণ বোঝেনি কোনদিন। ও সব সময় বলত, 'স্রষ্টা শিল্পী' হিসেবে যত বেশী সম্ভব সংস্কৃতি আত্মসাৎ করবার 'প্রবল উৎসাহ' আমার থাকা উচিত। ভুল ধারণা। সন্ধ্যেয় যদি আমার কাজ না থাকে আর শুনতে পাই, কোথাও বেকেট-এর নাটক হচ্ছে তো আমি তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি করে সেখানে যাবই, কখন-সখন আমি সিনেমাতেও যাই, ভেবে

বলতে মনে হয়, প্রায়ই যাই, আর কেবল সেইসব ছবি দেখতেই যাই যেখানে ছ'-বছরের বাচ্চারাও যেতে পারে। মারী তার তাৎপর্য কোন দিনই বুঝতে পারেনি। ও ওই ক্যাথলিক প্রথার পরিবেশে মানুষ, যার একটা বিরাট অংশই কেবলমাত্র মনস্তত্ত্ব আর যুক্তিবাদের ওপর নির্ভরশীল রহস্যবাদ দিয়ে মোড়া। যেমন 'ছেলেদের ফুটবল খেলতে দাও যাতে ওরা মেয়েদের কথা ভাবতে না পারে'। অথচ মেয়েদের কথা ভাবতে আমার খুব ভাল লাগত, পরবর্তীকালে মারীর কথাই কেবল ভাবতাম। মাঝে মাঝে নিজেকে পিশাচ মনে হতো। আমি ছ'-বছরের বাচ্চাদের ছবি দেখতে যাই কারণ তাতে দাম্পত্য জীবন নষ্ট হওয়া বা বিবাহ-বিচ্ছেদ এইসব প্রাপ্ত-বয়স্ক নোংরামি থাকে না। নষ্ট-দাম্পত্য জীবন বা বিবাহ-বিচ্ছেদ মার্কা ছবিগুলোতে কোনও একজনের সুখই বড় কথা। 'ওগো, আমাকে সুখী কর' বা 'তুমি কি আমার সুখের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চাও?' যে সুখ এক সেকেণ্ডের বেশী টেকে না বা দুই তিন সেকেণ্ড টেকে তা আমি একদম বুঝি না। আমার এখন প্রকৃত বেশ্যা-ছবি দেখতেও ভাল লাগে, কিন্তু ওগুলো সংখ্যায় বড্ড কম। ওই ছবিগুলো বেশীর ভাগেই এমন একটা ভান থাকে যে, বোঝাই যায় না, ওগুলো আদৌ বেশ্যা-ছবি। আর একজাতের মেয়ে আছে যারা বেশ্যা নয় কি ঘরণীও না, কিন্তু 'দরদী' নারী—ছবিতে ওদের একেবারেই উপেক্ষা করা হয়। যে সব ছবিতে কিশোরদের যাওয়ার ছাড়পত্র আছে, সে সব ছবিতে বেশ্যা চরিত্রেরই ভিড় বেশী। আমি আদৌ বুঝতে পারিনে, যে সব কমিটি ছবির শ্রেণী ভাগ করে তারা কি ভেবে এগুলোকে বাচ্চাদের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করে। যে সব মেয়েরা এ ছবিগুলোতে অভিনয় করে তারা সব হয় স্বভাবতই বেশ্যা কিংবা সামাজিক অর্থে তাই; 'দরদী নারী' ওরা প্রায় কখনই নয়। কোন কোন ওয়াইল্ড ওয়েস্ট-পানশালায় এ সব সুন্দরী মেয়েরা ক্যান ক্যান নাচে, অমার্জিত কাউবয়, স্বর্ণসন্ধানী বা ভবঘুরে, যারা দু বছর ধরে একা একা বন্যজন্তুদের মধ্যে ঘুরেছে তারা ওখানে এসে তাকিয়ে দেখে সেই সব সুন্দরী যুবতী মেয়েদের নাচ; কিন্তু তারপর যখন সেই কাউবয়, স্বর্ণ-সন্ধানী বা ভবঘুরে ঐসব মেয়েদের পিছু নেয় আর ওদের ঘরে ঢুকতে চায় তখন প্রায়ই ওদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় বা একটা বর্বর জানোয়ার-মত লোক এসে ওদের নির্মমভাবে মেরে পাট পাট করে। আমার মনে হয়েছে যৌন-শুদ্ধতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই ওটা করা হয়ে থাকে। নির্দয়তা—যেখানে মমতাই হওয়া উচিত একমাত্র মানবিক বিষয়। অবাক হওয়ার কিছু নেই যখন ওই

সব হুজ্জুতাল্য বাঁশিওয়া অত্যপর মারপিট, কদ্ কবাজি করে। ব্যাপারটা সেই বোর্ডিং স্কুলের ফুটবল খেলার মত। তফাৎ এই যে এরা আরো বেশী নির্মম যেহেতু এরা বয়স্ক। আমি আমেরিকানদের নীতিবাদ বুঝি না। মনে হয় ওখানে কোন মহিলা মমতাময়ী হলে তাকে ডাইনী বলে পুড়িয়ে মারা হবে। সেই মমতাময়ী মহিলা, যে অর্থের জন্য বা স্বভাববশে কোনও পুরুষের জন্য তা করে না, করে কেবল পুরুষ প্রকৃতির প্রতি মমতা বশে।

বিশেষ করে শিল্পীদের নিয়ে তোলা ছবিগুলোই আমাকে হতবুদ্ধি করে সবচেয়ে বেশী। শিল্পীদের নিয়ে ছবি তো বেশীর ভাগই তোলে সেইসব লোকেরাই, যারা ভ্যানগগের একটা ছবি কিনতে পুরো এক প্যাকেটও না, মাত্র আধ প্যাকেট তামাক খরচ করে, তারপরেও আবার এই ভেবে আপসোস করে যে আধ প্যাকেট বড্ড বেশী হয়ে গেছে, এক পাইপ তামাক দিলেও হয়ত ছবিটা দিত সে। শিল্পীদের নিয়ে তোলা ছবিতে শিল্পীমনের সেই শৈল্পিক আর্তি, যন্ত্রণা এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই সবসময় অতীতের বিষয় করে রাখা হয়। একজন জীবিত শিল্পী, যার সিগারেট নেই, যে তার স্ত্রীর জন্য একজোড়া জুতো কিনতে পারে না তার সম্বন্ধে ঐসব ফিল্মী লোকদের কোনও উৎসাহ নেই। উৎসাহ নেই কারণ তিন পুরুষ ধরে স্তাবকতা করে তাদের কেউ তখনও প্রমাণ করতে পারেনি যে, সে প্রতিভাবান। এক পুরুষের স্তাবকতা যথেষ্ট না। এমন কি মারীও বিশ্বাস করত 'শিল্পীমনের অনির্বাণ অন্বেষণা এ জাতীয় একটা কিছুর অস্তিত্ব আছে।' তাতেই অবাক লাগে। থাকুক তবে সে ভিন্ন নামে থাকলেই ভাল হয়। একজন ক্লাউনের যা দরকার তা হচ্ছে শান্তি, অথচ লোকে যাকে বলে 'কাজের শেষ, বিশ্রাম'। ওই কথাটা তারই নকল; কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, লোকে বুঝতেই পারে না যে, কাজের শেষে 'বিশ্রামে'র অনুকরণে ক্লাউন যাকে বলে 'শান্তি' সে হচ্ছে তার কাজ ভুলে থাকা; ওরা বুঝতে চায় না কারণ ওরা একমাত্র নিজেদের নিয়ে কাজের শেষের অবসরেই 'তথাকথিত' শিল্পচর্চা করে, আর তা তাদের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। বস্তুত সমস্যা হচ্ছে শিল্পভাবাপন্ন মানুষদের, যারা শিল্প ছাড়া আর কিছুই ভাবে না, যাদের ছুটির দরকার হয় না, কারণ তারা অন্য কোন কাজই করে না। তারপর যখন কেউ একজন শিল্পীভাবাপন্ন মানুষকে শিল্পী বলতে শুরু করে তখনই কেলেঙ্কারীটা ঘটে। শিল্পীভাবাপন্ন মানুষেরা সবসময় সেই মুহূর্তটিতে কথা বলতে শুরু করে যখন মনে হয় যে,

তার এখন কাজের শেষ, সে বিশ্রাম নিচ্ছে।—এই দুই, তিন, পাঁচ মিনিট অবধি, —তখন শিল্পী তার নিজের শিল্পের কথা ভুলে থাকে এবং ড্যানগগ, কাফকা, চ্যাপলিন অথবা বেকেট নিয়ে বলতে শুরু করে মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলে। এইসব মুহূর্তে আমার দারুণ ইচ্ছা করে আত্মহত্যা করতে—আমি তখন মারীর সঙ্গে যা করি, কেবল তাই ভাবতে শুরু করি, কিংবা বীয়ারের কথা, হেমন্তের পাতাঝরার কথা, লুডো খেলার কথা, অথবা জবরজং কিছু বা ভাবপ্রবণ কিছু ভাবি, তখন কোনো এক ফ্রেডেবয়েল বা সম্মারহিবল্ড শুরু করে শিল্প নিয়ে। ঠিক যে মুহূর্তে আমার সাংঘাতিক রোমাঞ্চকর অনুভূতি হয়, মনে হয় আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বোধ করছি, অতিশয় সাধারণ মানুষের মত স্বাভাবিক যেমন কার্ল এমণ্ডস্, তখন ফ্রেডেবয়েল বা সম্মারহিবল্ড শুরু করে ক্লাউডেল বা ইয়োনেস্কো নিয়ে। মারীর ভেতরেও একটু আধটু আছে ওই স্বভাবটা। আগে কম ছিল, ইদানীং বেড়েছে। যখন বলেছি, গীটার বাজিয়ে গান গাইব, তখন লক্ষ করেছি ওটা। ও বলেছে, ওতে ওর শিল্পরুচি আহত হয়। যারা শিল্পী নয় তাদের যেটা বিশ্রামের সময় ক্লাউনদের সেইটেই হচ্ছে কাজের সময়। কাজের শেষ যে কি তা সবাই জানে, মোটা মাইনের ম্যানেজার থেকে একদম সাধারণ শ্রমিক অবধি; ওরা বীয়ার খাক কি আলাস্কায় ভালুক শিকারে যাক, কিংবা ডাক-টিকিট জমাক, ইমপ্রেশনিস্ট কিম্বা এক্সপ্রেশনিস্ট (একটা কথা ঠিক, যে শিল্প সংগ্রহ করে সে শিল্পী নয়)। কাজের শেষে সিগারেট ধরানো আর তখনকার মুখের ভঙ্গি, একটা বিশেষ ভাব, স্রেফ ওই ব্যাপারটাতেই আমার মাথায় খুন চেপে যায়। কারণ ঐ অনুভূতি আমি অত্যন্ত ভাল করে চিনি। ওদের ওই বিশ্রামের উপলব্ধি সময়ের হিসেবে দীর্ঘ ভেবে ওদের আমি হিংসে করি। ক্লাউনের ছুটি হয় কয়েকটা মুহূর্তের জন্য—তখন সে দুপা ছড়িয়ে আধখানা সিগারেট খেতে যে সময় লাগে মাত্র ততটা সময় ছুটি ভোগ করে। সবচেয়ে জঘন্য হচ্ছে ওই তথা-কথিত লম্বা ছুটি—অন্যেরা তা পায় তিন, চার, ছয় সপ্তাহ ধরে। মারী দু চারবার চেষ্টা করেছে আমাকে ওরকম ছুটিতে অভ্যস্ত করতে। আমরা সমুদ্রের ধারে গেছি, দেশের ভেতরে গেছি, সাঁতার কাটতে, পাহাড়ে উঠতে গেছি, আর দ্বিতীয় দিনেই আমার অসুখ করে গেছে। পা থেকে মাথা অবধি ফুসকুড়িতে ছেয়ে গেছে, তখন যত বিশ্রী সব দুশ্চিন্তা। মনে হয় আমি হিংসাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তারপর মারীর সেই সাংঘাতিক ইচ্ছা হল আমার সঙ্গে এমন এক জায়গায় ছুটি কাটাতে, বলাবাহুল্য, যেখানে শিল্পীরাই শুধু যায়। স্বভাবতই সেখানে শিল্পী-

ভাবাপন্ন মানুষ গিজগিজ করছিল। প্রথম সপ্তাহেই এক গবেটের সঙ্গে আমার মারামারি হয়ে গেল। লোকটা ফিল্ম লাইনের মস্ত হোমড়াচোমড়া। সে আমাকে গ্রক, চ্যাপলিন আর শেক্সপীয়রের নাটকের ভাঁড়দের নিয়ে এক আলোচনায় জড়িয়ে ফেলেছিল। আমি সে বাবদে কেবল উত্তম-মধ্যম ঠ্যাঙানিই খাইনি ; (এইসব শিল্পীভাবাপন্ন মানুষগুলো শিল্পের কাছাকাছি জিনিস ভাঙিয়ে বেশ বহাল তবিয়তে থাকে, কাজ করতে হয়না বলে গায়ে ওদের অসুরের শক্তি), তার ফলে বিশ্রী ধরনের জনডিস হয়ে গিয়েছিল আমার। ঐ জঘন্য জায়গা ছেড়ে চলে আসতেই আবার জলদি সেরে উঠেছিলাম।

আমাকে যা খুব অশান্তিতে ফেলে সে হচ্ছে, আমি নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারি না। আমার দালাল ৎসোনেরারার বলবে, আমার প্রতিভাকে সংযত করতে। আমার ক্যারিকেচারগুলো বড্ড বেশী রকম মূকাভিনয়, সূক্ষ্ম কাজে আর ভাঁড়ামিতে মেশানো—আর আমার অভিনয়ের বিষয়গুলো আমি হামেশাই বদল করি। খুব সম্ভব আমার 'ক্যাথলিক এবং ইভাঞ্জেলিক সারমন', 'ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং', 'যানবাহন চলাচল' আর অন্য দুচারটে দিয়ে কয়েক বছর চালিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু যে কোনও একটা দশ কি বিশবার দেখাবার পরই আমার আর ভাল লাগত না, দেখাতে দেখাতে হাই উঠতে শুরু করত, সত্যি সত্যিই প্রচণ্ড চেষ্টায় মুখের মাংসপেশীগুলোকে সংযত করতে হতো। নিজেকেই নিজের একঘেয়ে লাগে, যখন ভাবি, এমনও ক্লাউন আছে যে ত্রিশ বছর ধরে একই জিনিস দেখিয়ে আসছে তখন আমার বুকটা এমন কেঁপে ওঠে যেন এক বস্তা ময়দা চামচে করে খেয়ে শেষ করার শাস্তি হয়েছে আমার। কাজে আমাকে মজা পেতে হবে, নইলে আমার অবস্থা কাহিল। হঠাৎ মনে পড়ল, আমি দরকার হলে জাগলিংও করতে পারি বা গান গাইতেও পারি—দৈহিক ট্রেনিং এড়াবার জন্যে ওটা আসলে অজুহাত। অন্ততপক্ষে চার, সম্ভব হলে ছ'ঘণ্টা ট্রেনিং, বেশী করতে পারলে আরও ভাল হয়। গত ছয় সপ্তাহ ধরে তাতেও গাফিলতি করে আসছি। কেবল দুচারটে শীর্ষাসন, হাতের ওপর দাঁড়ান ডিগবাজী খাওয়াই হয়েছে মাত্র আর আমার সঙ্গে সব সময় যে রবারের মাদুর থাকে তার ওপর একটুখানি ব্যায়াম করেছি। এখন ভাঙা হাঁটুর দরুন একটা ভাল অজুহাত পাওয়া গেছে, সোফায় শুয়ে থাকো, সিগারেট খাও আর আপন দুঃখে কাতর হও। আমার নতুন মূকাভিনয় 'মন্ত্রীর বক্তৃতা' বেশ ভালই হয়েছিল। কিন্তু ক্যারিকেচার করতে খারাপ লাগত। আমি একটা বিশেষ স্তরের ওপারে কিছুতেই যেতে পারিনি। যাচ্ছেতাই জবরজং একটা

কিছু না করা নাটকীয় কিছু একটা আমি কখনই দেখাতে পারিনি। 'নতুন্ত্রত জোড়', 'স্কুলের পথে' এবং 'স্কুল থেকে বাড়ির পথে' শিল্প বিচারে অন্তত চলনসই। কিন্তু মানুষের জীবন দেখাতে গেলেই আমি ফিরে গেছি ক্যারিকেচারে ঃ মারী ঠিকই বলত, আমার গীটার বাজিয়ে গান গাওয়ার চেষ্টা আসলে আমার পলায়নী মনোবৃত্তি। সবচেয়ে ভাল পারি আমি নিত্য-নৈমিত্তিক অস্বাভাবিক ব্যাপারগুলো দেখাতে। আমি খুঁটিয়ে দেখি, আর সেগুলোকে যোগ করি। তারপর শতকরা হিসাব করে তার বর্গমূল বার করি; কিন্তু যে সংখ্যা দিয়ে শতকরা হিসাব বার করেছি তা দিয়ে নয় ঃ সম্পূর্ণ অন্য কোনও সংখ্যার সাহায্যে। সব বড় স্টেশনেই সকালের দিকে হাজার হাজার লোক আসে, তারা শহরে কাজ করে আর হাজার হাজার লোক শহরের বাইরে যায়, তারা বাইরে কাজ করে। লোকগুলো কেন যে তাদের কাজের জায়গাগুলো পাল্টাপাল্টি করে নেয় না! কিম্বা এই গাড়ির মিছিলগুলো, অফিসটাইমে একে অন্যের পাশ কাটিয়ে ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে ছোটে। কাজের বা থাকবার জায়গা পাল্টে নাও, তাহলেই এই দুর্গন্ধ আর পুলিশের নাটকীয় দুহাত-দিয়ে-বৈঠা-বাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তাহলেই চৌমাথাগুলো এত নির্জন হয়ে যেত যে, সেখানে বসে লুডো খেলা যেত। এটা লক্ষ করে আমি একটা মূকাভিনয় তৈরি করেছিলাম, স্রেফ হাত আর পা দিয়ে কাজ করি, আমার মুখটা স্থির, ধবধবে সাদা, সবসময় ঠিক মধ্যিখানে আর মাত্র এই চারটে অঙ্গের সাহায্যে আমি একটা বিশাল পরিমাণে উপচে-পড়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম। আমার কথা হচ্ছে—যথাসম্ভব কম, সবচেয়ে ভাল আদৌ কোনও বস্তু না নিয়ে কাজ কর। 'স্কুলের পথে এবং স্কুল থেকে বাড়ির পথে' দেখাতে আমার একটা ব্যাগও দরকার হয় না, যে হাতে ওটা ধরা আছে, সেটাই যথেষ্ট। ট্রামের ঘণ্টা দিয়ে দিয়েছে, ছাড়ছে, শেষ মুহূর্তে আমি দৌড়ে তার সামনে দিয়ে রাস্তা পার হই, লাফিয়ে বাসে উঠি, সেখান থেকে নেমে পড়ি। দোকানে সাজান জানালায় দাঁড়াই অন্যমনস্ক হয়ে, চক দিয়ে বাড়ির দেয়ালে ভুল বানানে লিখি, দাঁড়াই—দেরিতে এসেছি—মাস্টারমশাই বকছেন, পিঠের ব্যাগটা নামিয়ে বেঞ্চ-এর ফাঁকে গলে যাই। শিশু জগতের এই যে কাব্য, এ আমি খুব ভাল দেখাতে পারি। শিশুর জীবনে অর্থহীনতার মাপ আছে, অনাসক্ত, অগোছাল, সদা-বিষণ্ণ। শৈশবে শিশুরও ছুটি নেই, যখন 'করতে হয়'-গুলো মেনে নেয় তখন থেকে শুরু হয় ছুটি। ছুটির সময়কার যাবতীয় ভাব-ভঙ্গিগুলো আমি প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে লক্ষ করি—একজন শ্রমিক

কেমন করে মজুরির খামটা পকেটে রেখে তার মটর সাইকেলে চেপে, শেয়ার মার্কেটের লোকটা কেমন করে সেদিনের মত টেলিফোনটা হাত থেকে নামিয়ে রাখে, তার নোট বইটা ড্রয়ারে রেখে সেটা চাবি দেয় কিংবা মুদি দোকানের মহিলাটি তার এ্যাপ্রনটা খুলে রাখে, হাত ধোয় আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠোঁটটা একটু ঠিক করে, হ্যাণ্ডব্যাগটা নেয়—তারপরই হাওয়া, এ সবেই এত মানুষ-ভাব যে নিজেকে আমার অনেকসময় অমানুষ মনে হয়, কারণ ছুটি আমি কেবল ক্যারিকেচার হিসেবে দেখাতে পারি। মারীর সঙ্গে একবার আলোচনা করেছিলাম, পশুদেরও কি তবে ছুটি থাকতে পারে, একটা গরু যখন জাবর কাটে, একটা গাধা যখন বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে ঝিমোয়। ওর মতে, পশুরা কাজ করে তাই তাদের ছুটি থাকতে পারে, ব্যাপারটা কেমন যেন। ঘুমটা হয়ত ছুটিজাতীয় একটা কিছু, মানুষ পশুর মধ্যে একটা চমৎকার সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু ছুটির ছুটিত্ব হচ্ছে যে তা সম্পূর্ণ সজ্ঞানে উপভোগ করা যায়। এমন কি ডাক্তাদের ছুটি আছে, ইদানীং পাদ্রীদেরও। তাতে আমার বিরক্ত লাগে, ওদের ছুটি থাকা উচিত নয়, আর শিল্পীর ছুটি ওদের বোঝা উচিত। শিল্প সম্বন্ধে তাদের কিছুই বোঝার দরকার নেই—উদ্দেশ্য, অনুজ্ঞা, ওই সব হাবি-জাবি কিছু না, তবে শিল্পীর প্রকৃতি সম্বন্ধে ওদের জ্ঞান আবশ্যক। মারীর ভগবানে বিশ্বাস আছে, ওর সঙ্গে আমি বরাবর তর্ক করেছি। জানতে চেয়েছি, তার ছুটি আছে কিনা, ও বরাবর বলত, হ্যাঁ আছে। মারী ওল্ড টেস্টামেণ্ট পেড়ে এনে সৃষ্টির ইতিহাস থেকে পড়ে শোনাত আমাকে: 'এবং সপ্তম দিবসে তিনি বিশ্রাম নিয়াছিলেন।' আমি নিউ টেস্টামেণ্ট উল্লেখ করে আপত্তি তুলতাম, বলতাম, হতে পারে, ভগবান ওল্ড টেস্টামেণ্ট-এ ছুটি পেয়েছিল, কিন্তু একজন খ্রীস্টান এবং ছুটি আমি একসঙ্গে ভাবতেই পারি না। মারী ফ্যাকাশে হয়ে উঠত, যখন আমি বলতাম যে, ও স্বীকার করেছে যে, ও জানে 'খ্রীস্ট বিশ্রাম নিয়েছে' ধারণাটা ঈশ্বর-নিন্দার তুল্য। খ্রীস্ট উৎসব হয়তো করেছে, কিন্তু ছুটি কখনই পায়নি।

ঘুমোতে পারি আমি জন্তুর মত, যেমন হয় স্বপ্ন ছাড়া। অবশ্য প্রায়ই তা মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য; কিন্তু তবুও মনে হয় যেন অনন্তকাল পরে ফিরে এলাম, যেন মাথাটা একটা দেয়াল ফুঁড়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, যার ওপাশে ছড়িয়ে আছে অনন্ত অন্ধকার, বিস্মৃতি আর অবকাশ, আর আছে সেই শূন্যতা যার কথা হেনরিয়েটে কখনো কখনো ভাবত; তখন ও হঠাৎ টেনিস র্যাকেটটা

ঝাঁটিতে ফেলে দিত। কিংবা চামচটা ফেলে দিত স্যুপের মধ্যে অথবা একটা ছোট্ট মোড় নিয়ে জামগুলোকে ছুঁড়ে দিত আগুনে, আমি ওকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওর ও-রকম হলে ও কিসের কথা ভাবে, ও বলেছিল 'তুই সত্যিই জানিস না?' 'না,' আমি বলেছিলাম, তখন ও আস্তে করে বলেছিল, 'শূন্য, আমি ভাবি শূন্যের কথা।' আমি বলেছিলাম, শূন্যের কথা আবার ভাবা যায় নাকি? ও বলেছিল, 'হ্যাঁ, ভাবা যায়, আমার ভেতরটা তখন হঠাৎ একদম ফাঁকা হয়ে যায় আর কেমন যেন মাতালের মত হয় ভাবটা, তখন ইচ্ছা করে জুতো জোড়াও ছুঁড়ে ফেলে দিই। জামা-কাপড়ও—সম্পূর্ণ ভারহীন হতে ইচ্ছে করে।' ও আরও বলেছিল, সেটা নাকি এমন চমৎকার যে, ও যেন সব সময় তারই অপেক্ষায় থাকে, কিন্তু তার আশায় থাকলে তা কখনও আসে না, সে আসে সব সময় একান্ত অতর্কিতে, আর যখন আসে অনন্তকালের মত থাকবে মনে হয়। ওর ও-রকম স্কুলেও হয়েছিল দু' চারবার। আমার মনে আছে, মায়ের সঙ্গে ওর ক্লাস টিচারের সেই উত্তেজিত টেলিফোন আর সেই কথা—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হিস্টিরিয়ার মত, ঠিক বলেছেন—কড়া শাস্তি দেবেন।'

প্রায় সেই চমৎকার শূন্যতার অনুভূতি আমার হয় মাঝে মাঝে লুডো খেলতে গিয়ে, তিন চার ঘণ্টার বেশী খেললেই ওরকম হয়। স্রেফ ওই শব্দ, ছকের খট্‌খট্‌ শব্দ, ঘুঁটি চালাবার শব্দ, ঘুঁটি মারার শব্দ। মারীর ঝোঁক বরং দাবা খেলার দিকে ছিল। আমি ওকে এমন অবস্থায় এনেছিলাম যে, ওর লুডো খেলার নেশা ধরে গিয়েছিল। ওটা আমাদের কাছে নেশার ওষুধের মত ছিল। আমরা মাঝে-মধ্যে একটানা পাঁচ ছ'ঘণ্টা ধরে খেলতাম, আর বয় বা ঝি যারা চা বা কফি নিয়ে আসত তাদের মুখে রাগ আর ভয়ের সেই একই মিশ্রণ দেখা যেত, যা দেখা যেত আমার মায়ের মুখে যখন হেনরিয়েটের ও-রকম হতো, মাঝে মাঝে ওরা—সেই বাসের লোকেরা যেমন বলেছিল, যখন আমি মারীর ওখান থেকে বাড়ি ফিরছিলাম—বলত 'অসম্ভব।' মারী ফুট্‌কি দিয়ে জটিল এক লেখার পদ্ধতি বের করেছিল তাতে কাউকে বার করে দেওয়া হলে বা কেউ বের হয়ে গেলে, যখন যেমন সেই অনুযায়ী ফুটকি বসানো হতো। একটা খুব মজার ছক তৈরি করেছিল, আর আমি ওকে একটা চাররঙা পেনসিল কিনে দিয়েছিলাম, যাতে ও এ্যাকটিভ আর প্যাসিভ (ঐ নাম ওর নিজের দেওয়া) নম্বরগুলো সহজে ঠিক রাখতে পারে। মাঝে মাঝে ট্রেনে অনেক দূর কোথাও যাবার সময় আমরা ওই খেলা খেলতাম,

আর সম্ভ্রান্ত যাত্রীরা অবাক হয়ে যেত—তারপর হঠাৎ একদিন আমি খেয়াল করলাম যে, মারী আমার সঙ্গে খেলত কেবল আমাকে খুশি করার জন্য আমাকে শান্ত রাখার জন্যে, আমার 'শিল্পী মনের' বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে ও ইচ্ছুক বলে। ওর চিন্তা ভাবনা যেন দূরে কোথাও চলে গিয়েছিল। ব্যাপারটা শুরু হয় কয়েকমাস আগে আমি তখন বন্-এ যেতে রাজী হচ্ছিলাম না যদিও আমার পর পর পাঁচদিন কোনও শো ছিল না। আমি বন্ যেতে চাইনি কারণ আমার ঐ 'চক্র' সম্বন্ধে ভয় ছিল, ভয় ছিল লেয়োর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার; কিন্তু মারী বারে বারেই বলছিল, ওর 'ক্যাথলিক হাওয়ায় নিশ্বাস' নেবার দরকার। আমি ওকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম, আমাদের সেই 'চক্রে' প্রথম সন্ধ্যার পর বন্ থেকে কোলন্ কী ভাবে আমরা ফিরেছিলাম—ক্লান্ত, তিক্ত এবং হতাশ, আর ও কেমন ট্রেনের মধ্যে বারে বারেই আমাকে বলছিল, 'তুমি খুব ভাল, তুমি খুব ভাল', বলতে বলতে আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল, মাঝে-মধ্যে শুধু চমকে উঠছিল যখন বাইরে গার্ড স্টেশনের নাম চেঁচিয়ে বলছিল: সেথটেম, হ্বালব্যারব্যার্গ, ব্রুল, কালশয়েন, প্রত্যেকবার চমকে উঠছিল, সোজা হয়ে বসেছিল ও আর আমি ওর মাথাটা আবার আমার কাঁধের ওপর চেপে দিচ্ছিলাম। আমরা যখন কোলন্-ওয়েস্ট-এ নামলাম ও বলেছিল, 'সিনেমায় গেলেই ভাল হতো।' ও ঐ ক্যাথলিক হাওয়ায় নিশ্বাস নেবার কথা তুলতেই আমি ওকে সে-সব কথা মনে করিয়ে দিয়েছি, বলেছি নাচতে, লুডো খেলতে কি সিনেমায় যাবার কথা। ও কিন্তু শুধু মাথা নেড়েছিল শেষমেস একাই বন্-এ চলে গেছে। 'ক্যাথলিক হাওয়া' ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢোকে না। তাছাড়া আমরা ছিলাম ওসনাব্রুক-এ, তেমন অ-ক্যাথলিক সেখানকার হাওয়া হতে পারে না।

১১

আমি বাথরুমে গিয়ে, মনিকা সিল্ভেস আমার জন্যে যে লোশন রেখে দিয়েছিল, তার খানিকটা টবে ঢেলে গরম জলের ট্যাপটা খুলে দিলাম। স্নান প্রায় ঘুমোনোর মত ভাল, তেমনি ঘুমোনো প্রায় 'সেই ব্যাপারটা' করার মত। মারী তাই বলত, আর আমি ওর ভাষাতেই, তা ভাবি। আমি ভাবতেই পারি না যে, ও ৎস্যুফ্নার-এর সঙ্গে 'সেই ব্যাপারটা' করবে, আমার মগজে ওরকম ভাবনার জন্য কোনও কুঠুরীই নেই, যেমন মারীর ছাড়া জামা-কাপড় নেড়েচেড়ে দেখবার তেমন কোনও ইচ্ছা কখনও হয়নি। আমি বড় জোর ভাবতে পারি যে, মারী ৎস্যুফ্নার-এর সঙ্গে লুডো খেলছে—আর তাতে আমার মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছিল। আমার সঙ্গে যা-যা করত তার কোনওটা ও ৎস্যুফ্নার-এর সঙ্গে করতে গেলে নিজেকে ওর বিশ্বাসঘাতিনী বা বেশ্যা বলে মনে হওয়া উচিত। মারী ওর জন্য চাই কি রুটিতে মাখনও লাগিয়ে দিতে পারে না। যখন ভাবি, ও অ্যাসট্রেতে রাখা ৎস্যুফ্নারের সিগারেট নিয়ে খাচ্ছে, আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে যাই, আর ৎস্যুফ্নার যে সিগারেট খায় না, বা মারীর সঙ্গে খুব সম্ভব দাবা খেলে, তাতেও কোন শান্তি পাই না। একটা না একটা কিছু তো ও ৎস্যুফ্নারের সঙ্গে করবে, নাচতে যাওয়া বা তাস খেলা, ও ৎস্যুফ্নারকে বা ৎস্যুফ্নার ওকে জোরে জোরে কিছু পড়ে শোনাবে, আর ৎস্যুফ্নারের সঙ্গে ওকে কথাও তো বলতে হবে আখহাওয়া সম্বন্ধে কি অর্থ সম্বন্ধে। বস্তুত মারী কেবল ওর জন্য রাঁধতে পারে। তাতে বারে বারে আমার কথা মনে পড়বে না, কারণ ও কদাচিৎ আমার জন্য রান্না করেছে, কাজেই তাতে বিশ্বাসঘাতকতা বা বেশ্যাবৃত্তি নাও হতে পারে। খুব ইচ্ছা করছিল জুম্বুনি সমারহিল্ডকে ফোন করি। কিন্তু তাহলে ওটা ঠিক সময়ের আগেই হয়ে যায়, তাই আমি ঠিক করেছি ওকে রাত সাড়ে তিনটের সময় বিছানা থেকে তুলে ওর সঙ্গে বিশেষ করে শিল্প নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করব। ওকে ফোন করে কতটা নীতিজ্ঞান ও মারীকে গিলিয়েছে বা কতটা দালালী ও ৎস্যুফ্নার-এর কাছ থেকে পেয়েছে, সে কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর এক এ্যাবোট-ক্রশ না চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্য-রাইন ম্যাডোনা, কিন্তু এসব জিজ্ঞেস করার পক্ষে সন্ধ্যে আটটা নিতান্ত ভদ্র সময়। ওকে কিভাবে খুন করব সে কথাও

ভাবছিলাম। নন্দনতাত্ত্বিকদের বোধ হয় মূল্যবান শিল্প সামগ্রীর সাহায্যে খুন করা সবচেয়ে ভাল, যাতে মরে গিয়েও তারা শিল্প সংক্রান্ত বজ্জাতির জন্য অশান্তি পায়। একটা ম্যাডোনা তেমন মূল্যবান নয় আর বড্ড টেকসইও তাতে ও মরেও শান্তি পাবে যে ম্যাডোনাটা ভেঙে যায়নি। আর একটা ছবিও যথেষ্ট ভারী নয়, বড় জোর ফ্রেমটা, তাতেও শান্তি পাবে যে, অমূল্য ছবিটা অক্ষত আছে। আমি বড়জোর একটা দামী ছবির রঙ আঁচড়ে তুলে তারপর সেই ক্যানভাস চেপে ধরে ওকে দম বন্ধ করে অথবা ফাঁস দিয়ে মারতে পারি। নিখুঁত মানুষ খুন নয়, তবে নিখুঁত নান্দনিক খুন। ওরকম একটা তাজা মানুষকে পরপারে পাঠানোও চাট্টিখানি কথা নয়, সমারছিবলড লম্বা দোহারা। তার চুল সাদা আর মনটা দয়ালু। বেশ দুটো বিশ্বযুদ্ধ দেখেছে বলে তার খুব গর্ব। খেলাধুলারও সে রুপোর মেডেল পেয়েছে। একজন কট্টর ও অক্ষত শরীর এবং প্রতিদ্বন্দ্বী। আর কিছুতে হবে না আমাকে ধাতু দিয়ে তৈরি একটা শিল্প-সামগ্রীর ব্যবস্থা করতেই হবে, ব্রোঞ্জ কিংবা সোনার, শ্বেতপাথরের হলেও বোধহয় চলবে; কিন্তু তার আগে রোমে গিয়ে ভাটিকান মিউজিয়াম থেকে ওরকম কিছু একটা চুরি করে আনব তাও সম্ভব নয়।

বাথটবে যখন জল ভরতি হচ্ছিল তখন আমার রোথার্ট-এর কথা মনে পড়ল, 'চক্রের' একজন হোমরা-চোমরা সভ্য। তাকে আমি মাত্র দুবার দেখেছি। লোকটা কিংকেলের 'দক্ষিণপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বী'দের মত। কিংকেলের মতই রাজনীতি করে, তবে 'ভিন্ন ঐতিহ্য সম্পন্ন ও সামাজিক পরিবেশের' মানুষ। কিংকেলের যেমন ফ্রেডেবয়েল, এর তেমনি ৎস্যুফ্‌নার; এক ধরনের শিষ্য, আর 'একই ধর্মের উত্তরাধিকারী', কিন্তু রোথার্টকে ফোন করে তেমন লাভ নেই, তার চেয়ে আমার ফ্ল্যাটের দেয়ালগুলোর কাছে সাহায্য চাওয়া ভাল। একটামাত্র ব্যাপারে ওর ভেতরে কিঞ্চিৎ জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল, তা হচ্ছে কিংকেলের ব্যারক ম্যাডোনাগুলো নিয়ে। ও ওগুলোকে যেভাবে ও নিজেরগুলোর সঙ্গে তুলনা করেছিল, তাতেই আমার জানা হয়ে গেছে ওরা পরস্পরকে কী ভীষণ ঘৃণা করে। লোকটা কোন একটা সংস্থার প্রেসিডেন্ট, কিংকেল-এরও খুব ইচ্ছে ছিল সেই সংস্থার প্রেসিডেন্ট হওয়ার। ওরা একই স্কুলের ছাত্র ছিল তাই একজন আর একজনকে 'তুমি' বলে। দুবারের প্রত্যেকবারই আমি রোথার্টকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। লোকটা মাঝারি গোছের লম্বা, সাদাটে ফর্সা আর দেখতে পঁচিশ বছরের ছোকরার মত। ওর

দিকে কেউ তাকালে ও খুশিতে ডগমগ করে। কিছু বলার আগে আধ মিনিট দাঁত কিড়মিড় করে। তারপর যা বলে তার প্রতি চারটে কথার মধ্যে দুটো থাকে 'কান্ৎসলার' আর 'ক্যাথোলোন'—তারপর হঠাৎ দেখা যায় লোকটার বয়স পঞ্চাশের ওপর, কিন্তু দেখলে মনে হয় যেন কোনও অজানা মানসিক চাপে অকালবৃদ্ধ ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। অদ্ভুত মানুষ। দু'চারটে কথা বলতে গেলে মাঝে-মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে, তোতলাতে থাকে, 'কা-কা-কা-কা' করতে শুরু করে এমনভাবে যে, 'নৎসলার' বা 'থোলোন' শব্দটুকু বার না করা পর্যন্ত আমার কষ্ট হয় ওর জন্য। মারী আমাকে বলেছিল, লোকটা নাকি 'রীতিমত বুদ্ধিমান'। আমি ওর ওই ধারণার কোনও কারণ দেখিনি কখনও, একবার মাত্র আমার সুযোগ হয়েছিল ওর কাছ থেকে কুড়িটার বেশি শব্দ শুনবার। সেবার সেই 'চক্রে' মৃত্যুদণ্ড নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। লোকটা 'মৃত্যুদণ্ডের প্রতি আপোসহীন সমর্থন' ঘোষণা করেছিল।

আমি তার উক্তিতে অবাক হয়েছিলাম এজন্য যে, সে আদৌ উল্টো সুরে একটা কথাও বলেনি। বলার সময় তার সারা মুখে একটা গর্বিত তৃপ্তি ছিল। বলতে বলতে সে ওই কা-কা-তে হোঁচট খাচ্ছিল। এমনভাবে খাচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন প্রত্যেক কা বলা মানে একটা করে মাথা কেটে ফেলা। মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছিল আর প্রত্যেকবারই এমন একটা অবাক ভাব নিয়ে তাকাচ্ছিল যেন নিজেকেই 'অবিশ্বাস্যভাবে' অস্বীকার করছে সে, তবে মাথা নাড়াটা থামায়নি কখনো। আমার মনে হয়েছে ক্যাথলিক না হলে কোন ব্যক্তির অস্তিত্বই নেই ওর কাছে। আমার কেবল মনে হচ্ছিল, মৃত্যুদণ্ড চালু হলে লোকটা সব অ-ক্যাথলিককে অভিযুক্ত করার জন্য ওকালতি করত। ওরও স্ত্রী, বাচ্চা আর টেলিফোন আছে। তবুও ওকে নয় বরং আর একবার আমার মাকেই ফোন করব ঠিক করলাম। মারীর কথা ভাবতে গিয়ে রোথার্ট-এর কথা মনে পড়েছিল। লোকটা তো মারীর ওখানে হামেশাই যাতায়াত করবে। ও ওই সমিতির কি যেন একটা, আর ও সব সময়ের অতিথিদের মধ্যে একজন হবে ভাবতে আমার ভয় করছিল। মারীকে আমার ভাল লাগে আর ওর ঐ স্কাউট ভাষা, 'যে-পথে আমাকে যেতে হবে, সে-পথে আমি অবশ্যই যাব।' বাণীটা কতকটা হিংস্র জানোয়ারের খাদ্য হবার আগে একজন একান্ত খৃস্ট-প্রাণের বিদায় সমস্যার সমাধান বলে ধরে নিতে হবে। আমি মনিকা সিল্ভস্-এর কথাও ভাবছিলাম, জানতামও, যে-কোনও একদিন ওর মমতার

আদর আমাকে গ্রহণ করতে হবে। ও বড় সুন্দর আর বড় ভাল, তাছাড়া আমার মতে ওই 'চক্রে' মারীর চেয়েও ওকে কম মানায়। ওকে রান্নাঘরেই মানায় ভাল—আমি ওকে একবার স্যান্ডউইচ বানাতে সাহায্য করেছিলাম—হাসুক, নাচুক বা ছবি আঁকুক, সবই কেমন স্বচ্ছন্দ, অবশ্য ওর আঁকা ছবি আমার কখনো ভাল লাগেনি। সমারউইল্ড-এর কাছ থেকে ও বড্ড বেশী বক্তৃতা আর বাণী শুনেছে। আর যত ছবি এঁকেছে তার প্রায় সবই ম্যাডোনার। আমি ওটা ছাড়তে চেষ্টা করব। যতই ভাল আঁকুক আর যতই বিশ্বস্ত হোক ও-থেকে কখনোই সাফল্য আসতে পারে না। ভাল আঁকতে ওদের উচিত ছিল ওই ম্যাডোনার ছবি আঁকার ভারটা বাচ্চাদের ওপরে আর যারা আঁকায় হাত পাকাচ্ছে সেই উৎসাহীদের ওপরে ছেড়ে দেওয়া। ওরা নিজেদের শিল্পী মনে করে না। ভাবছিলাম মনিকাকে ঐ ম্যাডোনার ছবি আঁকার থেকে নিবৃত্ত করতে পারব কিনা। ও শৌখিন শিল্পী নয়, এখনও অল্প বয়স, বাইশ কিম্বা তেইশ, এবং নিশ্চয় এখনও অনাঘ্রাতা কুমারী।—আর এতে করে আমার ভেতরে ভয় ঢুকে গিয়েছিল। আমার সাংঘাতিক দুশ্চিন্তা হয়েছিল যে ক্যাথলিকরা আমাকে দিয়ে ওদের জন্য 'সীগফ্রিড'-এর কাজ করিয়ে নেবার মতলব এঁটেছে। ও আমার সঙ্গে সে-ক'বছরই মাত্র থাকবে, আমাকে ভালবাসবে, যতক্ষণ না প্রচলিত রীতিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখন ও বন্-এ ফিরে গিয়ে ফন্ সেভেয়ার্ন'কে* বিয়ে করবে। এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিলাম। আর তক্ষুনি সে ভাবনা ত্যাগ করেছিলাম। মনিকা এত ভাল যে, ওকে নিয়ে কোনও কুচিন্তা আমি করতে চাইনি। যদি আমি কখনও ওর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে দিন ঠিক করি, তার আগে ওর মাথা থেকে সমারউইল্ডকে তাড়াব। ওই দাক্ষিণ-নারকটি প্রায় আমার বাবার মত দেখতে। তফাৎ কেবল এই যে, সহৃদয় শোষক ছাড়া আমার বাবার দ্বিতীয় কোন মুখোশ নেই এবং ওটাই তার পক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু সমারউইল্ড সম্বন্ধে আমার বরাবরই ধারণা, লোকটা অনায়াসে হোটেল বা কনসার্ট পার্টির ম্যানেজার, কি জুতোর কারখানার পাবলিক রিলেশনস্ অফিসার, একজন প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় গায়ক, হয়তো বা একটা আধুনিক কেতা-দুরস্ত কাগজের সম্পাদকও হতে পারত। প্রত্যেক রবিবার সন্ধ্যায় লোকটা সেন্ট কর্বিনিয়ান-এ সারমন দেয়। মারী আমাকে দুবার সেখানে নিয়ে গেছে। সমারউইল্ড-এর ওপরঅলারা তাকে যতখানি সহ্য করতে সম্মত থাকত তার

* জার্মান-কিংবদন্তীর এক নায়ক। বহু কঠিন কীর্তির জন্ত বিখ্যাত।

চেয়েও বিরক্তিকর হতো তার বক্তৃতা। আমি বরং রিলকে, হফম্যানস্‌টাল আর নিউম্যান্‌-কে আলাদা আলাদা বেশ পড়তে পারি কিন্তু ওই তিন জনকে মিশিয়ে সরবৎ বানালে-তা কিছুতেই আমার সহ্য হয় না। 'সারমনের' সময় আমার ঘাম ঝরছিল। আমার নিরামিষ স্নায়ুতন্ত্রীতে বিশেষ ধরনের অ-প্রাকৃতিক আবির্ভাব সহ্য হয় না। যা হবার তা হবে, যা ভাসবার তা ভাসবে—এসব কথা শুনলেই আমার ভয় করে। তার চেয়ে এক মোটাসোটা অসহায় পাদ্রী যখন এই ধর্মের অবিশ্বাস্য বিষয়গুলো জড়ো করে উপদেশ-মঞ্চ থেকে বলবে বরং তাই শুনব, কেননা, সে নিজেকে অন্তত 'অভ্রান্ত' বক্তা বলে মনে করে না। সমারহিল্ড-এর সারমনে আমি আদৌ মুগ্ধ হইনি দেখে মারী খুব দুঃখিত হয়েছিল। সবচেয়ে অস্বস্তিকর ঘটনা হয়েছিল, যখন সারমন-এর পর আমরা কবি'নিয়ান গীর্জার পাশেই একটা কাফেতে এলাম, পুরো কাফেটা তখন ওই সারমন থেকে আসা শিল্পী-ভাবাপন্ন মানুষে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। তারপর এল সমারহিল্ড নিজে, ওর চারপাশে একটা বৃত্তমত তৈরি হয়েছিল, আমরা সেই বৃত্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম, আর সেই আধা-রাসায়নিক পদার্থ যা লোকটা মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বলেছিল তাই আবার দুই তিন এমনকি চারবার অবধি চর্বিত-চর্বণ করা হল। একটা ছবির মত সুন্দরী অভিনেত্রী—লম্বা সোনালি চুল, আর পরীর মত মুখ—মারী আমার কানে কানে বলেছিল—ইতিমধ্যেই বুঝি 'তিনপোয়া' ক্যাথলিক হয়ে এসেছে—সে সমারহিল্ড-এর পায়ে প্রায় চুমু খায় আর কি। আমার মনে হয়েছিল, লোকটা তাতে কখনই বাধা দিত না।

আমি স্নানের জল বন্ধ করে কোটটা খুললাম, জামা-গেঞ্জি মাথার ওপর দিয়ে টেনে বার করে কোণের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বাথটবে উঠতে যাব এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। আমার জানা একটা লোকই কেবল টেলিফোনকে এইরকম জোর আর পুরুষ মানুষের মত বাজাতে পারে—ৎসোনেরারার, আমার দালাল! লোকটা ফোনটাকে মুখের এত কাছে এনে এত জোর দিয়ে কথা বলে যে, আমার সবসময় ভয় হয়, ওর থুথু এসে আমার মুখে লাগবে। ও যদি আমাকে ভাল কথা কিছু বলতে চায় তবে এভাবে শুরু করে, 'কাল আপনি দারুণ করেছেন'; ও কথা ও বলে, আমি সত্যি সত্যিই দারুণ করেছি কিনা সে খবর স্রেফ না জেনে শুনেই। আর যদি খারাপ কিছু বলতে চায় তবে শুরু করে এই বলে, 'শুনুন শ্নীয়ার, আপনি ভালই জানেন আপনি চ্যাপলিন নন।' ও-কথার মানে ওর কাছে এ-নয় যে, আমি চ্যাপলিনের মত ভাল ক্লাউন নই, ও-কথার

একমাত্র অর্থ, আমি এমন একটা কিছু করবার মত যথেষ্ট বিখ্যাত নই যাতে ওসোনেন্নারার বিরক্ত হতে পারে। জানি, আজকে সে খারাপ কথাও বলবে না, অন্য বার আমি কোনও শো নাকচ করে দিলে যেমন পৃথিবীর আসন্ন প্রলয়ের খবর জানায়, তেমনও করবে না। এমনকি আমাকে 'নাকচ করার পেয়ে বসেছে' বলেও অভিযোগ করবে না। খুব সম্ভব ওফেনবাখ, বামব্যার্গ আর ন্যুর্নব্যার্গও নাকচ করেছে, আর ও আমাকে টেলিফোনে হিসাব দেবে আমার খাতে ইতিমধ্যে কত খরচা হয়ে গেছে ওর। টেলিফোন বেজেই চলেছে, জোর, পুরুষালি প্রাণবন্ত, আমার খুবই ইচ্ছা করছিল ওটার ওপর সোফার একটা বালিশ ছুঁড়ে মারি; কিন্তু গায়ে চাপালাম ড্রেসিংগাউনটা, বসবার ঘরে গিয়ে বাজতে-থাকা টেলিফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ম্যানেজারদের সত্যিই ক্ষমতা আছে, শিল্পী মনের স্পর্শকাতরতা' জাতীয় কথা ওদের কাছে 'ডর্টমুন্ডার আক্-টিয়েন বীয়ার'-এর মত, আর ওদের সঙ্গে শিল্পী বা শিল্প নিয়ে কথা বলার প্রতিটি চেষ্টাই স্রেফ দমের বাজে খরচ। ওরা নিজেরাও জানে, একজন বিবেকহীন শিল্পীর বিবেক একজন বিবেকবান ম্যানেজারের চেয়ে হাজার গুণ বেশী, আর ওদের হাতে একটা সর্বজয়ী অস্ত্র আছে যার বিরুদ্ধে শিল্পীর কিছু করার নেই—একটা পরম সত্য ওরা জেনে গেছে, ম্যানেজার যা করতে বলবে তা বাদে অন্য কিছুই শিল্পী করতে পারে না। তা হোক ছবি আঁকা, ক্লাউন হয়ে দেশময় ঘুরে বেড়ানো, গান গাওয়া, পাথর বা গ্র্যানাইট খোদাই করে 'স্থিতিশীল' সৃষ্টি করা। শিল্পী একটা মেয়েমানুষের মত, সে কেবল পারে ভালবাসতে আর কিছু সে পারে না, অধিকন্তু যে-কোনও পুরুষ গাধা এগিয়ে এলেই তার কাছে নেতিয়ে পড়ে। শোষিত হওয়ার ব্যাপারে শিল্পী আর মেয়েমানুষের মিল সবচেয়ে বেশী। প্রত্যেক ম্যানেজার, শতকরা নিরানব্বই জন, বেশ্যা পল্লীর মালিকের মত। টেলিফোনের এই শব্দ খাঁটি বেশ্যা-পল্লী-মালিক-শব্দ। লোকটা নিশ্চয় কোস্টার্ট-এর কাছে শুনেছে কখন আমি বোখুম থেকে রওনা হয়েছি, আর ঠিকই জানত, আমি বাড়িতে। ড্রেসিংগাউনের বেলট্টা কোমরে বেঁধে ফোনটা নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের বীয়ারের গন্ধ আমার নাকে লাগল। 'মলো যা, শ্নীয়ার', ও বলল, 'এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করানর মতলবটা কি শুনি!'

'আমি সবে স্নান করবার একটা সামান্য চেষ্টা করছিলাম,' আমি বললাম, 'সেটা কি চুক্তি বিরোধী?'

'আপনার ফাঁসির কাঠেও রসিকতা', ও জবাব দিল।

'রসিটা কোথায়, বুলতে শুরু করেছে নাকি ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'সাঙ্কেতিক কথা থাক, ব্যবসার কথায় আসুন।' ও বলল।

'সাঙ্কেতিক কথাবার্তা তো আমি শুরু করিনি।'

'কে শুরু করেছে তাতে কিছু যায় আসে না, আসলে মনে হচ্ছে শিল্পী-সত্তার আত্মহত্যা ঘটাবেন এটাই যেন মনস্থ করে ফেলেছেন আপনি।'

'প্রিয় হের্‌র ৎসোনেয়ারার, আমি আস্তে বললাম, 'আপনার মুখটা ফোনের একটু ওপাশে সরাতে কি আপনার অসুবিধা হবে—আপনার মুখের বীয়ারের গন্ধ সোজা আমার নাকে এসে লাগছে।'

ও রোটওয়েলস্* ঢঙে শাপশাপান্ত করে হাসল, 'আপনার স্বভাবের কোনও পরিবর্তন হবে না মনে হচ্ছে। কি কথা বলছিলাম যেন ?'

বললাম 'শিল্পের কথা, কিন্তু একটা অনুরোধ, আমরা বরং ব্যবসার দিকটা নিয়ে কথা বলি।'

ও বলল, 'তাহলে আমাদের কথা বলার বিশেষ কিছু থাকছে না ; শুনুন, আমি আপনার আশা ছাড়ছি না। বুঝতে পারছেন আমার কথা ?'

আমি এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে কিছু বলতে পারলাম না।

'আমরা আপনাকে ছ'মাস বসিয়ে রাখব, তারপর আবার আপনাকে ঠেলে তুলব। আশা করি বোখুমের ঐ কাদা-ছোঁড়া লোকটার ব্যাপার আপনাকে খুব বেশী বিগড়ে দিতে পারেনি।'

'হ্যাঁ একটু দিয়েছে বই কি, আমি বললাম, লোকটা আমাকে ঠকিয়েছে—এক বোতল মদ আর বন্-এর টিকিটে ফার্স্টক্লাশ আর সেকেণ্ড ক্লাশের ভাড়ার তফাৎটা।'

'পাওনা যা তার কমে রাজী হওয়া আপনার বোকামি হয়েছে। চুক্তি যা হয়েছে তাই দিতে হবে, আপনার কি দোষ, দুর্ঘটনার ফলে পারেন নি, ব্যাস।' আস্তে করে বললাম, ৎসোনেয়ারার, 'আপনি কি সত্যিই এত ভাল মানুষ, নাকি...'

'আরে দূর' ও বলল, 'আপনাকে আমার ভাল লাগে। এতদিনেও যদি তা লক্ষ্য না করে থাকেন তবে আমি বলব আমি যতটা ভাবতাম আপনি তার চেয়েও বেকুব, আর তাছাড়া ব্যবসার দিক থেকে দেখলে, আপনার ভেতর থেকে আরও কিছু বার করা যায়। আপনার ঐ ছেলেমানুষি মদ খাওয়া ছেড়ে দিন।'

---

* দক্ষিণ জার্মানীর একটা জায়গার নাম।

ও ঠিকই বলেছে, হেলেমান্যিই ওই বিষয়ে আসল শব্দ।
আমি বললাম, 'ওতে কিন্তু আমার উপকার হয়েছে।'
'কি উপকার ?' জিজ্ঞেস করল ও।
'মনের,' আমি বললাম।
ও বলল, 'বাজে কথা। মনকে এর মধ্যে টানবেন না। আমরা অবশ্য মাইন্‌ৎস-এর বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের মামলা আনতে পারি আর হয়ত জিতেও যাব, তবে তা না করার পরামর্শ দেব আমি। ছ' মাস বিশ্রাম করুন—তারপর আমি আবার আপনাকে ঠেলে তুলব।'
'এতদিন আমার চলবে কি করে ?' জিজ্ঞেস করলাম।
'আরে আপনার বাবার হাত দিয়ে সামান্য কিছু তো গলবে।
'আর যদি না গলে ?'
'তাহলে একটা ভাল দেখে বান্ধবী যোগাড় করে নিন, সে ততদিন চালিয়ে নেবে।'
বললাম, 'আমি বরং ঘুরে ঘুরে রোজগার করব, গ্রামে গ্রামে, ছোটখাট শহরে সাইকেল চেপে।'
'ভুল করছেন, গ্রামে কি ছোট শহরেও খবরের কাগজ পড়ে লোক আর এই মুহূর্তে বাচ্চাদের ক্লাবেও এক সন্ধ্যায় কুড়ি মার্কে আপনাকে বিকোতে পারব না।'
'চেষ্টা করেছেন ?' জিজ্ঞেস করলাম।
'হ্যাঁ', ও বলল, 'আপনার জন্য সারাদিন ফোন করেছি। কোন আশা নেই। একজন ক্লাউনের জন্যে মানুষ সহানুভূতি বোধ করলে তার চেয়ে হতাশার আর কিছু থাকে না। অনেকটা ওই হোটেল বয়-এর মত, সে এখন আপনাকে চাকা লাগানো চেয়ারে চেপে এসে বীয়ার দেবে। আপনি জেগে স্বপ্ন দেখছেন।'
জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি দেখছেন না ?' ও চুপ করে গেল, আমি বললাম, 'জানতে চাইছি, ছ'মাস বাদে আমি আবার একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি বলে যে কথা বললেন সেইটে ভেবে দেখেছেন কিনা।'
'হয়ত', ও জবাব দিল, 'কিন্তু ওটাই একমাত্র উপায়। এক বছর হলে আরো ভাল হতো।'
'এক বছর,' আমি বললাম, 'জানেন এক বছর কত লম্বা সময় ?'
'তিনশো প'য়ষট্টি দিন' ও বলল আর আবার ওর বীয়ার-খাওয়া মুখ আমার কথা না ভেবেই ফোনের সামনে ঘুরোল। ওর নিঃশ্বাসে বীয়ারের গন্ধ। আমার

গা ঘিন ঘিন করতে লাগল।

'যদি আমি অন্য একটা নামে চেষ্টা করি,' জিজ্ঞেস করলাম, 'অন্য একটা নাক লাগিয়ে অন্যরকম আর এক ক্যারিকেচার করি ; গীটার বাজিয়ে গান গাই আর একটু আধটু জাগলিং করি।'

'আরে দূর দূর!' ও বলল, 'আপনার গান শুনলেই কান্না পায় ; আর আপনার জাগলিংও তো স্রেফ আনাড়ির মত। ওসব বাদ দিন। আপনার ভেতরে আছে একটা চমৎকার ক্লাউন, তবে শুনুন, মাস তিনেক দিনে অন্তত আটঘণ্টা ট্রেনিং না নিয়ে কাউকে মুখ দেখাবেন না। তারপর আমি এসে দেখব আপনার নতুন ক্যারিকেচার—কিম্বা পুরোনো, কিন্তু ট্রেনিং নিন, আর ঐ হতভাগা মদ ছেড়ে দিন।'

আমি চুপ করে গেলাম। ওর লম্বা লম্বা শ্বাস ফেলার শব্দ কানে এল, শুনতে পেলাম ওর সিগারেট টানার শব্দও। 'আবার একটা ঐরকম বিশ্বস্ত কাউকে খুঁজে নিন'। ও বলল, 'ঐ মেয়েটার মত যে আপনার সঙ্গে ঘুরত।'

'বিশ্বস্ত হৃদয়?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ,' ও বলল, 'আর সবই বাজে। আর কখনই ভাববেন না যেন আমাকে বাদ দিয়েই আপনার চলবে। আর আজে বাজে জায়গায় ক্যারিকেচার দেখানো? হ্যাঁ সপ্তাহ তিন ভালই চলবে শ্নীয়ার। তা আপনি ফায়ার ব্রিগেডের জুবিলিতে ভাঁড়ামি করতে পারেন আর তারপর টুপি হাতে পাক খেয়ে আসতে পারেন। তবে যে মুহূর্তে আমি জানতে পারব, আপনার কাছ থেকে আমি ঝেড়ে আদায় করে নেব।'

'আপনি কুকুর', আমি বললাম।

'হ্যাঁ,' ও বলল, 'আমি সবচেয়ে ভাল কুকুর, এত ভাল কুকুর আপনি খুঁজে পাবেন না। আর আপনি যদি নিজে নিজেই রোজগারের চেষ্টা করেন তাহলে বড় জোর দু মাসের মধ্যে আপনার সম্পূর্ণ দফা-রফা। আমি এ লাইন চিনি। শুনছেন?'

'শুনছি', বললাম।

'আপনাকে আমার খুব পছন্দ, শ্নীয়ার,' ও বলল, 'আপনার সঙ্গে কাজ করে আনন্দ পেয়েছি—নইলে এত খরচা করে আপনাকে টেলিফোন করতাম না।'

'এ তো ছ'টার পরের টেলিফোন', আমি বললাম, 'কত আর উঠবে, এ তো মনে হয় দু' মার্ক পঞ্চাশ ফেনি।'

'হ্যাঁ', ও বলল, 'হয়ত বা তিন মার্ক', কিন্তু এ মুহূর্তে কোন এজেন্টই আপনার জন্য তা খরচ করবে না। তাহলে, তিন মাস বাদে, আর অন্তত ছ'টা নিখুঁত ক্যারিকেচার। আপনার বাবার কাছ থেকে যতটা পারেন বার করে নিন। ছেড়ে দিলাম।'

সত্যি সত্যিই ছেড়ে দিল। আমি ফোনটা আর কিছুক্ষণ হাতে রাখলাম, বিপ্ বিপ্ শব্দ শুনলাম। অপেক্ষা করলাম, অনেকক্ষণ বাদে রেখে দিলাম অনিচ্ছা সত্বেও। লোকটা আমাকে বেশ কয়েকবার ফাঁকি দিয়েছে, কিন্তু কখনও মিথ্যা বলেনি। এক সময়ে হয়ত আমি সন্ধ্যায় আড়াইশো মার্ক পেতে পারতাম, সেখানে ও আমাকে একশো আশী মার্কের চুক্তি বুঝিয়েছে—খুব সম্ভব আমার ওপর দিয়ে বেশ খানিকটা কামাই করে নিয়েছে। ফোনটা রেখে দেবার পর বুঝতে পারলাম, ওই প্রথম লোক যার সঙ্গে আরো অনেকক্ষণ টেলিফোন করতে আমার ভাল লাগত। ওর উচিত ছিল আমাকে ছয় মাস অপেক্ষা করার বদলে অন্য যে কোনও একটা সুযোগ দেয়া। হয়ত কোন একটা দল আমাকে কাজে লাগাতে পারে, আমি মোটা নই, মাথা ঘোরে না, আর একটু শিখিয়ে নিলে ভালই একটু-আধটু কসরত দেখাতে পারতাম আর কারও সঙ্গে, কিম্বা অন্য কোনও এক ক্লাউনের সঙ্গে স্কেচ্ দেখাতাম। মারী সব সময় বলত আমার দরকার একজন 'বিপরীত', তাহলে আর আমার শো করতে একঘেয়েমি আসত না। ৎসোনেয়ারার নিশ্চয়ই সবরকম চেষ্টা করে নি। ঠিক করলাম, পরে একবার ফোন করব। বাথরুমে ফিরে গেলাম, ড্রেসিংগাউনটা খুলে ফেললাম, আর সব যা পরনে ছিল টেনে ফেলে টবের মধ্যে ঢুকলাম। গরম জলে স্নান প্রায় ঘুমোনোর মত আরাম। যখন আমাদের অবস্থা খারাপ ছিল তখনও সব সময় হোটেলে বাথরুম-ওয়ালা ঘর নিতাম। মারী কেবলই বলত, আমার এই খরচ করার অভ্যাসের জন্য আমাদের পরিবার দায়ী। কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। বাড়িতে আর সব জিনিসের মত স্নানের গরম জলের ব্যাপারেও কিপ্‌টেমি ছিল। ঠাণ্ডা জলে স্নান করার অধিকার আমাদের সব সময় ছিল, কিন্তু গরমজলে স্নান আমাদের বাড়িতেও অপচয় বলে মনে করা হত। এমন কি আমাকেও, যে অন্য অনেক ব্যাপারে চোখ বুজে থাকত, এ ব্যাপারে রাজী করান যেত না। ওর আই আর ৯-এ বোধ হয় এক টব গরমজল সাংঘাতিক রকমের পাপ বলে গণ্য হত।

বাথটবের মধ্যেও মারীর অভাব বোধ করছিলাম। আমি টবে শুয়ে থাকতাম

আর ও আমাকে পড়ে শোনাত বিছানায় শুয়ে, একবার ওল্ড টেস্টামেণ্ট থেকে রাজা সলোমান আর সাবার রানীর কাহিনীটা পুরো পড়ে শুনিয়েছিল। অন্য একবার মাথাব্যারাব-এর বন্ধ, আর মাঝে-মধ্যে টোমাস হোলফে-এর দেশের দিকে তাকিয়ে দেখ দেবদূত। এখন আমি শুয়ে আছি, সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। এই অদ্ভুত পোড়া ইট রঙের বাথটবে, বাথরুমটা কালো টালি দিয়ে মোড়া, কিন্তু টব, সাবানদানী, শাওয়ার আর কমট পোড়া ইঁট রঙের। কেবল মারীর গলার স্বর-এর অভাব। ভাবলে মনে হচ্ছিল ও হস্যাফনার-কে বাইবেল শোনাতে গেলেও ওর নিজেকে মনে হবে বিশ্বাসঘাতিনী কিংবা বেশ্যা। ওর ড্যুসেলডর্ফ-এর সেই হোটেলের কথা নিশ্চয় মনে পড়বে। ওখানে ও আমাকে সালোমান আর সাবার রানীর কাহিনী পড়ে শুনিয়েছিল, আমি ক্লান্ত হয়ে এক সময়ে বাথরুমেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেই হোটেল ঘরের সবুজ কার্পেট, মারীর কালো চুল, ওর গলার স্বর, তারপর ও আমাকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট এনে দিয়েছিল, আমি ওকে চুমু খেয়েছিলাম।

আমি শুয়ে ছিলাম, সর্বাঙ্গ সাবানের ফেনায় ঢাকা, ওর কথা ভাবছিলাম। আমার কথা না ভেবে ও হস্যাফনার-এর সঙ্গে কিছুই করতে পারবে না। এমনকি ও হস্যাফনার-এর সামনে টুথপেস্টের ঢাকনাও লাগাতে পারবে না। কতবার আমরা একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করেছি, সামান্য কিম্বা রাজসিক, তাড়াহুড়োয় কিম্বা ধীরে সুস্থে, খুব ভোরে কিম্বা প্রায় দুপুর বেলায়, অনেক জেলী দিয়ে কিম্বা জেলী ছাড়া। হস্যাফনারের সাথে ও রোজ সকালে একই সময় ব্রেকফাস্ট করবে তারপর হস্যাফনার তার গাড়িতে চেপে তার ক্যাথলিক অফিসে যাবে ভেবে আমি মিইয়ে পড়ছিলাম। আমি প্রার্থনা করছিলাম, এমন যেন কখনও না হয়—হস্যাফনারের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট। হস্যাফনার-এর চেহারাটা ভাববার চেষ্টা করছিলাম, তামাটে চুল, সাদা চামড়া, সোজা, লম্বা, জার্মান ক্যাথলিসিজম-এর আলসিবিয়াডেজ* যেন, কেবল ততটা দায়িত্বহীন নয়। ও হচ্ছে কিংকেলের কথা মত 'মাঝখানে বটে, তবে বাঁয়ের চেয়ে ডানদিকে একটু বেশী ঝোঁক।' এই ডান-বাঁ-ব্যাপার ওদের আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু। সত্যি কথা বলতে কি আমার উচিত হস্যাফনারকে ওই চার জন সত্যিকার ক্যাথলিকের দলে ফেলা—পোপ যোহানেস, আলেক গিনিস, মারী, গ্রেগরী আর হস্যাফনার।

---

* খৃঃ পূঃ ৩৫০—৪০৪ সালে আলসিবিয়াডেজ আথেনাই-এর একজন রাজনীতিজ্ঞ ও সেনাধ্যক্ষ ছিলেন।

ও মারীকে যতই কেননা অলসথাক, ও যে ওকে পাপের জীবন থেকে উত্থার করে নিষ্পাপ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে—এই ব্যাপারটাই ওকে প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশী। মারীর সঙ্গে ওই হাত ধরাধরি ব্যাপারটা স্পষ্টতই তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না। পরে একবার আমি মারীর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছিলাম, ও লাল হয়ে উঠেছিল, তবে বেশ একটা মিষ্টি ভাব ছিল তার মধ্যে। আমাকে ও বলেছিল, ওই কথাতায় 'অনেক কিছু জড়িয়ে ছিল'। ওদের দু'জনকার দুই বাবাই নাৎসীদের হাতে বহুৎ লাঞ্ছনা ভোগ করেছিল আর ওদের দুজনের পেছনেই নাৎসীরা লেগেছিল, ক্যাথলিসিজম্, আর 'ওর চাল-চলন, জানইত, এখনও আমার ওকে ভাল লাগে।'

বাথটব থেকে ঠান্ডা হয়ে আসা জলের খানিকটা বার করে দিয়ে খানিকটা গরমজল মিশিয়ে নিলাম আর আরও খানিকটা স্নানের লোশন ঢেলে দিলাম। আমার বাবার কথা মনে পড়ল, এই লোশন-এর কোম্পানীতেও শেয়ার আছে। আমি সিগারেটই কিনি, কি সাবান, লেখার কাগজ, আইসক্রীম কিম্বা সসেজ, আমার বাবার তাতে শেয়ার আছে। আমার মনে হয়, আমি যে মাঝে মধ্যে আড়াই সেন্টিমিটার টুথপেস্ট ব্যবহার করি তাতেও বাবার শেয়ার আছে। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে কিন্তু আমাদের বাড়িতে কথা বলা চলবে না। আন্না যখন আমার মায়ের কাছে হিসাব দিত, ওর হিসাবের খাতা দেখাত, মা বলত সব সময়, 'অর্থ আলোচনা, কি বিশ্রী।' আমরা পকেট খরচের জন্য অত্যন্ত কম পেতাম। ভাগ্য ভাল যে আমাদের আত্মীয় স্বজন অনেক, সবাই একসঙ্গে উপস্থিত হলে মামা-কাকা-মাসি-পিসি মিলিয়ে পঞ্চাশ-ষাট জন হতো, আর তাদের মধ্যে কয়েকজন খুব ভাল, মাঝেমধ্যেই আমাদের পকেটে কিছু গুঁজে দিত কারণ আমার মায়ের কিপটে স্বভাবের কথা প্রায় প্রবাদের মত চালু ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, আমার মায়ের মা কাইজারের কাছ থেকে উপাধি পাওয়া ঘরের লোক, একজন ফন হোহেনব্রোডে, আর আমার বাবা আজ অবধি দয়া করে মেনে নেয়া জামাই তার। বাবার শ্বশুরের নাম টুল্যার, শাশুড়িই কেবল ছিল ফন হোহেনব্রোডে পরিবারের। আজকাল জার্মানরা ১৯৩০ সালের চেয়েও বেশী উপাধি-পাগল এবং উপাধি-বিশ্বাসী। এমন কি বুদ্ধিমান বলে বিবেচিত লোকেরাও তার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মায়ের সেন্ট্রাল কমিটিকে একবার এ ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে হবে। প্রশ্নটা শ্রেণী সংক্রান্ত। আমার খোদ ঠাকুর্দার মত একজন বিবেচক মানুষও ভুলতে পারে না

যে ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে শ্নীয়ারদের উপাধি পাওয়া উচিত ছিল, ওটা 'যাকে বলে' শেষ পর্যন্ত করা হয়ে গিয়েছিল, কাইজারের সই শুধু বাকি ঠিক সেই শেষ মুহূর্তে সে সব বানচাল করে দিলে—কাইজারের বোধহয় অন্য দুশ্চিন্তা ছিল—অবশ্য যদি তার কখনো কোন দুশ্চিন্তা থেকে থাকে। এখনো, এই প্রায় অর্ধ-শতাব্দী বাদেও শ্নীয়ারদের এই 'প্রায় পাওয়া' উপাধির গল্প সুযোগ পেলেই বলা হয়। 'মহামান্য কাইজারের ফাইলে সেই মানপত্র পাওয়া গেছে', বলে আমার বাবা সব সময়। অবাক লাগে, কেউ কেন ডোর্ণ-এ গিয়ে ওটা সই করিয়ে নেয়নি। আমি হলে একজন অশ্বারোহী দূত পাঠিয়ে দিতাম, তাহলে অন্তত এই ব্যাপারটার একটা প্রাপ্য পরিণতি ঘটত।

ভাবছিলাম, আমি বাথটবে শুয়ে পড়ার পর মারী কেমন তার জিনিসপত্র বার করত সুটকেশ থেকে। কেমন ভঙ্গিতে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতো, দস্তানা খুলত, চুল সমান করত; আলমারির ভেতর থেকে কেমন করে হ্যাঙার বার করত, তাতে পোশাক ঝোলাত, সেগুলো আবার আলমারিতে রাখত; তখন পেতলের রডের ওপর ওগুলো কিচ্ কিচ্ শব্দ করত। তারপর জুতো, হিলের হাল্কা শব্দ, সোলের খস্ খস্, আরও নানা টিউব, ছোট ছোট শিশি আর কৌটো টয়লেট টেবিলের ওপর রাখত। মনে পড়ে সেই বড় ক্রীমের কৌটো কিম্বা সরু নেইল পালিশের শিশি, পাউডার কৌটো আর লিপস্টিক খাড়া করে রাখার খট্ খট্ আওয়াজ।

হঠাৎ খেয়াল হল আমি বাথটবে শুয়ে কাঁদতে শুরু করেছি, আর অবাক হলাম এই দেখে যে আমার চোখের জল ঠাণ্ডা। এমনিতে সব সময় চোখের জল গরম লাগত, গত কয়েক মাসে আমি মাতাল অবস্থায় কয়েকবার গরম চোখের জল ফেলেছি। হেনরিয়েটের কথাও মনে হচ্ছিল, বাবার কথা, ক্যাথলিক হয়ে-যাওয়া লেয়োর কথা আর অবাক হচ্ছিলাম এই ভেবে যে ও এখনও ফোন করেনি।

১২

ওসনাব্রুক-এ ও আমাকে প্রথম বলেছিল, আমাকে নাকি ও ভয় করে। আমি বন্-এ যেতে চাচ্ছিলাম না আর ওর একান্তই সেখানে যাবার ইচ্ছা, 'ক্যাথলিক বাতাসে' দম নিতে। কথাটা আমার পছন্দ হয়নি, আমি বলেছিলাম, ওস্নাব্রুক-এও যথেষ্ট ক্যাথলিক আছে; কিন্তু ও বলেছিল, আমি ওকে বুঝতেই পারছি না আর কখনো ওকে বুঝতেও চাইনি। দুদিন হয়ে গিয়েছিল আমাদের ওসনাব্রুকে থাকা; দুটো এনগেজমেন্ট-এর মধ্যে, আমাদের হাতে আরও তিন দিন সময় ছিল। ভোর থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, কোনও হলে এমন একটা ছবি ছিল না যেখানে যাওয়া যায়, আর আমি তো কিছুতেই আর লুডো খেলতে বলব না। সকালেই তো মারী তাতে এমন একটা মুখ করেছিল যেন বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করা কিন্ডারগার্টেনের মাস্টারনী।

মারী বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল, আর আমি জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট হাতে হামবুর্গার স্ট্রাসের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কখনও কখনও স্টেশনের দিকে তাকাচ্ছিলাম। ওখানে স্টেশনের ভেতর থেকে লোকেরা বৃষ্টির মধ্যে ছুটে গিয়ে ট্রামে উঠছিল। 'ব্যাপারটা' করারও উপায় ছিল না। মারী অসুস্থ। ঠিক গর্ভপাত হয়নি ওর, তবে ঐ জাতীয় একটা কিছু। আমি ঠিক বুঝিনি, আর কেউ আমাকে বুঝিয়েও দেয়নি। যাই হোক ও ভেবেছিল, ও বুঝি অন্তঃসত্বা, এখন আর ও তা নয়, সকালে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য হাসপাতালে গিয়েছিল। দেখে মনে হয়েছিল ও কি রকম ফ্যাকাশে, ক্লান্ত আর খিটখিটে; আমি বলেছিলাম, এ অবস্থায় ট্রেনে যাওয়া ওর পক্ষে ঠিক হবে না। আমার একটু পরিষ্কার করে জানতে ইচ্ছা করছিল ওর যন্ত্রণা হচ্ছে কিনা, কিন্তু ও আমাকে কিছুই বলেনি, মাঝে মাঝে কাঁদছিল, কিন্তু কেমন যেন সম্পূর্ণ অচেনা ভাবে, বিরক্ত ভাবে।

আমি একটি বাচ্চা ছেলেকে রাস্তার বাঁদিক থেকে আসতে দেখছিলাম, সে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। একেবারে ভিজে গেছে। ঐ প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ও স্কুলের ব্যাগটা খুলে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছিল। ঢাকনাটা পেছন দিকে ঝুলিয়ে ব্যাগটা সামনে করে চলছিল, মুখে এমন একটা ভাব, যা আমি ছবিতে সেই পবিত্র তিন রাজার মুখে দেখেছি, শিশু যীশুর দিকে পবিত্র ধূপ, সোনা আর মীঢ় এগিয়ে ধরেছে। ভেজা জবজবে বইয়ের মলাটগুলোও আমি চিনতে পারছিলাম।

ছেলেটার মুখের ঐ ভাবে আমার হেনরিয়েটের কথা মনে পড়ছিল। রিক্ত, পরিত্যক্ত এবং সমর্পিত। বিছানা থেকে মারী জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবছ?' আমি বললাম, 'কিছু না।' আমি ছেলেটাকে স্টেশনের চত্বরের ওপর দিয়েও ধীরে ধীরে চলে যেতে দেখলাম, শেষে স্টেশনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। ওর জন্য আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, এই সমর্পিত পনেরো মিনিটের জন্য ওকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে পাঁচ মিনিট ধরে, মা চিৎকার করে পাড়া মাথায় করবে; বাবা দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠবে—বাড়িতে নতুন বই খাতা কেনবার পয়সা নেই। 'কি ভাবছ?' মারী আবারও জিজ্ঞেস করল। আমি আবারও বলতে যাচ্ছিলাম 'কিছু না', তখন মনে পড়ল ছেলেটার কথা, আমি ওকে বললাম আমি কি ভাবছিলাম; ওই ছেলেটা কীভাবে বাড়ি পৌঁছবে, কাছে পিঠের কোনও এক গ্রামে ওর বাড়ি। ও হয়ত মিথ্যা বলবে, কারণ ও সত্যি সত্যিই যা করেছে তা কেউ বিশ্বাস করবে না। ও হয়ত বলবে ও আছাড় খেয়েছিল আর ব্যাগটা ছিটকে গিয়ে জলের মধ্যে পড়েছে কিংবা ও একটু সময় ব্যাগটা হাতে করে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক এমটা জল বেরোবার নলের নিচে, হঠাৎ নলের ভিতর থেকে অনেকটা জল এসে পড়েছিল সোজা ব্যাগের মধ্যে। এইসব কথা আমি মারীকে বলছিলাম একঘেয়ে গলায়, আর ও বিছানায় শুয়ে বলেছিল, 'এ সবের অর্থ কি? এরকম একটা গাঁজাখুরি গল্প আমাকে বলছ কেন?'—'কারণ তুমি যখন আমাকে জিজ্ঞেস করছিলে, আমি কি ভাবছি, তখন আমি ওই সবই ভাবছিলাম।' ছেলেটার ওই কথা ও আদৌ বিশ্বাস করেনি, তাতে আমার খুব রাগ হল। আমরা নিজেদের মধ্যে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি বা কেউ মিথ্যা বলছে এমন অভিযোগ করিনি। আমার এত রাগ হয়ে গিয়েছিল যে, আমি ওকে উঠে জুতো পরতে বাধ্য করলাম, ওকে আমার সঙ্গে স্টেশন অবধি টেনে নিয়ে এলাম। তাড়াহুড়োয় আমি ছাতা নিতে ভুলে গেয়েছিলাম, আমরা ভিজে গিয়েছিলাম আর ছেলেটাকেও খুঁজে পাইনি। আমরা ওয়েটিং হলে খুঁজেছি, এমনকি স্টেশনের রাত কাটাবার জায়গাটাও দেখেছি, শেষমেস আমি গেটের টিকিট কালেকটারকে জিজ্ঞাসা করেছি, একটু আগে কোনও ট্রেন ছেড়ে গেছে কিনা? লোকটা বললে, 'হ্যাঁ, বোমটের গাড়ি দু'মিনিট আগে ছেড়ে গেল।' আমি জানতে চাইলাম, একটা ছেলে গেট দিয়ে গেছে কি না, সপসপে ভেজা জামা। সোনালী চুল, এই রকম লম্বা। লোকটার সন্দেহ হল, জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার? কিছু করেছে নাকি?'—'না', আমি বললাম, 'আমি শুধু জানতে

চাই, ও ওই ট্রেনে গেছে কিনা।' আমরা দুজনেই ভিজে গিয়েছিলাম, মারী আর আমি, আর লোকটা সন্দেহের চোখে আমাদের মাথা থেকে পা অবধি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। 'আপনারা কি রাইন এলাকার?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। কথাটা শুনে মনে হল যেন আমাকে জিজ্ঞেস করছে, আমি আগে জেল খেটেছি কিনা। 'হ্যাঁ', বললাম। 'এ জাতীয় খবর আমি একমাত্র উপরওয়ালার অনুরোধে দিতে পারি,' জবাব দিল লোকটা। লোকটা নিশ্চয় কোনও রাইন এলাকার লোকের সঙ্গে ঝামেলায় পড়েছিল, খুব সম্ভব মিলিটারীতে। আমি একজন স্টেজের কর্মীকে চিনতাম, লোকটা মিলিটারীতে থাকবার সময় একজন বার্লিনের লোক ওকে ঠকিয়েছিল, সেই থেকে প্রত্যেক বার্লিনের লোকের সঙ্গে ও ব্যক্তিগত শত্রুর মত ব্যবহার করত। একবার যখন বার্লিনের একটা মেয়ে-জিমনাস্ট স্টেজে কসরৎ দেখাচ্ছে, লোকটা হঠাৎ আলো নিভিয়ে দিয়েছিল, মেয়েটা পড়ে গিয়ে পা ভাঙল। ঘটনাটা কেউ তলিয়ে দেখেনি, 'ফিউজ কেটে গেছে' বলে প্রচার করা হয়। কিন্তু আমি ঠিক জানি, ঐ লোকটা আলো নিভিয়ে দিয়েছিল, কারণ মেয়েটা বার্লিনের আর লোকটা মিলিটারীতে থাকবার সময় একজন বার্লিনের লোক ওকে ঠকিয়েছিল। ওস্না-ব্রুকের স্টেশনে রেলের ওই লোকটা আমার মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যে আমার বুক কাঁপতে শুরু করে দিয়েছিল। 'এই মহিলার সঙ্গে আমি বাজি ধরেছি', বললাম, 'একটা বাজির ব্যাপার।' ওটাই ভুল হয়েছিল, ওটা মিথ্যা কথা, আর আমি মিথ্যা বললে যে কেউ আমার মুখ দেখে বলে দিতে পারে। 'আচ্ছা,' বললে লোকটা, 'বাজি ধরেছেন। রাইন-এর লোক যদি একবার বাজি ধরতে শুরু করে।' কিছুই করা গেল না। একবার ভাবলাম, ট্যাক্সি নিয়ে বোখুমে অবধি যাই, সেখানে স্টেশনে ট্রেনটার জন্য অপেক্ষা করি, দেখি ছেলেটা নামে কিনা। কিন্তু ও-তো অন্য যে কোন পাড়াগাঁয়েও নেমে পড়তে পারে। হোটেলে যখন পৌঁছলাম তখন আমরা ভিজে কাদা, খুব শীত করছিল। মারীকে ঠেলে নিচের বারে নিয়ে গেলাম, সেখানে দাঁড়ালাম গিয়ে বারম্যানের ওখানে, মারীর কোমর জড়িয়ে একটা হাত রেখে ব্র্যান্ডির অর্ডার করলাম। বারম্যানটিই ওখানকার মালিক, আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল, যেন ওর খুব ইচ্ছা করছিল পুলিশে ফোন করে। আমরা তার আগের দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা লুডো খেলেছি, হ্যামরুটি আর চা ঘরে আনিয়ে খেয়েছি, সকালে মারী হাসপাতালে গিয়েছিল, ফ্যাকাশে সাদা অবস্থায় ফিরেছে। লোকটা আমাদের ব্র্যান্ডি এমনভাবে দিল

যে আনন্দেকটা উপচেই পড়ে গেল। সে তাকিয়েছিল আমাদের উপেক্ষা করে, আমাদের পেছনে। 'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?' জিজ্ঞেস করলাম মারীকে, 'আমি ওই ছেলেটার কথা বলছি।' 'হ্যাঁ,' ও বলল, 'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি।' ও বলেছিল স্রেফ দয়া করে, আমার কথা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে নয়। আমি রেগেছিলাম, লোকটাকে চলকে ফেলা ব্র্যাণ্ডির জন্য কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না বলে। আমাদের কাছে দাঁড়িয়েছিল একটা মোটাসোটা লোক, লোকটা বেশ শব্দ করে বীয়ার খাচ্ছিল। প্রত্যেক চুমুকের পর লোকটা ঠোঁটের ফেনা চেটে নিচ্ছিল, আমার দিকে তাকাচ্ছিল যেন যে-কোন মুহূর্তে আমার সঙ্গে যেচে কথা বলবে। একটা বিশেষ বয়েসের আধা মাতাল জার্মান আমার সঙ্গে যেচে কথা বলতে আসছে দেখলে আমার ভয় হয়, ওরা সব সময় যুদ্ধের কথা বলে, বলে চমৎকার সময় গেছে, আর ওরা পুরো মাতাল হলে বেরিয়ে পড়ে যেন ওরা এক-একটা খুনে। ওদের কাছে ব্যাপারটা আসলে 'ততটা খারাপ নয়'। মারী শীতে কাঁপছিল, ব্র্যাণ্ডির গ্লাস দুটো যখন আমি নিকেলের বেঞ্চের ওপর বারম্যানের দিকে ঠেলে দিলাম, তখন ও আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। লোকটা এবার সাবধানে গ্লাস দুটো আবার এগিয়ে দিল একটুও না ফেলে, তা দেখে আমি নিশ্চিত হলাম। লোকটা আমাকে নিজেকে ভীরু ভাববার হাত থেকে রেহাই দিয়েছে। পাশের লোকটা একটা স্বচ্ছ মদ ঢক করে গিলে ফেলে আপন মনে কথা বলতে শুরু করেছিল। 'চুয়াল্লিশ সালে,' লোকটা বলেছিল, 'আমরা স্বচ্ছ মদ আর ব্র্যাণ্ডি বালতি বালতি খেয়েছি—চুয়াল্লিশ সালে বালতি বালতি—বাড়তিটা রাস্তায় ঢেলে দিয়েছি···জারজগুলোর জন্য এক ফোঁটাও রাখিনি।' লোকটা হাসছিল। 'এক ফোঁটাও না।' আমি আমাদের গ্লাস দুটো আবার বারম্যানের দিকে এগিয়ে দিলে লোকটা গ্লাস ভর্তি করে অন্যটায় ঢালবার আগে আমার দিকে প্রশ্নভরা চোখে তাকাল, তখন আমার খেয়াল হল, মারী চলে গেছে। আমি মাথা নাড়লাম, লোকটা দ্বিতীয় গ্লাসটাও ভরে দিল। দুটোই খেয়ে নিলাম। আমি আজও আশ্চর্যবোধ করছি যে, তারপরও আমি হেঁটে যেতে পেরেছিলাম। মারী ওপরে বিছানায় শুয়ে কাঁদছিল, আমি ওর কপালে হাত রাখতে ও হাতটা সরিয়ে দিল আস্তে, সাবধানে, কিন্তু সরিয়ে দিয়েছিল। ওর পাশে বসে ওর হাত নিলাম আমার হাতের মধ্যে, ও হাত সরিয়ে নেয়নি। আমার আনন্দ হচ্ছিল। বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। আমি ওর পাশে

একঘণ্টা বসেছিলাম। কথা বলতে শুরু করবার আগে আমি ওর হাত ধরেছিলাম। আমি আস্তে আস্তে কথা বলছিলাম, সেই ছেলেটার কথা বলছিলাম আবার, আর ও আমার হাতে চাপ দিচ্ছিল, যেন বলতে চায়, হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করছি তোমার কথা, হ্যাঁ। আমি ওকে অনুরোধও করেছিলাম, আমাকে ঠিক করে বলতে, হাসপাতালে ওরা কি করেছে, ও বলেছিল, ওটা একটা 'মেয়েদের ব্যাপার, তেমন কিছু না, তবে যাচ্ছেতাই।' মেয়েদের ব্যাপার কথাটায় আমার ভেতর আতঙ্কে শিরশির করে উঠল। ওটা আমার কাছে বিশ্রী রকমের গোপন মনে হয়। কারণ ওসব আমি একদম বুঝি না। মারীর সঙ্গে একসঙ্গে তিন বছর থাকবার পর আমি প্রথম এই 'মেয়েদের ব্যাপার' জিনিসটা শুনি। মেয়েদের বাচ্চা কি করে হয় তা তো আমি জানতাম, তবে সঠিক কি হয় জানতাম না। আমার তখন চব্বিশ বছর বয়স আর মারী তিন বছর হয়ে গেছে আমার স্ত্রী, তখন প্রথম আমি ও ব্যাপারে জানি। আমি কতটা অজ্ঞান জানতে পেরে সেবার মারী হেসেছিল। ও আমার মাথাটা ওর বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বারে বারেই বলছিল, 'তুমি ভাল, সত্যিই ভাল।' দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে আমাকে ও সম্বন্ধে বলেছিল সে হচ্ছে কার্ল এমণ্ডস, আমার স্কুলের বন্ধু, ও সব সময় ঐ জঘন্য 'মেয়েলি ব্যাপার' ঘেঁষে চলে।

পরে আমি গিয়ে ওষুধের দোকান থেকে ঘুমের ওষুধ এনে দিয়েছিলাম মারীকে, আর ও ঘুমিয়ে না-পড়া পর্যন্ত ওর বিছানায় বসেছিলাম। আমি আজও জানি না ওর কি হয়েছিল আর ওই 'মেয়েটা' ওকে কি কি অসুবিধায় ফেলেছিল। পরদিন সকালে লাইব্রেরীতে গিয়ে এনসাইক্লোপেডিয়া খুলে ওর ওপর যা যা লেখা আছে পড়েছিলাম, পড়ে শান্তি পেয়েছিলাম। দুপুরের দিকে মারী একা বন্-এ চলে গেল। শুধু একটা ব্যাগ নিয়ে। ও একবারও বলেনি, আমি সঙ্গে যেতে পারি। ও বলেছিল, 'তাহলে পরশু আবার দেখা হচ্ছে ফ্রাঙ্কফুর্টে।' বিকেলের দিকে যখন পুলিশ এল, তখন আমি আরাম বোধ করছিলাম এই ভেবে যে, মারী চলে গেছে। যদিও ওর চলে যাওয়াটা আমাকে খুবই বিব্রত অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল। মনে হয় হোটেলের মালিক পুলিশে খবর দিয়েছিল আমাদের নামে। আমি অবশ্য সব সময় আমার স্ত্রী বলে মারীর পরিচয় দিতাম, আর মাত্র দুবার কি তিনবার সেজন্য অসুবিধায় পড়েছি। ওসনাব্রুক-এ অবস্থাটা বিশ্রী দাঁড়িয়েছিল। একজন মহিলা এবং একজন পুরুষ, দুজন অফিসার এসেছিল সাদা পোশাকে, খুব বিনয়ী, বেশ দায়িত্ব সচেতন, ওটা বোধহয় ওদের 'স্বচ্ছন্দ

এনে হবে' বলে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের কতকগুলো বিনয়ের রকম আমার বিশেষ অস্বস্তিকর মনে হয়। মহিলা অফিসারটি সুন্দরী, রুচিসম্মত সাজগোজ, আমি বসতে বলার পর বসেছিল, একটা সিগারেটও নিয়েছিল, আর তার সঙ্গী 'নজরে না পড়ে এইভাবে,' ঘরটা খুঁটিয়ে দেখছিল। 'ব্রয়লাইন ডেয়ারকুম আপনার এখানে নেই?' 'না', আমি বলেছিলাম, 'ও আগেই চলে গেছে, ফ্রাঙ্কফুর্টে দেখা হবে ওর সঙ্গে, পরশু।' 'আপনি কি জিমনাস্ট?' আমি বলেছিলাম, 'হ্যাঁ,' যদিও ওটা ঠিক নয়, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, হ্যাঁ বলাই সুবিধাজনক। 'আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন', বলেছিল মহিলাটি, 'কতকগুলো রুটিনমাফিক কাজ আমাদের করতে হয়। 'দুদিনের জন্য এসে কেউ যদি এ্যাবোরটিভ'—মহিলাটি একটু কেসে নিল 'অসুখে-বিসুখে পড়ে।' 'সবই বুঝতে পারছি।' বলেছিলাম, 'আমি এনসাইক্লোপেডিয়াতে এ্যাবোরটিভ সম্বন্ধে কিছু পাইনি।' পুরুষ অফিসারটিকে বসতে বললে সে তা বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল, কিন্তু নজরে না পড়ে এইভাবে চারদিক দেখছিল। 'আপনাদের বাড়ির' —জানতে চেয়েছিল মহিলাটি। আমি আমাদের বন্-এর ঠিকানা দিয়েছিলাম। মহিলাটি উঠে দাঁড়াল। পুরুষ অফিসার খোলা আলমারীর দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'ব্রয়লাইন ডেয়ারকুম-এর পোশাক?' 'হ্যাঁ,' আমি জবাব দিলাম। লোকটা তার সঙ্গীর দিকে তাকাল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। মহিলাটি কাঁধ নাড়ল, লোকটাও, আর একবার কার্পেটটা দেখল খুঁটিয়ে, একটা দাগের ওপর ঝুঁকে পড়ল, আমার দিকে তাকাল, যেন আশা করছে যে আমি এবার খুনের কথা স্বীকার করব। তারপর ওরা চলে গেল। ওরা এই অভিনয়ের শেষ পর্যন্ত খুব ভদ্র ব্যবহার করেছে। ওরা যেতেই আমি সুটকেশগুলো সব বোঝাই করলাম, হোটেলের বিল পাঠাতে বললাম, স্টেশন থেকে একজন কুলি ডাকিয়ে এনে পরের ট্রেনেই রওনা হয়ে পড়লাম। হোটেলওয়ালাকে আদ্দেক দিনের জন্য পুরো ভাড়াও দিয়েছিলাম। মালপত্র ফ্রাঙ্কফুর্ট রওনা করে দিয়ে দক্ষিণমুখী যে ট্রেনটা পেলাম তাতে রওনা হলাম। আমার ভয় হচ্ছিল, বুঝি পালাতে চাইছি। সুটকেশ বোঝাই করবার সময় মারীর একটা তোয়ালেতে আমি রক্তের দাগ দেখেছি। ফ্রাঙ্কফুর্টের ট্রেনে চেপে বসবার আগে প্ল্যাটফরম-এর ওপর তখনও আমার ভয় করছিল, এই বুঝি একটা হাত হঠাৎ এসে আমার কাঁধ ধরবে আর কেউ আমাকে খুব বিনীতভাবে পেছন থেকে প্রশ্ন করবে, 'স্বীকার করছেন?' আমি সব স্বীকার করতাম। আমি যখন বন্-এর ওপর দিয়ে

যাচ্ছি তখন মাঝরাত্রি পার হয়ে গেছে। আমি আদৌ ভাবিনি নামবার কথা।

আমি সোজা ফ্রাঙ্কফুর্ট অবধি গিয়েছিলাম, চারটে নাগাদ সেখানে পেঁছে, একটা অত্যন্ত দামী হোটেলে উঠেছিলাম; সেখান থেকে বন্-এ মারীকে ফোন করেছিলাম। ভয় হচ্ছিল, হয়ত বাড়িতেই নেই, কিন্তু ও তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করেছিল, বলেছিল, 'হান্সঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তুমি ফোন করলে, আমার এমন দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।' বললাম, 'দুশ্চিন্তা?' ও বললে, 'হ্যাঁ, আমি ওসনাব্রুক-এ ফোন করেছিলাম, ওরা বলল, তুমি চলে গেছ। আমি এক্ষুনি ফ্রাঙ্কফুর্ট আসছি—এক্ষুনি।' আমি স্নান করলাম, ব্রেকফাস্ট ঘরে পাঠাতে বললাম, ঘুমোলাম, মারী এসে এগারটার সময় আমাকে জাগাল। ও যেন একদম বদলে গেছে, কি মিষ্টি, আর প্রায় উজ্জ্বল। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, 'ক্যাথলিক হাওয়ায় যথেষ্ট দম নিয়েছ তো?' ও হেসে আমাকে চুমু খেল। আমি ওকে পুলিশের কথা কিছুই বললাম না।

ভাবছিলাম আর একবার স্নানের জল পাল্টে নেব কিনা। কিন্তু গরম জল ফুরিয়ে গিয়েছিল, বুঝতে পারছিলাম, এবার উঠতে হবে। স্নানের ফলে আমার হাঁটুর কোনও উপকার হয়নি। আবার ফুলে উঠেছে, আর বেশ আড়ষ্টও লাগছিল। বাথটব থেকে উঠতে গিয়ে সুন্দর কালো টালী-মোড়া মেঝের ওপর পা পিছলে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। আমি তক্ষুনি যাচ্ছিলামৎসোনেয়ারারকে ফোন করে বলতে, আমাকে কোন সার্কাস দলের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দাও। গা মুছে, একটা সিগারেট ধরিয়ে আয়নায় দেখছিলাম নিজেকে, রোগা হয়ে গেছি। টেলিফোন বেজে উঠতে মনে হয়েছিল মুহূর্তের জন্য বোধহয় মারী। কিন্তু মারীর ফোনের শব্দ এ রকম হয় না। হয়ত লেয়ো। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বসবার ঘরে গেলাম, টেলিফোনটা তুলে বললাম, 'হ্যালো।'

'ও', সমারভিল্ড-এর স্বর, 'আশা করি আপনার ডবল সমারসল্ট-এ ব্যাঘাত

ঘটাইনি।' রেগে বললাম, 'আমি সার্কাসের খেলা দেখাই না, আমি একজন ক্লাউন—তফাৎটা জেস্যুইট আর ডোমিনিকানদের মধ্যে যতটা, অন্তত পক্ষে ততটা —আর এখন যদি ডবল একটা কিছু ঘটে তবে তা হবে ডবল খুন।'

লোকটা হাসছিল। 'শ্নীয়ার, শ্নীয়ার,' সে ডাকল, 'আপনার জন্য আমার সত্যিই চিন্তা হচ্ছে। আপনি বন্-এ এসেছেন বুঝি টেলিফোন মারফৎ সবার সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্ক ঘোষণা করতে ?'

বললাম, 'আমি আপনাকে ফোন করেছি, না আপনি আমাকে ?'

'আঃ', ও বলল, 'সেটাই কি সবচেয়ে বড় কথা ?'

আমি জবাব দিলাম না। ও বলে চলল, 'আমি বেশ জানি, আপনি আমাকে পছন্দ করেন না। কিন্তু আপনি শুনে অবাক হবেন, আমি আপনাকে পছন্দ করি, আর আপনি নিশ্চয় মানবেন, বিশেষ কিছু নিয়মকানুন আছে, যেগুলো আমি বিশ্বাস করি এবং যেগুলোর প্রচার আমার কাজ। সেগুলো কার্যকরী করতে হয় আমাকে।'

'দরকার হলে গায়ের জোরেও।' আমি যোগ দিলাম।

'না,' ও বলল, স্বরটা পরিষ্কার, 'না, গায়ের জোরে নয়, তবে উৎসাহ দিয়ে, এই যেমন, যার প্রসঙ্গে একথা উঠছে, সে মানুষটি যেমন আশা করতে পারে।'

'আপনি মারী না বলে মানুষটি বলছেন কেন ?'

'কারণ আমি চাই ব্যাপারটা যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে দেখতে।'

'সেটা আপনার মস্ত ভুল, প্রেলাট,' আমি বললাম, 'ব্যাপারটা যতটা প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব ততটা প্রত্যক্ষ।' ড্রেসিং-গাউন গায়ে আমার শীত করছিল, সিগারেটটা ভিজে গেছে, ভাল জ্বলছিল না। 'শুধু আপনাকেই না, আমি৺ৎসুফ্‌নারকেও খুন করব যদি মারী ফিরে না আসে।'

'আঃ ঈশ্বর,' ওর স্বরে বিরক্তি, 'হেরিব্যার্টকে এর মধ্যে টানবেন না।'

'বেশ মজার কথা বলেছেন ত', বললাম, 'যে কেউ একজন আমার স্ত্রীকে নিয়ে চলে যাবে, আর বিশেষ করে সেই লোকটাকে আমি টানব না ?'

'সে যে কেউ একজন নয় এবং ফ্রয়লাইন ডেয়ারকুমও আপনার স্ত্রী ছিল না—আর সে নিয়ে যায়নি, মারী নিজেই গেছে।'

'সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, তাই না ?'

'হ্যাঁ' ও বলল, 'সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়। যদিও খুব সম্ভব প্রকৃতি আর অতিপ্রকৃতির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে।'

'আহা' আমি বললাম, 'এখানে আবার অতিপ্রকৃতিটা কোথায় ?'

'শ্রীয়ার,' বিরক্তভাবে বলল ও। 'সব সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি, আপনি একজন ভাল ক্লাউন—কিন্তু থিয়োলজীর আপনি কিছুই বোঝেন না।'

'এতটা কিন্তু ঠিকই বুঝি।' আমি বললাম 'আপনারা ক্যাথলিকরা অবিশ্বাসীদের বেলা, আমার কথাই ধরুন, এমন কঠোর যেমন ইহুদীরা খ্রীস্টানদের বেলা আর খ্রীস্টানরা জেন্টাইলদের বেলা। আমি কেবলই শুনি নিয়ম থিয়োলজী—আর ঐ সবই আসলে একটা চোথা কাগজের জন্য, যা দরকার—মনে রাখবেন সরকার দেবে।'

'আপনি প্রসঙ্গ আর কারণে গুলিয়ে ফেলছেন।' ও বলল, 'আমি বুঝতে পারছি আপনার কথা শ্রীয়ার, আমি বুঝতে পারছি।'

'আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না,' আমি বললাম, 'আর তার ফলে দুটো দাম্পত্য জীবন নষ্ট হবে। প্রথমটা, মারী যা করছে হেরীব্যার্টকে বিয়ে করে, আর দ্বিতীয়টা, ও যা আবার করবে, একদিন আমার সঙ্গে নতুন করে। আমি জানি আমি যথেষ্ট কোমল-প্রাণ নই, নই এমন কি যথেষ্ট শিল্পীজনোচিতও। বিশেষ করে আমি যথেষ্ট খ্রীস্টানও নই, যাতে করে একজন প্রেলাট আমাকে বলতে পারে, শ্রীয়ার, ওটা পতিতালয়ে রেখে এলেই পারতেন।'

'আপনার ব্যাপার এবং যা নিয়ে সেবার আমাদের তর্ক হয়েছিল সেই ব্যাপার, এ দুটোর মধ্যে যে একটা মূল থিয়োলজীক্যাল তফাৎ আছে, সেটা আপনি বুঝতে চাচ্ছেন না।'

'কোন তফাৎ ?' জিজ্ঞাসা করলাম, 'মনে হচ্ছে আপনি বলতে চাইছেন, 'বেসেভিৎস বেশী কোমল প্রাণ আর আপনাদের গোষ্ঠীর এক প্রয়োজনীয় বিশ্বাসের ইঞ্জিন, তাই কি ?'

'না', লোকটা সত্যি সত্যি হেসে উঠল। 'না, তফাৎটা গীর্জার অধিকার সম্বন্ধে। বেসেভিৎস একজন ডিভোর্সড মহিলার সঙ্গে থাকত, তাদের বিয়ে হওয়া সম্ভব ছিল না। আর আপনি—ফ্রয়লাইন ডেরারকুম ডিভোর্সড ছিল না, আর বিয়ের কোনও বাধাও ছিল না।'

'আমি ত সই করতে রাজী ছিলাম', 'বললাম, 'চাই কি ক্যাথলিক হতেও আপত্তি ছিল না।'

'হ্যাঁ', রাজী ছিলেন তবে বীতশ্রদ্ধভাবে।'

'যে বিশ্বাসে আমার কোন আস্থা নেই, তার ভান করতে হবে নাকি আমাকে ?'

আপনি তো অধিকার আর নিয়মের কথা খুব বলেন—বলেন সবই নিয়মরক্ষা—তো আপনি কেন আমার ভেতর যে অনুভূতি নেই তার জন্যে আমার ওপর দোষারোপ করছেন ?'

আমি চুপ করে গেলাম। লোকটা ঠিকই বলেছে, স্বীকৃতিটা বাজে। মারী চলে গেছে আর ওরা স্বভাবতই মহানন্দে তাকে লুফে নিয়েছে। কিন্তু ও যদি আমার কাছে থাকতে চাইত, কেউ ওকে যেতে বাধ্য করতে পারত না।

'হ্যালো শ্নীয়ার', সমারউইল্ড বলল, 'শুনছেন ?'

'হ্যাঁ,' বললাম, 'শুনছি।' ওর সঙ্গে টেলিফোন করা সম্বন্ধে আমার অন্য রকম ইচ্ছা ছিল। শেষ রাত্রি আড়াইটের সময় ওকে বিছানা থেকে তুলে গালি-গালাজ করা আর ভয় দেখানোর ইচ্ছা ছিল।

'আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন ?' আস্তে করে জিজ্ঞেস করল সে।

'কিছু না,' বললাম, 'যদি আপনি বলেন যে হ্যানোভার-এর হোটেলে গোপন বৈঠকগুলোর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আমার প্রতি মারীর বিশ্বস্ততা বাড়ানো, তাও বিশ্বাস করব।'

'কোনও সন্দেহ নেই শ্নীয়ার,' সে বলল, 'আপনি বুঝতে চাচ্ছেন না যে আপনার আর ক্রয়লাইন ডেয়ারকুম-এর মধ্যে সম্পর্কটা খারাপ হয়ে উঠেছিল।'

বললাম, 'আর অমনি ওকে নিয়ম আর ধর্মের ফাঁকগুলো দেখিয়ে দিতে ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে আপনাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হল। আমার কিন্তু ধারণা ছিল ক্যাথলিক গীর্জা চিরকাল বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে।'

'কি মুস্কিল, শ্নীয়ার,' চিৎকার করে উঠল সে। 'আমি একজন ক্যাথলিক পাদ্রী, আমার কাছে তা বলে আপনি তো আশা করতে পারেন না যে, আমি একজন মহিলাকে বেশ্যাবৃত্তি চালিয়ে যেতে উৎসাহ দেব।'

'কেন নয় ?' জবাব দিলাম, 'আপনারা তো ওকে পাপ আর বিচ্ছিন্ন জীবনে টেনে নামিয়েছেন। পাদ্রী হয়ে সে দায়িত্ব যদি নিতে পারেন, তো চালিয়ে যান।'

'আপনার গীর্জা-বিরোধী মনোভাব আমাকে অবাক করছে। ওটা কেবল ক্যাথলিকদের মধ্যেই দেখেছি।'

'আমি গীর্জা-বিরোধী নই, সে রকম ভাববেন না। আমি কেবল সমারউইল্ড বিরোধী, কারণ আপনি অন্যায় করেছেন, আপনি দুরকম কথা বলেন।'

'হায় ঈশ্বর,' সে বলল, 'কেমন করে ?'

'আপনার বক্তৃতা শুনলে মনে হয়, আপনার দিলটা বুঝি জাহাজের পালের মত বিশাল, কিন্তু তারপর আপনি হোটেলে গুজগুজ ফিসফিস করে বেড়ান। ওদিকে আমি যখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলছি অন্ন সংস্থানের জন্য, তখন আপনি আমার স্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক বসাচ্ছেন, অথচ আমার দিককার কথা একবারও শুনতে চাননি। আপনি অন্যায়কারী এবং দু' মুখো মানুষ—অন্য রকম কী বিশেষণ আপনি একজন শিল্পীর কাছ থেকে আশা করতে পারেন?'

'বলে যান,' বলল সে, 'গালি দিন, দুর্নাম দিন, আপনার অবস্থা এত ভাল বুঝেছি যে ওতে আমি কিছু মনে করছি না।'

'কিন্তু একটা জিনিস বোঝেন কি, যে, আপনি মারীকে একটা জঘন্য ভেজাল জিনিস গিলতে বাধ্য করেছেন। অন্য পক্ষে আমি নির্ভেজাল জিনিস পছন্দ করি; নির্ভেজাল চোলাই মদ আমার কাছে ভেজাল ব্র্যাণ্ডির চেয়ে ভাল।'

'বলুন বলুন,' সে জবাব দিল। 'বলে যান—শুনে বেশ বোঝা যাচ্ছে অন্তর থেকে বলছেন।'

'আমি জড়িয়ে গেছি প্রেলাট, দেহে মনেই জড়িয়ে গেছি, কারণ ব্যাপারটা মারীকে নিয়ে।'

'তা একটা সময় আসবে যখন আপনি বুঝতে পারবেন, এ ব্যাপারে এবং সব ব্যাপারেই আপনি আমার প্রতি অবিচার করেছেন, শ্রীয়ার।' ওর স্বর প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল।

'আমার ভেজালের কথা বলছিলেন, বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন, অনেকেরই বেজায় পিপাসা আছে, স্রেফ পিপাসা, আর তাদের কাছে আদৌ কিছু না থাকার চাইতে ভেজাল জিনিস বরং ভাল।'

'কিন্তু আপনাদের পবিত্র পুস্তকে তো রয়েছে নির্ভেজাল স্বচ্ছ জলের কথা—তা দেন না কেন?'

গলা কাঁপছিল ওর, বলল, 'আছে ঠিকই, তবে আপনার উপমার সঙ্গে তাল রেখেই বলছি—আমি সেই ইঁদারার পাশে জলের লাইনের বোধহয় শততম বা সহস্রতম ব্যক্তি। এত পরে জলও আর তেমন টাটকা থাকবে না—আর একটা কথা, শ্রীয়ার, শুনছেন?'

বললাম, 'শুনছি, বলুন।'

'একসঙ্গে না থেকেও আপনি একজন মহিলাকে ভালবাসতে পারেন।'

'আচ্ছা', বললাম আমি। 'মালুম হচ্ছে এবার বোধহয় ভার্জিন মেরী নিয়ে

শ্বর্ করবেন।'

'ঠাট্টা করবেন না, শ্লীয়ার', বলল সে, 'ঠাট্টা আপনাকে মানায় না।'

'আমি মোটেও ঠাট্টা করছি না,' বললাম আমি, 'আমি যা ব্ঝি না তাকে সম্মান দিতে আমি সব সময় তৈরি। সে মনোদ আমার আছে। একটি কচি মেয়ে, যে কনভেন্ট-এ যেতে চায় না, তার সামনে ভার্জিন মেরীকে আদর্শ বলে দাঁড় করানোটা আমার কাছে অত্যন্ত ভুল বলে মনে হয়। আমি তো একবার এ প্রসঙ্গে বক্তৃতাও দিয়েছি।'

'তাই নাকি—কোথায় ?' জিজ্ঞেস করল সে।

বললাম, 'ঠিক এইখানে এই বন-এ, মারী ও ওর বয়সী একদল কচি মেয়ের সামনে। ওদের এক সন্ধ্যার আসরে যোগ দিতে আমি কোলন থেকে এখানে এসেছিলাম, মেয়েদের কয়েকটা ক্যারিকেচার দেখিয়েছিলাম, আর ভার্জিন মেরীকে নিয়ে গল্প করেছিলাম। মনিকা সিল্‌ভস্‌কে জিজ্ঞেস করবেন, প্রেলাট। আমি অবশ্যই ওদের সঙ্গে, আপনারা যাকে রক্তমাংসের আকর্ষণ বলেন, তা নিয়ে গল্প করতে পারিনি! শ্বনছেন ?'

সে জবাব দিল, 'শ্বনছি আর অবাক হচ্ছি। আপনি সত্যিই বেপরোয়া হয়ে উঠছেন, শ্নীয়ার।'

'কি মুস্কিল, প্রেলাট,' আমি বললাম, 'যে কর্মের ফলে একটা শিশ্বর জন্ম হয়, সেটাও তো একটা বেপরোয়া ব্যাপার—অবশ্য যদি আপনি চান তবে আমরা সারস পাখির গল্প করতে পারি। এ ব্যাপারে যা বলা হয়, বক্তৃতা দেওয়া হয়, বোঝান হয় সবই হচ্ছে একটা ভান। আপনারা এ ব্যাপারটাকে সর্বান্তঃকরণে নোংরামি বলে বিশ্বাস করেন এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে বিয়ের মাধ্যমে একে স্বীকৃতি দেন। অথবা জেনেশ্বনে আত্মপ্রবঞ্চনা করেন আপনারা। আপনারা এর দেহের অংশটাকে অপর অংশ থেকে আলাদা করে রাখেন, অথচ জানেন না, ওই অপর অংশটাই যত অনর্থের গোড়া। মনে রাখবেন একজন স্ত্রী যে তার প্রভুকে, স্বামীকে এত সহ্য করে সে কেবল একটা শরীর মাত্র নয় কিংবা যে জঘন্য মাতালটা বেশ্যাবাড়ি যায়, মনে করবেন না সেও কেবল একটা শরীর মাত্র; এমন কি ওই বেশ্যাও কেবলমাত্র একটা শরীর নয়। আপনারা এই গোটা ব্যাপারটাকেই একটা পটকা ফাটানোর মতন ছেলেখেলা মনে করেন আসলে। কিন্তু এটা একটা ডিনামাইট।'

'শ্রীয়ার', সে মিয়োনো গলায় বলল, 'অবাক লাগছে ভেবে, এ ব্যাপারে আপনি কতখানি ভেবেছেন।'

'অবাক!' চিৎকার করে উঠলাম, 'বরং অবাক হোন ওইসব ভাবনাহীন কুকুরগুলোকে দেখে, যারা তাদের স্ত্রীদের স্রেফ সম্পত্তি বলে মনে করে। মনিকা সিলভ্সকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি ঐ মেয়েদের সেবার এ বিষয়ে কী বলেছিলাম। যেদিন থেকে আমি জানলাম আমি একজন পুরুষ, সেদিন থেকে অন্য কোনও বিষয়ে আমি এত চিন্তা ব্যয় করিনি—আর তাতে কিনা আপনি অবাক হচ্ছেন?'

'অধিকার আর নিয়ম সম্বন্ধে আপনার কোনও ধারণা নেই। সামান্যতম ধারণাও না। এ সবই—যতই জটিল হোক না এগুলো—একটা নিয়মে তো আনতে হবে।'

বললাম, 'হ্যাঁ, আপনাদের নিয়মের খানিকটা আমি টের পেয়েছি। আপনারা প্রকৃতিকে একটা পথে ঠেলে সরিয়ে দেন, যাকে আপনারা বলেন বিবাহ বিচ্ছেদ—আর যখন প্রকৃতি বিবাহের মধ্যে ফাটল ধরায়, আপনারা আতঙ্কিত হন। স্বীকারোক্তি, ক্ষমা, পাপ—ইত্যাদি সবই ঘটে নিয়মমাফিক।'

লোকটা হাসল। হাসিটা কুৎসিত শোনাল। 'শ্রীয়ার,' সে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি আপনার কী হয়েছে! আপনি স্পষ্টতই একজন একপত্নীক, —গাধারা যেমন।'

'আপনি জুয়োলজীরও কিছু বোঝেন না;' আমি জবাব দিলাম, স্ত্রী-পুরুষসম জ্ঞানের কথা ছেড়েই দিলাম। গাধারা মোটেই একস্ত্রী-বিলাসী নয়, যদিও দেখতে সাধুগোছের। কাক, দাঁড়কাক, পিঠে-কাঁটা-মাছ একপত্নীক এমন কি গণ্ডারকেও কখনো কখনো একপত্নী-পিয়াসী দেখা যায়।'

'অবশ্য মানুষী কিন্তু নয়।' বলল সে। বলেই নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে, ঐ সামান্য কথাটা আমাকে কতটা আঘাত দিয়েছে, কারণ তারপরই আস্তে আস্তে বলল, 'মাপ করবেন, শ্রীয়ার। আমি ও-কথাটা বলতে চাইনি। বিশ্বাস করবেন?'

আমি চুপ করে গেলাম। মুখের জ্বলন্ত সিগারেটটা থু করে কার্পেটের ওপর ফেলে দিলাম, দেখলাম, আগুন কেমন ছড়িয়ে গেল, ছোটো ছোটো কালো একটা একটা ফুটো তৈরি হল। 'শ্রীয়ার,' কাতরভাবে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'বিশ্বাস করুন, আমি ওকথা আপনাকে বলতে চাইনি।'

বললাম, 'বিশ্বাস করলাম কি করলাম না, তাতে কি এসে যায়, কিন্তু বেশ, আমি বিশ্বাস করলাম।'

'আপনি তো প্রকৃতি প্রসঙ্গে কত কথাই বললেন,' সে বলল, 'আপনি আপনার প্রকৃতি অনুসরণ করলেই পারতেন। মারীর পেছনে ছুটে যেতেন, ওর জন্য যুদ্ধ করতেন।'

'যুদ্ধ,' বললাম, 'আপনাদের বিবাহসংক্রান্ত অদ্ভুত নিয়মের কোথায় আছে ওই শব্দ?'

'আপনি ব্রয়লাইন ডেয়ারকুম-এর সাথে যে জীবন কাটাচ্ছিলেন, সেটা বিবাহিত জীবন নয়।'

'বেশ তো, বিবাহিত জীবন নাহয় নাই হল। আমি প্রায় প্রত্যেকদিন ওকে ফোন করবার চেষ্টা করেছি, চিঠিও দিয়েছি নিত্য।'

'আমি জানি,' ও বলল, 'আমি জানি। এখন আর ওসব কথা ভেবে লাভ নেই।'

'এখন তাহলে খোলাখুলি অ্যাডালাট্রি ছাড়া উপায় নেই,' জিজ্ঞেস করলাম।

'আপনার দ্বারা তা হবে না' বলল সে। 'আপনি যা ভাবেন তার চেয়ে অনেক বেশি চিনি আমি আপনাকে, আর আপনি আমাকে যত খুশী গালাগালি দিতে পারেন, যত খুশী ভয় দেখাতে পারেন, আপনাকে একটা কথা বলছি, আপনার মধ্যে সাংঘাতিক যেটা, সেটা হচ্ছে, আপনি নির্দোষ, আমার বলতে ইচ্ছে করছে, আপনি একজন নির্মল মানুষ। আচ্ছা, আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি···মানে···।' চুপ করে গেল।

'আপনি বলতে চান, অর্থ সাহায্য?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তা-ও', বলল সে, 'তবে আমি বলতে চাচ্ছিলাম, আপনার পেশার দিক থেকে।'

'ও ব্যাপারে হয়তো পরে কথা বলব,' বললাম, 'দু ব্যাপারেই, অর্থ এবং পেশা। কিন্তু ও কোথায়?' আমি ওর নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছিলাম, আর ঐ স্তব্ধতার মধ্যে প্রথম গন্ধ পেলাম। শেভিং লোশন, একটুখানি রেড ওয়াইন একটা সিগারের গন্ধও, তবে হাল্কা। 'ওরা রোম-এ গেছে,' ও জবাব দিল।

'হানিমুন, তাই না।' জিজ্ঞেস করলাম কর্কশ গলায়।

'তাই তো বলে লোকে,' বলল।

'বেশ্যাপনার ষোলকলা পূর্ণ হয় যাতে, তাই না?' বললাম।

ধন্যবাদ বা ছেড়ে দিচ্ছি গোছের কিছু না বলেই রেখে দিলাম ফোনটা। সিগারেটের আগুনে পুড়ে কার্পেটে যে ছোট ছোট কাল ফুটোগুলো হয়েছিল সেদিকে তাকালাম, কিন্তু এত ক্লান্ত লাগছিল যে ওগুলো পায়ে চেপে সম্পূর্ণ নিভিয়ে দিতেও পারলাম না। শীত করছিল, হাঁটুতে যন্ত্রণা। বড্ড বেশী সময় বাংটবে ছিলাম।

আমার সঙ্গে মারী রোমে যেতে চায়নি। একবার যখন আমি সেকথা বলেছিলাম, ও লাল হয়ে উঠেছিল, বলেছিল, 'ইটালিতে যেতে পারি, কিন্তু রোমে না।' আর আমি যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন নয়?' ও প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি কি সত্যিই জান না?' 'না।' উত্তর দিয়েছিলাম, আর ও আমাকে কিছু বলেনি। আমি খুশী মনে ওর সঙ্গে রোমে যেতাম পোপকে দেখতে। মনে হয়, আমি হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিটারর্স প্লেস-এ অপেক্ষা করতাম; আর পোপ জানলায় এলে হাততালি দিতাম আর 'এভ্ভিভা' বলে চিৎকার করতাম। মারীকে সেকথা বলতে ও প্রায় ক্ষেপে গিয়েছিল। ও বলেছিল, আমার মত একজন নাস্তিক মহান ফাদারকে উচ্ছ্বাস দেখাবে, ওটা ওর কাছে একটা 'কেমন যেন বিকৃত রুচি'। ও রীতিমত ক্ষেপে উঠত। আমি ক্যাথলিকদের মধ্যে এটা প্রায়ই লক্ষ্য করেছি। ওরা ওদের সম্পদ সাক্রামেণ্টস্, পোপ প্রভৃতি কৃপণের মত লুকিয়ে রাখতে চায়। তাছাড়া দেখেছি, আমার জানা মানুষদের মধ্যে ওরাই সবচেয়ে বেশী অহঙ্কারী। সবতাতেই ওদের অহঙ্কার, ওদের গীর্জার যা ভাল তাতে, যেখানে যা খারাপ তাতে, ওরা প্রত্যেকের কাছে, যাদের ওরা কিছুটা বুদ্ধিমান মনে করে, আশা করে যে, তারা শিগগিরই ক্যাথলিক হয়ে যাবে। হয়তো মারী আমার সংগে রোমের যেতে চায়নি, কারণ সেখানে আমার সংগে থাকার পাপ সম্বন্ধে বিশেষ করে লজ্জা পেতে হতো। কোনও কোনও ব্যাপারে ও বেশ বোকা ছিল, খুব বুদ্ধি ওর কখনো ছিলনা। এখন ৎস্যুফ্নার-এর সংগে ওর রোমে যাওয়া খুব বিশ্রী কাজ হয়েছে। ওরা নিশ্চয় পোপের দেখা পাবে, আর ওই বেচারী পোপ ওকে কন্যা আর ৎস্যুফ্নারকে প্রিয় পুত্র বলে সম্বোধন করবে। সে ভাবতেও পারবে না যে, তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে একজোড়া পাপী ব্যভিচারী। হয়তো ও ৎস্যুফ্নার-এর সংগে রোমে গেছে, কারণ সেখানে কোনও কিছু দেখে আমার কথা ওর মনে পড়বে না। আমরা নেপল্‌সে, ভেনিস আর ফ্লোরেন্সএ গেছি, গেছি প্যারিসে, লন্ডনে, আর জার্মানীর অনেক শহরে। রোমে ও স্মৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারবে আর ওখানে ও

নিশ্চয় যথেষ্ট 'ক্যাথলিক হাওয়া' পাবে। ঠিক করলাম, সমারউইল্ডকে আবারও ফোন করব, বলব, আমার এক-নারী-নিষ্ঠা নিয়ে ঠাট্টা করাটা ওর পক্ষে জঘন্য রকমের অন্যায় হয়েছে; কিন্তু প্রায় সব শিক্ষিত ক্যাথলিকদেরই এই কুৎসিত স্বভাব, হয় ওরা ওদের অন্ধ বিশ্বাসের প্রাচীরেরআড়ালে বসে থাকে, নয় অন্ধ বিশ্বাস-সংক্রান্ত উপদেশ ছড়ায়। কিন্তু যখন কেউ শক্ত করে চেপে ধরে ওদের 'ধ্রুব সত্যকে,' ওরা হাসে আর 'মানব প্রকৃতির' দোহাই দেয়। দরকার হলে ওরা একটা নাটকীয় হাসি হাসে, যেন ওরা সোজা পোপের কাছ থেকে আসছে, যেন পোপ ওদের এক টুকরো ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে দিয়েছে। যাই হোক, ওদের প্রচারিত অস্বাভাবিক সত্যগুলো যখনই কেউ খুঁটিয়ে দেখতে চায়, হয় সে হয়ে যায় ওদের কাছে 'প্রটেস্টানট' নয়তো বেরসিক। ওদের সঙ্গে বিবাহ সংক্রান্ত কথা তুললেই ওরা ওদের অষ্টম হেনরীকে নিয়ে আসে। ওই কামান ওরা তিনশ' বছর ধরে দাগছে, ওরা জানিয়ে দিতে চায় গীর্জা কত নির্মম, কিন্তু যদিও ওরা জানাতে চায় গীর্জা কতটা উদার, তখন বলে বেসেউইৎস-এর গল্প, বিশপদের মস্করা। তবে তা একমাত্র 'উদ্যোগীদের' মধ্যে। উদ্যোগী বলতে ওরা 'শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান' বোঝে, তো তারা নিজেদের দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী যাই ভাবুক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। সেবার যখন আমি সমারউইল্ডকে বোসউইৎস-এর গল্পটা একবার গীর্জার পালপিট থেকে বলতে বলেছিলাম, লোকটা ক্ষেপে গিয়েছিল। পালপিট থেকে বলবে শুধু নর-নারীর কথা, শুধু ওই অষ্টম হেনরীর কামান দাগবে তখন। বিয়ের জন্য একটা রাজত্ব! অধিকার! নিয়ম! ভগমা!

আমার বিশ্রী লাগছিল, অনেকগুলো কারণে। দৈহিক কারণ, বোখুম-এ ব্রেকফাস্টের পর ব্র্যাণ্ডি আর সিগারেট ছাড়া কিছুই খাইনি। মানসিক কারণ, রোমের হোটেলে ৎসুফনার মারীর পোশাক পরা দেখছে ভেবে। হয়তো ও মারীর ছাড়া-জামাকাপড় হাতড়াবে। এইসব সদাচারী, বুদ্ধিমান, নিয়মানুগ, শিক্ষিত ক্যাথলিকদের দরকার মমতাময়ী স্ত্রী। মারী ৎসুফনার-এর জন্য নয়। ওর মত পুরুষ একজন, যে সবসময় সুন্দর পোশাক পরে, আর এমনই কেতাদুরস্ত থাকে যে, কোন সময়ই তাকে সেকেলে মনে হয় না, অথচ এত বেশি আধুনিকও নয় যে চোখে লাগবে—ওর মত পুরুষ যে সকালে ঠাণ্ডা জলে খুব করে স্নান করে আর এমন উৎসাহের সঙ্গে দাঁত মাজে, যেন কোন বাজী জিততে যাচ্ছে—ওর পক্ষে মারী যথেষ্ট বুদ্ধিমতী নয়। অধিকন্তু প্রাতঃকৃত্যাদিতে ওর বড্ড বেশি উৎসাহ। আর ৎসুফনার এমন এক জাতের যে, পোপের ঘরে ডাক পড়লে চট করে

আর একবার জুতোজোড়া সাফ করে নেবে রুমাল দিয়ে। পোপের জন্যও আমার কষ্ট হচ্ছিল, তার সামনে তো এরা দুজন গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসবে। পোপ তো ভাল মানুষের মত হাসবে আর এই সুন্দর, বিনয়ী, ক্যাথলিক জার্মান দম্পতি সম্বন্ধে গর্ব অনুভব করবে—তাতে করে আর একবার প্রবঞ্চিত হবে সে। তার পক্ষে ধারণা করাই সম্ভব হবে না যে, সে দুজন ব্যভিচারীকে আশীর্বাদ করছে।

আমি বাথরুমে গিয়ে গা মুছে পোশাক পরলাম, রান্নাঘরে গিয়ে জল গরম করতে বসালাম। মনিকা সবকিছুর কথাই মনে রেখেছিল। গ্যাস-উনুনের ওপর দেশলাই, বন্ধ কৌটোর মধ্যে পেষা কফি, ফিলটার পেপার, তার পাশে হ্যাম, ফ্রীজে কৌটোভরা আনাজ। রান্নাঘরের কাজ করতে আমার একমাত্র তখনই ভাল লাগে, যখন বড়দের বিশেষ আলোচনা থেকে পালাবার আর অন্য কোনও পথ থাকে না। যখন সমারহিল্ড "যৌন" সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে, ব্লোথ্যার্ট কা…কা…ক্যাবিনেট বমি করে কিংবা ফেডেবয়েল সুন্দর সাজান একটা বক্তৃতা দেয় ককতো সম্বন্ধে—তখন বরং আমি রান্নাঘরে যাই, টিউব থেকে মায়োনেসে বার করি, জলপাই কাটি আর রুটির ওপর লিভার সসেজ লাগাই। যখন নিজের জন্য একা কিছু করতে হয় তখন যেন হারিয়ে যাই। একা একা আমার হাত দুটো আনাড়ী হয়ে ওঠে আর কৌটো কাটবার বা ডিম ভেঙে ফ্রাইং প্যানে দেবার দরকার হলেই আমার মধ্যে একটা গভীর বিষাদ দেখা দেয়। আমি ব্যাচেলার নই। মারী অসুস্থ হলে বা কাজে গেলেও কিছুদিন কোলন-এ একটা কাগজের দোকানে কাজ করেছিল, তখন রান্নাঘরে কাজ করতে আমার তেমন অসুবিধা হত না। আর ওর প্রথম গর্ভপাতের পর তো আমি বিছানার চাদর-টাদরও কেচেছি, আমাদের বাড়িওয়ালী সিনেমা থেকে ফেরবার আগেই।

একটা বরবটির কৌটো কাটতে পারলাম, হাত ফস্কায়নি, ফুটন্ত জল ফিলটারে ঢাললাম। আর সারা সময় ভাবলাম বাড়িটার কথা, ৎস্যুফনার যেটা তৈরি করিয়েছিল। দু'বছর আগে একবার ওখানে গিয়েছিলাম।

১৪

আমি কল্পনায় মারীকে দেখলাম, অন্ধকারের মধ্যে বাড়ি ফিরছে। সুন্দর ছোটা লনটা প্রায় নীল দেখাচ্ছিল চাঁদের আলোয়। গ্যারেজের পাশে কাটা ডালগুলি মালী রেখেছে গাদা করে। ব্রুম আর লাল হথর্ন গাছের মাঝখানে ডাস্টবিন, সকালে পরিষ্কার করে নিয়ে যাবে। শুক্রবারের সন্ধ্যা। এতক্ষণে ও জানতে পেরে গেছে রান্নাঘরে কিসের গন্ধ, মাছের; শ্যুফনার-এর লেখা টেলিভিশন-এর ওপর রাখা চিরকুটে কি খবর রাখা আছে, তা-ও জেনে ফেলেছে। 'বিশেষ দরকারে এক-এর ওখানে যেতে হচ্ছে। চুমু, হেরিব্যার্ট', অন্য চিরকুটটা ঝি রেখে গেছে ফ্রীজের ওপর, 'সিনেমায় যাচ্ছি, দশটায় ফিরব। গেটে (লুইসে, বির্গিট)।'

গ্যারেজের দরজা খোলা, আলো জ্বলছে—চুনকাম করা দেয়ালে একটা স্কুটারের আর একটা বাতিল সেলাই কলের ছায়া। ওপাশে ম্যারসেডেটা প্রমাণ করেছে, শ্যুফনার হেঁটে গেছে। 'হাওয়া খেতে, একটু হাওয়া খেতে, হাওয়া, হাওয়া।' টায়ার আর মাডগার্ডে লেগে থাকা কাদা বলছে বিকেলে আইফেল পাহাড়ে যাওয়ার কথা, যুব ইউনিয়নে বক্তৃতা করার কথা (একতাবদ্ধ হও, একসঙ্গে উঠে দাঁড়াও, একসঙ্গে দুঃখ ভোগ কর)।

ওপরের দিকে একবার তাকাও—বাচ্চাদের ঘরেও সব অন্ধকার। প্রতিবেশী বাড়িগুলোর মাঝে গাড়ি বের করবার আর ঢোকাবার দুটো রাস্তা, আর সীমানায় চওড়া ফুলগাছের বর্ডার বাড়িটাকে প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে পৃথক করে রেখেছে। সেখান থেকে আসছে টেলিভিশন থেকে ঠিকরে পড়া বিশ্রী আলোর রশ্মি। এমন সময় স্বামী বা বাবা বাড়ি ফিরলে ব্যাঘাত মনে হতো, হারিয়ে যাওয়া ছেলে ফিরে এলে তাও ব্যাঘাতের কারণ হতো; না হত বাছুর কাটা, না হত মুরগী গ্রীল। কেবল ফ্রীজে রাখা লিভার সসেজ দেখিয়ে দেওয়া হতো।

শনিবারের বিকেলে হতো ভাই-ব্রাদারী সমারোহ, ব্যাডমিণ্টনের বল বেড়ার ওপাশে পড়লে, বাচ্চা বেড়াল বা কুকুর পালিয়ে যেত, বলটাও ফেরত আসত। বাচ্চা বেড়াল—'ও, কি সুন্দর'—কিংবা বাচ্চা কুকুর—'ও, কি সুন্দর'—বাগানের দরজায় বা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ফেরত দিত কেউ বলটা। গলায় বিরক্তির স্বরটা সব সময়ই চাপা এবং কখনই ব্যক্তিগত নয়; কেবল কখনও

সখনও এই সাধারণ অভিব্যক্তি কিছু সরব হত আর প্রতিবেশীর আকাশে আঁচড় কাটতো। কিন্তু এসব সব সময়ই অকারণ, কখনই কোনও প্রকৃত কারণে ঘটত না; যখন একটা প্লেট সশব্দে ভেঙে পড়ত, গড়িয়ে আসা বলে ফুলগাছ নষ্ট হতো, বাচ্চার হাত গাড়ির রঙের ওপর সুরকি ছড়াত, টাট্‌কা কাচা, টাট্‌কা ইস্ত্রী পোশাক বাগানে জল দেবার সময় ভিজে যেত—স্বরগুলো তীক্ষ্ণ হত, যে স্বর কখনোই বিশ্বাসঘাতকায়, ব্যভিচারে, গর্ভপাতে তীক্ষ্ণ হতে পারেনি। 'আঃ, তোমার কানেদুটো বড্ড বেশি সজাগ, ওষুধ খাও।'

কিচ্ছু খেয়ো না, মারী।

সদর দরজা খোলা: শান্ত আর সুন্দর উষ্ণতা। ছোট্ট মারী ঘুমোচ্ছে ওপরে। এমনি উড়ে যায় সময়—বিয়ে বন্‌-এ, হানিমুন রোমে, গর্ভাবস্থা, সন্তান লাভ—বরফ-সাদা বালিশে বাচ্চার তামাটে কোঁকড়া চুল। তোমার মনে আছে, ও আমাদের বাড়িটা দেখিয়ে সগর্বে বলেছিল, বারোটা ছেলেমেয়ের জায়গা আছে এখানে—আর এখন, সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে তোমাকে সে কেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, ঠোঁটে না-বলা 'তাহলে', আর গীর্জার আর পার্টির সহজ সরল সব বন্ধুরা তিন গ্লাস ব্র্যান্ডি খেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এক আর বারোর মধ্যে আডাম রীসের হিসেব মত এগারো এখনও বাকী!'

শহরে কানাকানি হবে। তুমি আবার সিনেমায় গিয়েছিলে, এমন সুন্দর সোনালী বিকেলে সিনেমায়, তারপর আবার সিনেমায়—তারপর আবার।

সারাটা সন্ধ্যা একা ঐ 'চক্রে', ব্লোথ্যার্ট-এর বাড়িতে, কা-কা-কা-ছাড়া আর কিছু কানে আসছে না, আর এবারের শেষটা নৎসলার নয়, থোলেনে। শব্দগুলো আমাদের কানে একটা উটকো জিনিসের মত কানের ভিতরে ঘুরপাক খায়, কান পাতলে মনে হয় কি যেন ক্লীক্‌ ক্লীক করছে, একটুখানি আলসার-এর মতও সন্দেহ হয়। ব্লোথ্যার্ট-এর আছে গাইগার কাউন্টার, ওটা কাথোলোন-এর উপস্থিতি প্রমাণ করতে পারে। 'এ লোকটার আছে—ও লোকটার নেই—এ মহিলার আছে—ও মহিলার নেই'। যেন ফুলের পাপড়ি ছেঁড়া—ও আমাকে ভালবাসে, এ আমাকে ভালবাসে না। ওইটি আমাকে ভালবাসে। এখানে ফুটবল ক্লাব আর পার্টির বন্ধুদের, সরকার আর বিরোধী দলকে কাথোলোন দিয়ে বিচার করা হয়। শ্রেণীচিহ্নের মত খোঁজা হয়, পাওয়া যায় না; একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য সে খোঁজে—পায় না নর্ডিক নাক, ভূমধ্যসাগরীয় মুখ। একজনের নিশ্চয় আছে, সে গিলে ফেলেছে, সেই প্রত্যাশিত, প্রচণ্ড অম্লিষ্ট বস্তুটি

রোথ্যার্ট নিজে, ওর দৃষ্টির আড়ালে যাও, মারী। বিলম্বিত ভালবাসা, একজন সেমিনারিস্ট তার ষষ্ঠ কম্যান্ডমেন্ট সম্বন্ধে ধারণা নিয়ে যখন বিশেষ কোনও পাপের কথা বলবে, তখন কেবল বলবে ল্যাটিনে ঃ In sexto,de sexto অবশ্যই তা সেক্স্‌-এর মত শোনাবে। আর প্রিয় ছেলেমেয়েরা ! তাদের মধ্যে বড় হুব্যার্ট আছেরো, মার্গেট সতেরো, আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারে, বড়দের আলোচনায় উপকার হবে তাদের। বিষয় ঃ কাথোলোন, স্থায়ী সরকার, মৃত্যুদণ্ড, যাতে কাউ রোথ্যার্ট-এর চোখে এক শঙ্কণীয় কম্পনের সৃষ্টি হবে, তার গলা একটা উত্তেজিত গ্রামে উঠবে। সেখানে হাসি আর কান্নার একটা মজার সংমিশ্রণ ঘটবে। সান্ত্বনা পেতে, বৃথা। বৃথাই তুমি চেষ্টা করবে রোথ্যার্ট-এর ঠাণ্ডা দক্ষিণপন্থী উন্মাসিকতায় বিরক্ত হতে। একটা সুন্দর শব্দ আছে—শূন্য। শূন্য চিন্তা কর। কানৎসুলার আর কাথোলোন নয়, ভাবো সেই ক্লাউনের কথা, যে বাথটবে বসে কাঁদে, যার কফি পায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ে।

১৫

শব্দটা আমি চিনি, কিন্তু তার সঙ্গে সম্পর্ক আমার নেই। বহুবার শুনেছি, কিন্তু কখনও তাতে সাড়া দিতে হয়নি। বাড়িতে ঝি-এরা ওই সদর দরজার বেল্‌-এর শব্দে সাড়া দেয়, জেয়ারকুমদের দোকানের ঘণ্টা বহুবার শুনেছি, কিন্তু কখনও উঠিনি। কোলন-এ আমরা একটা মেস বাড়িতে থেকেছি, হোটেলেও সেখানে শুধু টেলিফোনের ঘণ্টা বাজে। আমি ঘণ্টার শব্দ শুনেছি, কিন্তু খেয়াল করিনি। ওটা আমার কাছে কেমন অপরিচিত। এই ফ্ল্যাটে ওটা আমি মাত্র দুবার শুনেছি, একবার একটা ছেলে দুধ নিয়ে এসেছিল তখন, আর একবার ৎস্যুফ্‌নার যখন মারীকে এক তোড়া ক্ষুদে ক্ষুদে গোলাপ পাঠিয়েছিল। গোলাপগুলো যখন এলো আমি শুয়েছিলাম, মারী ঘরে এসে আমাকে দেখাল গোলাপগুলো, খুব খুশিমনে সে তোড়ার মধ্যে নাক ডুবিয়েছিল। একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তখন, কারণ আমি ভেবেছিলাম, ফুলগুলো

আমাকে পাঠানো হয়েছে। অনেক সময় আমার মহিলা ভাবকেরা আমাকে হোটেলে ফুল পাঠাত। আমি মারীকে বলেছিলাম, 'তারী সুন্দর তো গোলাপগুলো, তুমি নাও'। ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাঃ, এগুলো তো আমাকেই পাঠিয়েছে।' আমি লাল হয়ে উঠেছিলাম। আমার অস্বস্তি লাগছিল। আমার মনে পড়ছিল, আমি মারীর জন্য ফুল পাঠাতে বলিনি কখনও। স্টেজে যত ফুল পেয়েছি, সেগুলো অবশ্য সবই এনে মারীকে দিয়েছি। কিন্তু কিনে দিইনি কোনদিন। আসলে স্টেজে পাওয়া ফুলগুলোর বেশির ভাগের দাম আমাকেই দিতে হতো। 'কে পাঠিয়েছে তবে ফুলগুলো ?' জানতে চেয়েছিলাম। ও বললে, 'ৎস্যাফ্নার।' 'সে কি, তার মানে ?' আমার মনে পড়েছিল সেই হাত ধরাধরির কথা। মারী লাল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'ও আমাকে ফুল পাঠাবে না কেন ?' বললাম, 'প্রশ্নটা অন্য রকম হওয়া উচিত ছিল, ও তোমাকে ফুল পাঠাবে কেন ?' ও বলল, 'আমাদের অনেকদিনের পরিচয় আর বোধহয় ও আমার স্তাবক।' 'বেশ তো,' বললাম, 'করুক না তোমার স্তব, কিন্তু এতগুলো দামী ফুল, কেমন যেন চোখে লাগে। আমার মনে হয় রুচির বিকার।' ও অপমান বোধ করে ঘরের বাইরে চলে গিয়েছিল।

দুধ নিয়ে ছেলেটা যখন এসেছিল, তখন আমরা বসবার ঘরে, মারী বাইরে গিয়ে দরজা খুলে ওকে দাম দিয়েছিল। অতিথি আমাদের এই ফ্ল্যাটে মাত্র একবার এসেছিল, লেয়ো, ওর ক্যাথলিক হওয়ার আগে, কিন্তু ও বেল্ বাজায়নি, মারীর সঙ্গে এসেছিল। বেল্-এর আওয়াজটা কেমন যেন অদ্ভুত রকম লাজুক কিন্তু নাছোড়বান্দা। আমার কেমন একটা বিশ্রী ভয় হচ্ছিল, মনিকা হতে পারে, হয়ত সম্মারউইল্ডই তাকে পাঠিয়েছে কোনও এক অজুহাতে। সঙ্গে সঙ্গে আবার নিকোলুভ-কমপ্লেক্স পেয়ে বসলো আমাকে। জবজবে ভেজা চটি পায়ে ছুটে গেলাম করিডোরে, যে সুইচটায় চাপ দিতে হবে সেটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ওটা খুঁজতে খুঁজতে মনে পড়ল, মনিকার কাছে তো বাড়ির চাবি আছে। অবশেষে সুইচটা খুঁজে পেলাম, চাপ দিলাম, শুনলাম নিচে একটা শব্দ, জানলার শার্সিতে যেন মৌমাছি গুনগুন করছে। বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম লিফটের পাশে। লিফট চালু হবার আলোটা লাল হল, এক নম্বর জ্বলে উঠল, তারপর দু'নম্বর, উৎকণ্ঠিত হয়ে সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম, হঠাৎ খেয়াল হল, একজন আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমি চমকে উঠলাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি, একজন সুন্দরী মহিলা, বেশ ছিমছাম ফর্সা, খুব বেশি রোগাটে নয়। তার

হালকো ধোঁয়াটে-রঙ চোখ দুটি চমৎকার। টুপিটা কেবল আমার মতে একটু বেশি লাল। আমি মুচকি হাসলাম, মহিলাটিও হাসল মুখ টিপে, বলল, 'আপনি নিশ্চয় হেরার স্মীয়ার—আমি মিসেস গ্রেবসেল, আপনার প্রতিবেশী। আপনাকে সশরীরে দেখে আমার ভাল লাগছে।' 'আমারও ভাল লাগছে,' বললাম আমি—আমারও সত্যিই ভাল লাগছিল ঐ লাল টুপিটা সত্ত্বেও। ফ্রাউ গ্রেবসেল তাকিয়ে দেখবার মত। ওর হাতে একটা কাগজ দেখলাম, 'ডী স্টিমে ডেস্ বনস' (বন্ বার্তা)। আমার নজর দেখে মহিলাটি লাল হয়ে বলল, 'ও নিয়ে ভাববেন না।' আমি জবাব দিলাম, 'ওই কুকুরটাকে থাপ্পড় মারব, যদি জানতেন, কি রকম জঘন্য দুমুখো সাপ লোকটা—আর ঠকাতেও ছাড়েনি আমাকে, পুরো এক বোতল মদ ঠকিয়েছে।' মহিলাটি হাসল, 'পাশাপাশি থাকি, আপনি একবার আসুন না, আপনার প্রকৃত প্রতিবেশী হতে পারলে আমরা, আমার স্বামী আর আমি, খুব খুশি হবো। আছেন তো কিছুদিন?' বললাম, 'হ্যাঁ, থাকব আর আপনাদের আপত্তি না থাকলে একদিন আসব—আপনাদের ফ্ল্যাটেরও কি পোড়ামাটি রঙ?' 'নিশ্চয়,' সে বলল, 'পোড়ামাটি রঙই তো ছ-তলার বৈশিষ্ট্য।' লিফটা চারতলায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, এবার চার লাল হল, পাঁচ, আমি দরজাটা টান দিয়ে খুললাম আর এত অবাক হয়ে গেলাম যে এক-পা পিছিয়ে এলাম। আমার বাবা লিফট থেকে বাইরে এল, ফ্রাউ গ্রেবসেল লিফটে না ঢোকা অবধি দরজটা ধরে রেখে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বলে উঠলাম, 'হে ভগবান, বাবা, তুমি!' আগে কখনও বাবা বলিনি, সব সময় কেবল পাপা ডেকেছি। বাবা বলল, 'হান্স'! বলে এলেবেলেভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল। আমি আগে আগে ফ্ল্যাটে ঢুকলাম। আর টুপি আর ওভারকোট নিলাম, বসবার ঘরের দরজা খুলে দিয়ে সোফার দিকে ইঙ্গিত করলাম। বাবা আড়ষ্টভাবে সোফায় গিয়ে বসল।

আমরা দুজনেই খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম। বাবা-মা আর সন্তানের মধ্যে অস্বস্তিই বোধহয় পরস্পরকে বুঝবার একমাত্র যোগসূত্র। খুব সম্ভব আমার 'বাবা' ডাক খুব কাতর শুনিয়েছিল, আর তাতে অস্বস্তি বেড়েছে, সে অস্বস্তি অবশ্য এড়াবার কোনও উপায়ই ছিল না। বাবা একটা পোড়ামাটি রঙের সোফায় বসে মাথা নাড়তে নাড়তে আমার দিকে তাকাল। আমার চটি জোড়া আর মোজা জবজবে ভেজা, ড্রেসিং গাউনটা বেটপ লম্বা, ওটাও দুর্ভাগ্যবশত কেমন যেন আগুনরঙা লাল। আমার বাবা লম্বা নয় বরং খাটো। নরম আর

এমন সতর্ক সুন্দর উদাসীন পরিচ্ছদ যে অর্থনৈতিক কোনও সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলেই টৌলিভিশনের লোকেরা ব্যস্ত হয়ে বাবাকে হাজিরে উপস্থিত করে। বাবার মধ্যে সব সময়ই ভালমানুষি আর বিবেচনা উপচে পড়ে, আর ইতিমধ্যে কয়লাখনির শ্রমিক হিসেবে কোনদিন যা না পরত, টৌলিভিশন স্টার হিসেবে তার চেয়ে অনেক বেশি নাম করেছে। সামান্যতম নিষ্ঠুরতার ছোঁয়াও বাবা ঘৃণা করে। এমনি দেখলে মনে হবে, বুঝি বাবা সিগার খায়, মোটা নয় সরু হাল্‌কো সিগার, কিন্তু বাবা যে সিগার খায় সেটা একজন সত্তর বছরের ক্যাপিটালিস্ট-এর পক্ষে বেশ অপ্রত্যাশিত রকমের চৌকস এবং প্রগতিশীল মনে হয়। আমি ভালই বুঝি, কেন যখনই কোনও অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়, ওরা বাবাকে পাঠায়। বাবার মধ্যে কেবল ভালমানুষির ছাপই নেই, সে সত্যিকার ভালমানুষও, আর সেটা দেখলেই বোঝা যায়। আমি বাবাকে সিগারেট এগিয়ে দিলাম, আগুন দিলাম, তার সেজন্য যখন একটু ঝুঁকেছি বাবার দিকে, বাবা বলল, 'ক্লাউনদের ব্যাপারে আমি বিশেষ কিছু জানি না, তবে কিছু কিছু খবর রাখি বই কি। তবে তারা যে কফিতে স্নান করে, এটা আমার কাছে নতুন।' বাবা ইচ্ছা করলে দারুণ রসিকতা করতে পারে। 'আমি কফিতে স্নান করি না, বাবা,' বললাম, 'আমি কেবল কফি ঢালতে গিয়েছিলাম, তখন ঘটেছে অঘটনটা।' নিদেনপক্ষে এই কথা ক'টা বলবার সময় আমার 'পাপা' বলা উচিত ছিল, কিন্তু এখন আর ভেবে লাভ নেই। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু দেব তোমাকে?' বাবা মুচকি হাসল, আমার দিকে অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে বলল, 'কি আছে তোর ঘরে?' আমি রান্না ঘরে গেলাম। ফ্রীজে ছিল ব্র্যাণ্ডি, কয়েক বোতল মিনারাল ওয়াটারও ছিল—ছিল লেমনেড আর এক বোতল রেড ওয়াইন। আমি প্রত্যেকের একটা করে বোতল নিয়ে এলাম বসবার ঘরে, বাবার সামনে টেবিলের ওপর সার করে রাখলাম। বাবা পকেট থেকে চশমা বার করে লেবেল-গুলো পড়ল। মাথা নাড়তে নাড়তে সবার আগে ব্র্যাণ্ডির বোতলটা সরিয়ে রাখল। আমি জানতাম, বাবা ব্র্যাণ্ডি খেতে ভালবাসে, ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম, 'ওটা তো মনে হয় ভাল জাতের।' 'জাতটা খুবই ভাল,' বাবা বলল, 'কিন্তু ব্র্যাণ্ডি বরফ-ঠাণ্ডা হলে সবচেয়ে ভাল, ব্র্যাণ্ডিও আর ব্র্যাণ্ডি থাকে না।'

বললাম, 'সে কি, ব্র্যাণ্ডি তাহলে ফ্রীজে রাখতে নেই?' বাবা চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমি এইমাত্র একটা ইতরামির অপরাধে আসামী হয়েছি। বাবাও এক রকমের এসথেট, সকালের টোস্ট তিন

চারবার রান্নাঘরে ফেরত পাঠাতে কোনও রকম দ্বিধা করে না, যতক্ষণ না আমরা একদম নিখুঁত বাদামী রঙটা বার করতে পারে। প্রত্যেক দিন সকালে এই ঠান্ডা যুদ্ধ শুরু হয়, আমার ধারণা টোস্ট আসলে 'এ্যাংলো-স্যাক্সন হাঁদামি'। 'ব্র্যান্ডি, কাঁজে!' বলল বাবা উপহাস করে, 'তুই কি সত্যিই জানতিস না—নাকি ভান করছিস? তোর ব্যাপার-স্যাপার তো বোঝা দায়।'

'আমি জানতাম না,' বললাম। আমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে হাসল বাবা। মনে হল বিশ্বাস করেছে।

'অথচ তোকে মানুষ করবার জন্য আমি কম অর্থ ব্যয় করিনি,' বলল বাবা। উক্তিটা ঠাট্টার মতন শোনাল, যেভাবে একজন সত্তর বছরের বাবা তার পরিণত বয়সের ছেলের সঙ্গে ঠাট্টা করে। কিন্তু ঠাট্টাটা মাঠে মারা গেল, অর্থ শব্দটা যুক্ত হয়ে ওটা জমে বরফ হয়ে উঠল। মাথা নাড়তে নাড়তে বাবা লেমনেডটা সরিয়ে রাখল, রেড ওয়াইনটাও। বলল, 'মিনারাল ওয়াটারই এ অবস্থায় সবচেয়ে ভাল মনে হচ্ছে।' দুটো গ্লাস নিয়ে এসে আমি মিনারাল ওয়াটারের বোতল একটা খুললাম। এটা অন্তত ঠিক পেরেছি বলে মনে হল। আমাকে বোতলের ছিপি খুলতে দেখতে দেখতে বাবা খুশিমনে মাথা নাড়ছিল।

'আমি ড্রেসিং গাউন পরে আছি,' বললাম, 'তাতে তোমার অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'হ্যাঁ,' বাবা বলল, 'অসুবিধা হচ্ছে। ঠিকমত জামা-কাপড় পরে আয়। তোর এই পোশাক আর তোর গায়ের কফির গন্ধটা হাস্যকর, এখনকার অবস্থাটাকে খেলো করে তুলেছে, অথচ ব্যাপারটা খেলো নয়। তোর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা আছে। আর তাছাড়া কিছু মনে করিস না, আমি স্পষ্ট করেই বলছি, তুইও নিশ্চয় এখনও মনে করতে পারিস, এসব ছন্নছাড়া ভাব আমার দু' চোখের বিষ।'

'ছন্নছাড়া ভাব নয়,' জবাব দিলাম, 'এটা আরামের প্রকাশ।'

'কি জানি', বাবা বলল, 'জীবনে ক'বার আমার কথা শুনেছিস, এখন তো আর আমার কথা শুনতে বাধ্য নোস। অনুরোধ করছি, এই উপকারটা কর।'

আমি অবাক হলাম। আগে বাবা বরং স্বল্পভাষী ছিল, প্রায় নির্বাক। টেলিভিশনে শিখেছে 'প্রভাব বিস্তারকারী চমক'-এর সাথে যুক্তিতর্ক করতে। এই চমকটাকে অস্বীকার করতে ইচ্ছা করল না।

বাথরুমে গেলাম, কফিতে ভেজা মোজাজোড়া খুলে ফেললাম, পা দুটো

মুছে ফেললাম, জামা, প্যান্ট, কোট পরলাম, খালি পায়ে রান্নাঘরে গেলাম, গরমকরা সাদা বরবটি একটা প্লেটে ঢেলে সামান্য সিদ্ধ ডিমগুলো ভেঙে স্রেফ তার ওপর ঢেলে দিলাম, ডিমের খোসা থেকে বাকি অংশটুকু চামচ দিয়ে আঁচড়ে বার করলাম, এক চাকা রুটি আর একটা চামচ নিয়ে বসবার ঘরে গেলাম। বাবা আমার প্লেটের দিকে তাকাল এমন একটা মুখ করে, যাতে রীতিমত পারদর্শিতা-সাপেক্ষ বিস্ময় আর বিতৃষ্ণার মিশ্রণের প্রকাশ।

'কিছু মনে করো না,' বললাম, 'আজ সকাল ন'টা থেকে কিছু খাইনি, আর আমার মনে হয় না যে তুমি চাও, আমি অজ্ঞান হয়ে তোমার পায়ের কাছে পড়ে যাই।' যন্ত্রণার হাসি হাসল বাবা, মাথা নাড়ল, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে—কিন্তু জানিস, কেবলমাত্র প্রোটিন স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়।'

'পরে একটা আপেল খাব,' বললাম। বরবটি আর ডিম উলটে পালটে মেশালাম, এক কামড় রুটি মুখে নিয়ে ওই পদার্থটা এক চামচ মুখে পুরলাম, খুব ভাল লাগল স্বাদটা।

'অন্তত পক্ষে খানিকটা টমাটোর একটা কিছু ওর সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল তোর,'—বাবা বলল।

বললাম, 'ওসব কিছু নেই।'

বড্ড তাড়াতাড়ি খেলাম, আর খাবার সময় যে প্রয়োজনীয় শব্দ করছিলাম তা আমার বাবার অপছন্দ বলে মনে হচ্ছিল। বিরক্তিটা চেপে রাখছিল, তবে সম্পূর্ণ নয়, তাই আমি শেষে উঠে রান্নাঘরে গেলাম, ফ্রীজের ওপর প্লেট রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবটা খেয়ে ফেললাম, খেতে খেতে ফ্রীজের ওপরে ঝোলান আয়নায় দেখছিলাম নিজের খাওয়া। গত কয়েক সপ্তাহে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ট্রেনিংটাও করিনি—মুখের ট্রেনিং। ক্লাউনের সবচেয়ে বড় পারদর্শিতা নির্ভর করে তার অচঞ্চল মুখের ওপর, কিন্তু তার মুখ সব সময় নড়াচড়া করাতেই হয়। ওই ট্রেনিং শুরু করবার আগে, আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে জিভ বের করে থাকতাম, যাতে করে নিজেকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়ার আগে নিজের খুব কাছাকাছি হতে পারি। পরের দিকে ওসব বাদ দিয়ে, কোনও রকম ফন্দির আশ্রয় না নিয়ে, নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, রোজ আধঘণ্টা ধরে, যতক্ষণ না নিজেই নিজের কাছে অনুপস্থিত হয়ে যেতাম। আমার কোন 'আত্মপ্রীতি' প্রবণতা ছিল না, তাই, অনেক সময় ওই অবস্থায় প্রায় পাগলের মত হয়ে যেতাম। আমি

ভুলেই যেতাম যে আয়নায় ওটা আমার মুখ। ট্রেনিং-এর শেষে আয়নাটা উলটে দিতাম, তারপর সারাদিনে যদি অন্য কোন আয়নায় হঠাৎ চোখ পড়ত চমকে উঠতাম। আমার বাথরুমে, পায়খানায় একজন অচেনা লোক, লোকটাকে দেখে বুঝতে পারতাম না, গম্ভীর, না মজার। একটা লম্বা নাক, ফ্যাকাশে ভূত—আমি যত জোরে সম্ভব দৌড়ে যেতাম মারীর কাছে. ওর চোখে নিজেকে দেখতে। ও চলে যাবার পর থেকে আমি আর মুখের ট্রেনিং করতে পারি না—আমার ভয় হয়, পাগল হয়ে যাব। ট্রেনিং শেষ করে আমি মারীর খুব কাছে যেতাম, যতক্ষণ না ওর চোখের মধ্যে নিজেকে দেখতে পেতাম—ছোট্ট, একটুখানি খানিকটা বিকৃত; কিন্তু চেনা যায়—ওটা আমি, অথচ সেই একই লোক যাকে আয়নায় দেখে ভয় পেয়েছিলাম। ৎসোনেয়ারারকে আমি কেমন করে বোঝাব যে, মারীকে ছাড়া আয়নার সামনে ট্রেনিং অসম্ভব ? খেতে খেতে নিজেকে দেখাটা শুধু কষ্টদায়ক, আতঙ্কিত হবার মত নয়। আমি চামচটা নজর করতে পারছিলাম, বরবটির দানাগুলো চিনতে পারছিলাম, ডিমের সাদা অংশ আর কুসুমের ছোট ছোট টুকরো, তার মধ্যে একচাকা রুটি ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। আয়নাটা কেবল খেয়ে-পরিষ্কার করা একটা প্লেট-এর মত করুণ ঘটনা প্রতিপন্ন করেছে—ক্রমশ ছোট হয়ে আসা একচাকা রুটি, সামান্য খাদ্যে লেপটানো মুখ যা আমি কোটের হাতায় মুছে ফেলেছি। আমি অনুশীলন করিনি। অন্য কেউ নেই, যে আমাকে আয়না থেকে ফিরিয়ে আনবে। আমি ধীরে সুস্থে বসবার ঘরে ফিরে গেলাম।

'এত তাড়াতাড়ি', বাবা বলল, 'তুই বড্ড তাড়াতাড়ি খাস্। এবার বোস। জল-টল কিছু খাবি না ?'

'না', বললাম, 'কফি করতে গিয়েছিলাম, একদম বাজে হল।'

'আমি তৈরি করে দেব ?' জিজ্ঞেস করল বাবা।

'পার তৈরি করতে ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি খুব ভাল কফি তৈরি করতে পারি বলে আমার খ্যাতি আছে।' বলল বাবা।

'যাক, বাদ দাও,' বললাম, 'ওটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার, আমি একটু মিনারাল ওয়াটার খাচ্ছি।'

'কিন্তু, আমি করতে পারলে খুশী হব।' বলল বাবা।

বললাম, 'না, থাক। রান্নাঘরের ভেতরটা যা দেখাচ্ছে—কফিতে থৈ-থৈ,

ঘরবাটির খোলা টিন, মেঝেতে ডিমের খোসা।'

'বেশ,' বলল বাবা, 'তোর যেমন ইচ্ছে।' বাবাকে কেমন যেন দুঃখে পেয়েছে বলে মনে হল, উচিত নয় যদিও। আমার গ্লাসে মিনারাল ওয়াটার ঢেলে দিল বাবা, সিগারেট কেসটা এগিয়ে দিল, আমি একটা নিলাম, আগুন দিল, আমরা সিগারেট খেতে থাকলাম। বাবার জন্য কষ্ট হচ্ছিল। আমার ঐ একপ্লেট ঘরবাটি দেখে বোধহয় বাবার সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে। হয়তো ভেবেছিল আমার এখানে এসে দেখবে যাকে বোহেমিয়ান বলে তাই—সবকিছু ইচ্ছাকৃতভাবে অগোছাল, দেয়াল আর মেঝে জুড়ে যাবতীয় আধুনিক জিনিসে ঠাসা, কিন্তু ফ্ল্যাটটা দৈবাৎ নিতান্ত সাদামাটা, প্রায় বুর্জোয়া, আর আমি লক্ষ্য করলাম তাতে বাবা হতাশ হয়েছে। সাইডবোর্ডটা আমরা ক্যাটালগ দেখে কিনেছিলাম, দেয়ালের ছবিগুলোর বেশীর ভাগই পুনর্মুদ্রণ, ওগুলোর মধ্যে মাত্র দুটোই যা একটু বিষয়ে বিমূর্ত, ভাল বলতে একমাত্র দুটো মনিকা সিল্‌ভেস্‌এর আঁকা জলরঙ ছবি, ও দুটো শেল্‌ফ-এর ওপর ঝোলানো—'রাইন দৃশ্য—তিন' আর 'রাইন দৃশ্য—চার'—গাঢ় ছাই রঙের, তার মধ্যে প্রায় অদৃশ্য সাদা রেখা। আর দু'চারটে সুন্দর জিনিস যা আছে সে হচ্ছে চেয়ার, দু'চারটে ফুলদানী আর কোণে রাখা চা-এর গাড়ি—মারী কিনেছিল। আমার বাবার দরকার নিজস্ব পরিবেশ। আমাদের ফ্ল্যাটের পরিবেশে বাবা নার্ভাস আর বোবা হয়ে গেছে।

'আমি এখানে, তা কি মা তোমাকে বলেছে ?' দ্বিতীয় সিগারেটটা জ্বালতে জ্বালতে আমি প্রশ্ন করলাম, এতক্ষণ একটা কথাও বলিনি।

'হ্যাঁ,' বাবা জবাব দিল, 'ওর সঙ্গে ওরকম না করলেই চলে না তোর ?'

'ওই কমিটির গলায় যদি প্রথম কথা না বলত, তাহলেই সব অন্যরকম হত,' আমি বললাম।

'কমিটি তোর কি করেছে ?' বাবা জিজ্ঞেস করল ঠাণ্ডা গলায়।

'কিছু না,' বললাম, 'শ্রেণীবৈষম্য দূর হবে খুব ভাল কথা ; কিন্তু শ্রেণী সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্য রকম। এই যেমন নিগ্রো, এখন তো ওটাই মস্ত ফ্যাশান, আমার ইচ্ছে ছিল, উদাহরণ হিসেবে একজন নিগ্রো—যাকে আমি খুব ভালভাবে চিনি, তাকে মায়ের কাছে নিয়ে যেতে।—আর ভেবে দেখো, নিগ্রোদের মধ্যেই কয়েকশো শ্রেণী আছে। কমিটির কাজের অভাব কোনদিনই হবে না। কিংবা আছে বেদে,' বললাম, 'মায়ের উচিত ওদের কাউকে চায়ে নিমন্ত্রণ করা। সোজাসুজি রাস্তা থেকে ডেকে আনা। কাজ অনেক আছে।'

'ও ব্যাপারে তোর সঙ্গে কথা বলতে আমি আসিনি,' বলল বাবা।

আমি চুপ করে গেলাম। আমার দিকে তাকিয়ে বাবা বলল, 'আমি তোর সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে কথা বলতে চাই।' আমি চুপ করেই থাকলাম। 'আমার মনে হচ্ছে, তুই বেশ একটু বিব্রত আছিস। কিছু একটা বলবি তো।'

'বিব্রত কথাটা সুন্দর। আমি খুব সম্ভব একবছর কিছু করতে পারব না। এই দেখ।' আমি প্যাণ্টটা গুটিয়ে আমার ফুলে ওঠা হাটুটা দেখালাম, প্যাণ্টটা নামিয়ে ডান হাতের আঙুল দিয়ে বাঁদিকের বুক দেখিয়ে বললাম, 'আর এখানটায়।'

'কি সর্বনাশ,' বলে উঠল বাবা, 'হার্ট?'

'হ্যাঁ,' বললাম, 'হার্ট।'

'আমি ড্রোম্যার্টকে টেলিফোন করে বলব তোকে দেখতে। ও আমাদের সবচেয়ে ভাল হার্ট স্পেশালিস্ট।'

'ভুল করছ,' বললাম 'ড্রোম্যার্টকে দেখানোর দরকার নেই।'

'তুই তো বলছিলি, হার্ট।'

'হয়তো আত্মা. অন্তর বলা উচিত ছিল—তুমি হার্ট বললে, তাই।'

'ও, তাই বল,' বাবা বলল শুকনো গলায়, 'সেই ঘটনা।' সমারউইল্ড নিশ্চয় ভদ্র সমিতিতে স্কাট খেলতে খেলতে, খরগোসের মাংস, বীয়ার আর তিন গোলাম ছাড়া হরতন সোলোর ফাঁকে 'ঘটনাটা' বলেছে।

উঠে দাঁড়াল বাবা, শুরু করল পাইচারি করতে, তারপর দাঁড়াল সোফার পেছনে, সোফায় ভর দিয়ে আমার দিকে তাকাল।

'নিশ্চয় অদ্ভুত লাগবে শুনতে,' বলল, 'এখন যদি একটা মস্ত কথা বলি; কিন্তু জানিস, তোর কি দরকার? তোর দরকার তাই, যা একটা পুরুষকে পুরুষ করে—নিজেকে মানিয়ে নেয়া।'

বললাম, 'ও কথা আমার আজ একবার শোনা হয়ে গেছে।'

'তাহলে তৃতীয়বার শোন, নিজেকে মানিয়ে নে।'

'বাদ দাও,' ক্লান্ত গলায় বললাম।

'তুই কি কল্পনা করতে পারিস, লেয়ো যখন এসে বলল, সে ক্যাথলিক হবে তখন আমার কী অবস্থা! হেনরিয়েটের মৃত্যুর সমান ব্যথা পেয়েছিলাম আমি—ও যদি এসে বলত, ও কম্যুনিস্ট হবে, তো এত দুঃখ পেতাম না। সেটা বুঝতে পারি, অল্প বয়সের দুঃস্বপ্ন, সামাজিক অধিকার, ইত্যাদি। কিন্তু তাই বলে,'—

সোফাটা আঁকড়ে ধরে প্রচণ্ডভাবে মাথা নাড়তে থাকল বাবা। 'তাই বলে—না, না।' মনে হল সত্যিই খুব কষ্ট পাচ্ছে, একদম ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল তাকে, আরো অনেক বুড়ো মনে হচ্ছিল।

'বসো বাবা,' বললাম, 'এবার ব্র্যাণ্ডি খাও।' বাবা বসল, ব্র্যাণ্ডির বোতলের দিকে ইঙ্গিত করল, আমি সাইডবোর্ড থেকে একটা গ্লাস এনে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দিলাম, বাবা ব্র্যাণ্ডিটা নিয়ে খেল, আমাকে চিয়ার্স বা ঐ জাতীয় কিছু না বলেই। 'তুই নিশ্চয় তা বুঝতে পারছিস না,' জিজ্ঞেস করল।

'না,' আমি বললাম।

'কোনও জোয়ান ছেলে ওতে বিশ্বাস করলেই আমার আতঙ্ক হয়,' বলল বাবা। 'আর তাই আমার অত বিশ্রী লেগেছিল। কিন্তু, তাও আমি নিয়েছি। মানিয়ে নিয়েছি। তাকিয়ে দেখছিস কি?'

'আমি তোমাকে একটা কথা বলব।' বললাম, 'তোমাকে টেলিভিশনে দেখে ভেবেছিলাম, তুমি মস্ত এক অভিনেতা। চাইকি একটুখানি ক্লাউনও।'

বাবা আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল, প্রায় ক্ষুণ্ণ। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'না, সত্যি, পাপা, চমৎকার।' পাপা শব্দটা আবার খুঁজে পেয়ে আমার খুব ভাল লাগল।

'ওরা আমাকে স্রেফ ওতে জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েছে,' বলল বাবা।

'তোমাকে মানায় খুব ভাল,' আমি বললাম, 'আর তোমার অভিনয়-ও হয় সুন্দর।'

'আমি অভিনয় করি না,' বাবা বলল গম্ভীরভাবে, 'আদৌ না, আমার অভিনয় করার দরকার হয় না।'

বললাম, 'তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পক্ষে মুশকিলের কথা।'

'আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই,' বাবা রেগে বলল।

'সে আরও মুশকিলের কথা, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পক্ষে,' বললাম।

বাবা আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল, তারপর হেসে বলল, 'কিন্তু, আমি সত্যিই কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি না।'

'আমি যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী মুশকিলের কথা,' আমি বললাম, 'যাদের সঙ্গে তুমি সব সময় অর্থ প্রসঙ্গে কথা বল, তারা কি আদৌ জানে না যে, আসল ব্যাপারটা তোমরা সবসময় চেপে যাও—নাকি টেলিভিশন-পর্দায়

সম্মোহিত হবার আগে তোমাদের মধ্যে বলা কওয়া হয়ে থাকে ?'

বাবা আর খানিকটা ব্র্যান্ডি ঢেলে নিয়ে আমার দিকে প্রশ্নভরা চোখে তাকাল, বলল, 'আমি তোর সঙ্গে তোর ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

'একটু দাঁড়াও,' বললাম, 'আমার খুব ইচ্ছা করছে জানতে, কিভাবে কর। তোমরা সবসময় বলো শতকরা হিসাবের কথা, দশ, কুড়ি, পাঁচ, পঞ্চাশ ভাগ—কিন্তু তোমরা কখনও বলো না, কিসের শতকরা কত ভাগ ?' বাবাকে প্রায় বোকার মত লাগল, ব্র্যান্ডিটা নিয়ে খেল আর আমার দিকে তাকাল।

'মানে,' আমি বললাম, 'অঙ্ক তেমন শিখিনি, তবে জানি, আধ পেনীর শতকরা একশো ভাগ আধ পেনী, আবার একশো কোটির শতকরা পাঁচভাগ পাঁচ কোটি··· বুঝতে পারছ কি বলতে চাইছি ?'

'ঈশ্বর !' বাবা বলল, 'তোর এত সময় হয় টেলিভিশন দেখার ?'

বললাম, 'হ্যাঁ, সেই ঘটনার পর থেকে, তুমি যেমন বলো ওটা, আমি প্রায়ই টেলিভিশন দেখি—তাতে আমি বেশ ফাঁকা হয়ে যাই। একদম ফাঁকা, আর যে ছেলে তার বাবাকে তিন বছরে একবার দেখতে পায় সে কোথাও একটা পাব-এ, বীয়ার খেতে খেতে, আধো অন্ধকারে তাকে এক আধবার টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পেলে খুশী তো হয়ই। অনেক সময় তোমাকে নিয়ে আমার খুব গর্ব হয়, তুমি কেমন চমৎকার বাধা তৈরী কর যাতে কেউ শতকরার সংখ্যাটা জিজ্ঞেস না করতে পারে।'

'তুই ভুল করছিস,' ঠাণ্ডা গলায় বলল বাবা, 'আমি আদৌ বাধার সৃষ্টি করি না।

'আচ্ছা, তোমার খারাপ লাগে না, কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলে ?'

বাবা উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে বিরক্ত চোখে তাকিয়ে থাকল। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। দুজনেই নিজ নিজ সোফার পেছনে দাঁড়ালাম, সোফার পেছনে হাত রাখলাম দুজনেই। আমি হেসে বললাম, 'ক্লাউন হিসেবে আধুনিক মূকাভিনয়ে আমার স্বভাবতই খুব উৎসাহ। একবার, আমি একটা পাব্-এর পিছন দিককার একটা ঘরে একা বসেছিলাম। তখন আমি শব্দের সুইচটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। দারুণ। বেতননীতিতে, অর্থনীতিতে আর্ট—বিশুদ্ধ আর্ট-এর পায়ের জোরে প্রবেশ। আফসোসের কথা, তুমি আমার 'ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং' মূকাভিনয় কখনও দেখনি।'

শোন্, শুনে হয়ত উৎসাহ বোধ করবি,' বাবা বলল, 'আমি গেনেহোল্মুস্-

এর সঙ্গে তোর সম্বন্ধে কথা বলেছি। আমি ওকে অনুরোধ করেছি, তোর কয়েকটা অভিনয় দেখতে আর আমাকে একটা বিশেষজ্ঞের অভিমত (এক্সপার্ট ওপিনিয়ন) দিতে।'

আমার হঠাৎ একটা হাই উঠল। অসভ্যতা কিন্তু চাপতে পারলাম না। আমার এই অসৌজন্যতার কারণ আমি সম্পূর্ণ জানি। গতরাত্রে ভাল ঘুম হয়নি আর সারাটা দিন বিশ্রী কেটেছে। যেখানে বাবার সঙ্গে তিনবছর বাদে দেখা হচ্ছে, এবং যেখানে জীবনে এই প্রথমে তার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি, সেখানে হাই তোলা একদম মানায় না। আমি অত্যন্ত অস্থির ছিলাম আর দারুণ ক্লান্ত। আমার সত্যিই খারাপ লাগছিল যে এই সময়েই আমাকে হাই তুলতে হচ্ছে, গেনেহোল্‌ম্‌ নামটা আমার মধ্যে ঘুমের ওষুধের কাজ করেছে। আমার বাবা এবং তার শ্রেণীর লোকেদের সবসময় সবচেয়ে ভালটা চাই, পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল হার্ট স্পেশালিস্ট ড্রোম্যার্ট, জার্মানীর সবচেয়ে ভাল থিয়েটার সমালোচক গেনেহোল্‌ম্‌, সবচেয়ে ভাল দর্জি, সবচেয়ে ভাল শ্যাম্পেন, সবচেয়ে ভাল হোটেল, সবচেয়ে ভাল লেখক। কেমন যেন একঘেয়ে। আমার হাই তোলাটা প্রায় রোগের মত দাঁড়াল, মুখের মাংসপেশীগুলিতে শব্দ হতে শুরু করল। গেনেহোল্‌ম্‌ সমকামী, তবু তার নামটা আমার অবসন্ন ভাবটা কাটাতে পারল না। সমকামীরা বেশ মজার হতে পারে, কিন্তু ঐ মজার লোকেদেরই আমার একঘেয়ে মনে হয়, বিশেষ করে মাথায় ছিট থাকলে, আর গেনেহোল্‌ম্‌ শুধু সমকামীই নয়, ছিটগ্রস্তও বটে। মায়ের দেওয়া পার্টিতেই বেশীর ভাগ আসত সে, আর বসত লোকের একদম গা-ঘেঁষে। এত কাছে যে মাঝে মাঝে ওর নিশ্বাসের গন্ধ পেতে হতো আর ওর আগে-খাওয়া-খাদ্যের ভাগ নিতে হতো। শেষ যেবার আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়, চার বছর আগে, তখন ও আলুর স্যালাড খেয়ে এসেছিল, আর সেই গন্ধের ফলে ওর টকটকে লাল ভেস্ট আর মধুর রঙের মেফিস্টোফেলিসের মত গোঁফে ওকে আদৌ বিলাসী বলে মনে হয়নি। লোকটা মজার, সবাই জানত লোকটা মজার। কাজেই তাকে সবসময় 'মজার' ভাবটা বজায় রাখতে হত। কী ক্লান্তিকর জীবন।

'মাপ করো', বললাম, যখন ঠিক বুঝতে পারলাম হাই তোলার হাত থেকে তখনকার মত রেহাই পেয়েছি, 'গেনেহোল্‌ম্‌ কি বলল ?' আমার বাবা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সবসময়েই তাই, মনোযোগ না দিলেই ওরকম। বাবা আমার হাই তোলাতে প্রত্যক্ষ কষ্ট পায়নি। পেয়েছে পরোক্ষ কষ্ট। মাথা নাড়ল, সেই

আমার খাবারের প্লেট দেখে যেমন নেড়েছিল। 'গেনেহোল্‌মে তোর উন্নতি উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে, ও তোর শুভাকাঙ্ক্ষী।'

বললাম, 'একটা সমকামী কখনই আশা ছাড়ে না—সে অদ্ভুত নাছোড়বান্দা হয়।'

'ওসব বাদ দে,' বাবা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোর ভাগ্য ভাল যে এরকম একজন প্রভাবশালী আর পারদর্শী শুভাকাঙ্ক্ষী তোর পেছনে আছে।'

'আমি তো ভীষণ খুশী,' বললাম।

'তবে তুই এতদিন যা করে এসেছিস সে-ব্যাপারে ওর অনেক কিছু বলার আছে। ও বলছে, তোর ঐ যাবতীয় মূক ভাঁড়ামি ছাড়তে হবে। মূক কৌতুক অভিনয়ে অবশ্য তোর প্রতিভা আছে, তবে সেটা তেমন ভাল নয়—আর ক্লাউন তোর দ্বারা হবে না। ওর ধারণা, তোর সম্ভাবনা আছে মূকাভিনয়ে…আমার কথা আদৌ শুনছিস্‌?' বাবার গলায় আরও বিরক্তি ফুটছে।

বললাম, 'বল, আমি প্রতিটা শব্দ শুনেছি। প্রত্যেকটা বুদ্ধিদীপ্ত, সঠিক শব্দ, আমি চোখ বন্ধ করে আছি বলে কিছু মনে করো না।'

গেনেহোল্‌ম্‌-এর কথা যখন বলছিল বাবা, আমি চোখ বন্ধ করে ছিলাম। বেশ ভাল লাগছিল, আর আমাকে ঐ গাঢ় বাদামী রঙের শেল্‌ফটা দেখতে হচ্ছিল না, ওটা বাবার পেছনের দেয়ালে। একটা কুৎসিত আসবাব, কেমন যেন স্কুলের বলে মনে হয়। ওই গাঢ় বাদামী রঙ, কালো কালো হাতল, ওপরের ধার ঘেঁষে হালকা হলুদ দাগ। ওটা মারীদের বাড়ি থেকে এসেছিল।

'ঠিক আছে,' আবার বললাম আস্তে, 'তুমি বলে যাও।' ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল, পেটে যন্ত্রণা হচ্ছিল, মাথা ধরেছিল। আর আমি এমনভাবে ওখানে ওই সোফার পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম যে আমার হাঁটু আরও ফুলতে শুরু করেছিল। বন্ধ চোখের পেছনে দেখছিলাম আমার মুখ, হাজারবার ট্রেনিং-এর সময় ও মুখ দেখেছি, সম্পূর্ণ স্থির, বরফের মত সাদা রঙ করা, চোখের পাতাও নড়ে না, ভ্রু-ও না, শুধু চোখ দুটো, আস্তে আস্তে ও দুটোকে আমি এদিক ওদিক করছিলাম, যেন একটা ভীত খরগোস ছানা, সেই ভাবটা আনবার জন্য, গেনেহোল্‌ম্‌-এর মত সমালোচকরা যাকে 'পশুদের বিপদ প্রত্যক্ষ করাবার বিস্ময়কর ক্ষমতা' বলত। আমি মরে গেছি, আর হাজার ঘণ্টার জন্য আমার মুখের সঙ্গে আমি বন্দী—মারীর চোখে নিজেকে উদ্ধার করবার কোনও উপায় নেই।

'বল না,' আমি বললাম।

'ও আমাকে পরামর্শ দিল তোকে সবচেয়ে ভাল শিক্ষকদের কারো কাছে পাঠাতে। এক বছর, দু বছর, অন্তত ছ'মাসের জন্য। গেনেহোলম্‌ বলছে, তোর মনঃসংযোগ চাই, পড়াশুনা করতে হবে, সচেতনতার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছতে হবে তোকে, যাতে আবার শিশুর মত অজ্ঞান হতে পারিস। আর ট্রেনিং, ট্রেনিং, ট্রেনিং—আর, শুনছিস ?' বাবার গলা, ভগবান বাঁচিয়েছে, অনেকটা মৃদু হয়েছে।

'হ্যাঁ', বললাম, 'শুনছি।'

'আর আমি সে খরচ চালাতে রাজী।'

আমার মনে হল যে আমার হাঁটুটা ফুলে ঢোল হয়েছে, গ্যাসের মিটারের মত। চোখ না খুলেই হাতড়ে হাতড়ে সোফার সামনে এলাম, বসলাম, অন্ধের মত হাতড়াতে থাকলাম সিগারেটের জন্য। আমার বাবা একটা আতঙ্কিত চিৎকার তুলল। আমি এত ভাল অন্ধের অভিনয় করতে পারি যে লোকে ভাববে আমি বুঝি সত্যিই অন্ধ। নিজেকে অন্ধই মনে হচ্ছিল, বোধহয় অন্ধই থেকে যাব। আমি অন্ধের অভিনয় করছিলাম না, করছিলাম এমন অভিনয় যেন এইমাত্র অন্ধ হয়ে গেছি, আর যখন আমি একটা সিগারেট অবশেষে মুখে দিলাম, টের পেলাম বাবার লাইটারের আগুন, এও টের পেলাম, বাবার হাত ভীষণ কাঁপছে।

'এই ছেলে,' আতঙ্কিত গলায় বলল বাবা, 'তোর শরীর খারাপ নাকি ?'

'হ্যাঁ,' বললাম আস্তে, সিগারেটে টান দিলাম, ধোঁয়াটা সম্পূর্ণ গিলে নিলাম। 'শরীর খুব খারাপ, কিন্তু অন্ধ নই। পেটের যন্ত্রণা, মাথার যন্ত্রণা, হাঁটুর যন্ত্রণা, একটা প্রচণ্ড বিষাদ ক্রমশ বাড়ছে, কিন্তু সবচেয়ে বিশ্রী হচ্ছে যে, আমি জানি, গেনেহোলম্‌ ঠিক বলেছে, প্রায় শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ঠিক, তাছাড়া আমি এও জানি, ও আর কি কি বলেছে। ও কি ক্লাইস্টের কথা বলেছে ?'

'হ্যাঁ,' বলল বাবা।

'বলেছে কি যে আগে আমাকে আমার অন্তরটা হারাতে হবে, সম্পূর্ণ ফাঁকা হতে হবে, তবেই আবার কিছু করতে পারব। বলেছে সে কথা ?'

'হ্যাঁ', বাবা বলল, 'তুই জানলি কোথা থেকে ?'

বললাম, 'হা ভগবান, আমি তো জানি ও-থিয়োরি, আর এও জানি, ও তা কোথায় পেয়েছে। কিন্তু আমি আমার অন্তর হারাতে চাই না, আমি তাকে

ফিরে পেতে চাই।'

'তুই তাকে হারিয়েছিস ?'

'হ্যাঁ।'

'ও কোথায় ?'

'রোমে', বললাম, বলে চোখ দুটো খুলে হাসলাম।

বাবা সত্যি সত্যিই ভয়ে ফ্যাকাশে আর বুড়ো হয়ে গেছে। বাবার হাসিটা নিশ্চিন্ত অথচ বিরক্ত।

'তুই, হতচ্ছাড়া', বলল সে, 'সবটাই তবে তোর অভিনয় ?'

বললাম, 'দুঃখের কথা, সবটা নয় আর ভালও নয়। গেনেহোলুম্ বলবে, তবুও বড্ড স্বাভাবিক, ঠিকই বলবে। সমকামীরা বেশীর ভাগ সময়ে ঠিক বলে, ওদের একটা অস্বাভাবিক রকমের অনুভূতির ক্ষমতা আছে—আবার নেই-ও। যাই হোক।'

'হতভাগা, তুই', বাবা বলল, 'তুই আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি।'

'না', বললাম, 'একটা সত্যিকারের অন্ধ যতটা পারত, তার চেয়ে বেশি ভয় তোমাকে আমি পাওয়াতে পারিনি। বিশ্বাস কর, প্রতিটা হাতড়ানো বা কিছুর ওপর ভর দেওয়া, করতেই হবে তা নয়। অনেক অন্ধ লোকেই, সত্যি সত্যি অন্ধ হয়েও, অন্ধের অভিনয় করে। আমি এক্ষুনি তোমাকে এখন থেকে ওই দরজা পর্যন্ত দাপাদাপি করতে করতে গিয়ে দেখতে পারি, তাতে তুমি এত কষ্ট পাবে, এত দয়া হবে তোমার যে তুমি সঙ্গে সঙ্গে একজন ডাক্তার ডাকবে ; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সর্জেনকে, ফ্রেৎস্যারকে। দেখাব ?' আমি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

'না, থাক', কষ্ট পেয়ে বলল বাবা। আমি আবার বসলাম।

'তুমিও বসো', বললাম 'তুমি ওরকম দাঁড়িয়ে থাকলে আমার অস্বস্তি লাগে।'

বাবা বসল, গ্লাসে মিনারাল ওয়াটার ঢালল, আমার দিকে তাকাল, কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। বলল, 'তোর ব্যাপার-স্যাপার বোঝা দায়, আমাকে একটা স্পষ্ট জবাব দে তো। তোর শেখার খরচ আমি দেব, সে তুই যেখানে খুশি যেতে চাস। লণ্ডন, প্যারিস, ব্রাসেলস। সবচেয়ে ভালটাই এখন কাজ চলার মত।'

'না', বললাম ক্লান্তভাবে, 'ওটাই হবে সবচেয়ে বড় ভুল। আমার আর শিখে লাভ নেই, কেবল কাজ করতে হবে। শিখেছি যখন আমি তের চোদ্দ ছিলাম,

একুশ বছর বয়স অবধি। তোমরা কেবল তা খেয়াল করনি। আর গেনেহোলম্ যদি বলে থাকে যে আমাকে এখন আরও শিখতে হবে, তবে ওকে আমি যতটা বোকা ভাবতাম, ও তার চেয়ে বেশি বোকা।'

'ও একজন বিজ্ঞ লোক', বলল বাবা, 'আমার চেনা যত লোক আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ।'

'হয়ত ওর চেয়ে ভাল নেই', বললাম, 'কিন্তু ও কেবলই বিজ্ঞ—থিয়েটার ট্র্যাজেডি, কমেডি, মূকাভিনয় ভাল বোঝে। কিন্তু একবার তাকিয়ে দেখ, ওর নিজস্ব কমেডিয়ান হবার চেষ্টাগুলোর অবস্থা, যখন ও হঠাৎ বেগুনী রঙের জামা আর কালো সিল্কের রেডিমেড বো লাগিয়ে আসে। একটা আনাড়িও ওরকম করতে লজ্জা পাবে। সমালোচকরা খুঁতখুঁতে হয়, সেটা খারাপ নয়, কিন্তু ওরা যে নিজেদের ব্যাপারে সব খুঁতখুঁতি ভুলে যায় আর রসকসহীন হয়ে পড়ে—জঘন্য। ও এসব বোঝে, ঠিক কথা,—কিন্তু যখন বলে, ছ'বছর স্টেজে কাটাবার পর আবার আমার শেখার দরকার—যত্তোসব!'

'তোর তাহলে টাকার দরকার নেই?' জিজ্ঞেস করল বাবা।

বাবার গলায় একটা ছোট্ট স্বস্তির ছোঁয়ায় আমার সন্দেহ হল। বললাম, নিশ্চয়, আমার টাকার দরকার আছে।'

'কি করবি তাহলে? আবার স্টেজে যাবি, এই অবস্থায়?'

'কোন অবস্থায়?' জিজ্ঞেস করলাম।

অপ্রস্তুতভাবে বলল, 'না, তোর কাগজওয়ালাদের তো তুই চিনিস।'

'আমার কাগজওয়ালা?' বললাম, 'গত তিনমাস ধরে আমি কেবল মফস্বলের স্টেজে উঠেছি।'

'আমি ওটা জোগাড় করেছি', বলল সে, 'গেনেহোলম্-এর সঙ্গে ওটা নিয়ে আলোচনা করেছি।'

'কি সর্বনাশ', বললাম, 'ওর জন্য ওকে কত দিলে?'

বাবা লাল হয়ে উঠল, 'ওসব কথা বাদ দে। বেশ, তুই কি করতে চাস?'

'ট্রেনিং', বললাম, 'ছমাস এক বছর, এখনও সঠিক জানি না।'

'কোথায়?'

বললাম, 'এখানে, আবার কোথায়?' বাবা তার আতঙ্কটা চাপতে চাইল, কিন্তু পারল না।

বললাম, 'আমি তোমাদের বোঝা হব না, তোমাদের পরিচর্যাও নেব না,

এমনকি বাড়িতে কোন ভোজের আয়োজন হলে তাতেও আসব না,' বললাম আমি। বাবা লাল হয়ে উঠল। আমি দু একবার ওদের ভোজসভায় গেছি, আর সকলের মত। যাকে বলে ব্যক্তিগত ভাবে যাওয়া, ওদের কাছে সেভাবে যাইনি। ককটেল খেয়েছি আর জলপাই খেয়েছি আর চা খেয়েছি। যাবার সময় সিগারেট পকেটে পুরেছি এমন খোলাখুলি ভাবে যে, চাকর-বাকররা দেখে লজ্জায় সরে গেছে।

আমার বাবা কেবল বলল, 'আঃ!' তারপর সোফায় একটু নড়ে বসল। বাবার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল উঠে গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়ায়। কেবল চোখ নামিয়ে বলল, 'গেনেহোলমে্ যেমন বলেছে সেই রকম করলেই বরং আমার ভাল লাগত। কি হবে না হবে সঠিক না জেনে তার অর্থ যোগান দিতে আমার মন চায় না। তুই কি কিছুই জমাস নি? একবছর তো ভালই রোজগার করেছিস।'

'এক ফেনিও জমাইনি' বললাম, 'আমার কাছে একটি মাত্র মার্ক আছে।' মার্কটা পকেট থেকে বার করে দেখালাম। বাবা সত্যি সত্যিই ওটার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখল, যেন দেখবার মত একটা পোকা।

'তোকে বিশ্বাস করা কঠিন,' বলল বাবা, 'তোকে আর যাই হোক অমিত-ব্যয়িতার শিক্ষা দিইনি। তোর মাসে কত লাগবে, কিছু ভেবেছিস?'

আমার বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করে উঠল। আমি ভাবিনি যে, বাবা এত সোজাসুজি সাহায্য করতে চাইবে। ভাবলাম খুব বেশী দরকার নেই, আবার খুব কমও না, তবে যথেষ্ট চাই। কিন্তু আমার কোনও ধারণা ছিল না, সামান্যতম ধারণাও ছিল না আমার কত দরকার হতে পারে। ইলেকট্রিসিটি, টেলিফোন, আর আমাকে তো যাহোক করে বেঁচে থাকতে হবে। উত্তেজনায় ঘেমে গেলাম। বললাম, 'প্রথমত একটা পুরু গদী চাই রবারের, এই ঘরটার সমান, সাত বাই পাঁচ, ওটা তুমি তোমাদের রাইনিশেন গুমিবে আরবাইটুংস্ ফ্যাক্টরি থেকে সস্তায় যোগাড় করে দিতে পার।'

'বেশ তো,' হেসে বলল বাবা, 'ওর জন্য তোর দাম দিতে হবে না। সাত বাই পাঁচ—কিন্তু গেনেহোলমে্ বলছিল, কসরৎ করে তোর নিজেকে নষ্ট করা ঠিক হবে না।'

'করব না, পাপা,' বললাম, 'গদীটা ছাড়া আমার মাসে হাজার মার্ক মত লাগবে।'

'হাজার মার্ক!' উঠে দাঁড়াল বাবা, ভীষণ আতঙ্কিত, ঠোঁট কাঁপছে।

'বেশ তো,' জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি ভেবেছিলে ?' আমার কোনও ধারণাই নেই, বাবার কত টাকা আছে। এক বছর ধরে হাজার মার্ক—ততটা হিসাব আমি জানি—হল গিয়ে বারো হাজার মার্ক, আর তাতে বাবার মরে যাবার কথা নয়। বাবা সত্যি সত্যিই কোটিপতি, সেটা আমাকে মারীর বাবা নিখুঁতভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল আর আমাকে হিসেব করে দেখিয়ে দিয়েছিল। আমার আজ ঠিক মনে পড়ছে না। বাবার সর্বত্রই শেয়ার আছে আর 'হাত আছে'। এমনকি ঐ স্নানের লোশনেও।

বাবা সোফার পেছনে পাইচারি করতে লাগল, খুব শান্তভাবে, ঠোঁট নড়ছিল, যেন হিসাব কষছে। হয়ত সত্যি সত্যিই হিসাব কষছে, কিন্তু বড্ড বেশী সময় নিচ্ছিল। মনে পড়ল, যখন মারীর সঙ্গে বন্ থেকে পালিয়ে যাই, ওরা কেমন নীচ ব্যবহার করেছিল। বাবা আমাকে লিখেছিল, নীতিগত কারণে আমাকে কোনও রকম সাহায্য দিতে তিনি রাজী নন। আর আমার কাছে আশা করে-ছিল যে আমি 'গায়ে খেটে' যেন নিজের 'আর ওই হতভাগ্য ভাল মেয়েটির, যাকে ভুল পথে নিয়ে গেছ' তার সংস্থান করি। বুড়ো ভেয়ারকুমকে সে নাকি, আমার তা জানা কথা, বরাবর নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং মানুষ বলে চিন্তায় উঁচু স্থান দিয়ে এসেছে, আর ওটা নাকি একটি কেচ্ছা।

আমরা কোলন-এহ্‌রেনফেল্ড্-এ একটা মেস বাড়িতে থাকতাম। মারীর মা ওর জন্য যে সাতশো মার্ক রেখে গিয়েছিল, তা একমাসেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, আমার মনে পড়ছে, হিসেব করে ভেবেচিন্তে খরচ করেছিলাম।

এহ্‌রেনফেল্ড্ স্টেশনের কাছে থাকতাম আমরা। আমাদের ঘরের জানালা দিয়ে দেখতাম রেলের লাল ইঁটের প্রাচীর, কয়লা বোঝাই মালগাড়িগুলো যেত শহরে, ফিরে আসত খালি, সান্ত্বনা পাবার মত দৃশ্য, বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে তোলবার মত শব্দ, আমাকে সব সময় মনে করিয়ে দিত আমাদের বাড়ির অঢেল সম্পদের কথা। বাথরুমের জানালা দিয়ে দেখা যেত কাপড় কাচবার টিনের গামলা আর কাপড় শুকোবার দড়ি, অন্ধকারে মাঝে মধ্যে শোনা যেত ঠোঙাভর্তি জঞ্জাল বা খালি টিন পড়বার শব্দ—কেউ লুকিয়ে জানালা দিয়ে চত্বরে ফেলছে। আমি প্রায়ই বাথটবে শুয়ে থাকতাম আর লিটার্জিক্যাল* গান গাইতাম, একদিন আমাদের বাড়িওয়ালী আমাকে গান গাইতে নিষেধ করে দিল—'সবাই ভাববে আমি এক পতিত পাদ্রীকে ঘর ভাড়া দিয়েছি'—তারপর ধারে গরম জল দেয়া বন্ধ

* গীর্জার পের সাধারণ ভজন গান।

করে দিল। ওর মতে আমি অত্যন্ত বেশী স্নান করতাম, ওর মতে ওটা বাড়াবাড়ি। মাঝে মাঝে সে নিচে গিয়ে একটা লোহার শিক দিয়ে উঠোনে ফেলা জঞ্জালগুলো খুঁচিয়ে দেখত, ওগুলো থেকে তাদের মালিককে ধরবার আশায়—পেঁয়াজের খোসা, ভেজানো কফির গুঁড়ো, কাটলেটের হাড়, এইসব নানান ধরনের সূত্র ধরে প্রায়ই কসাইখানায়, সব্জীর দোকানে গিয়ে খোঁজ করত—কখনও সুরাহা কিছু হত না। কে ফেলেছে জঞ্জাল ঘেঁটে তা কিছুতেই বার করতে পারত না। শুকোতে দেয়া কাপড় বোঝাই আকাশের দিকে তাকিয়ে এমন ভাব করে ভয় দেখাত যে প্রত্যেকেরই মনে হতো বুঝি তাকেই বলছে—'আমাকে ফাঁকি দেয়া অত সোজা নয়, আমি জানি, এ কার কাজ।' সকালের দিকে আমরা জানালার সামনে শুয়ে থাকতাম পিওনের আশায়, মাঝে মধ্যে আমাদের প্যাকেট আসত, মারীর বান্ধবীরা, লেয়ো, আন্না পাঠাত, আর ঠাকুর্দা পাঠাত চেক, ন'মাসে ছ'মাসে, কিন্তু আমার বাবা-মা কেবল সাবধানবাণী ঝাড়ত, 'আমার ভাগ্য যেন নিজের হাতে নিই, নিজের ক্ষমতায় অপকর্ম থেকে যেন উদ্ধার পাই।'

পরে মা তো একবার লিখেই ছিল, 'সে আমাকে নাকি ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে'। মায়ের রুচিহীনতা নির্বুদ্ধিতার পর্যায় পর্যন্ত যেতে পারে। শ্নীৎসলার-এর একটা উপন্যাস থেকে মা ওই কথা ক'টা নেয়, উপন্যাসের নাম 'বিখণ্ডিত হৃদয়'। ওই উপন্যাসের বাবা-মা তার মেয়েকে 'ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল', কারণ একটা বাচ্চাকে জন্ম দিতে অস্বীকার করেছিল সে, বাচ্চাটার উৎস ছিল একজন 'মানী কিন্তু বাজে শিল্পী',—একজন অভিনেতা। মা সেই উপন্যাসের অষ্টম অধ্যায় থেকে একটা লাইন হুবহু তুলে দিয়েছিল, 'আমার বিবেক আমাকে বাধ্য করছে তোমাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে'। মা ভেবেছিল, ওটা সুন্দর উদ্ধৃতি। যাই হোক, আমাকে 'ঠেলে সরিয়ে' দিয়েছিল মা। আমি ঠিক জানি, মা ওরকম লিখেছিল কারণ তাতে তার বিবেক এবং ব্যাঙ্কের পাশ বই, দুইই রেহাই পেয়েছে। বাড়িতে ওরা ভেবেছিল, আমি বুঝি একটা বীরত্বপূর্ণ জীবন শুরু করব, একটা খনিতে কাজ নেব আমার ভালবাসার ধনকে বাঁচাবার জন্য। আর ওরা সবাই যখন দেখল আমি তা করলাম না, ওরা সবাই হতাশ হয়েছিল। এমনকি লেয়ো আর আন্নাও লুকোবার চেষ্টা করেনি। ওরা মনে মনে দেখে নিয়েছিল, ভোরের অন্ধকারে আমি স্যান্‌ডউইচ আর থারমোফ্লাস্ক নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, যাওয়ার সময় মারীর জানালা লক্ষ্য করে একটা চুমু ছুঁড়ে দিচ্ছি, আবার সন্ধ্যায় সময়

'ক্লান্ত অথচ সন্তুষ্ট' মনে ফিরে আসছি, খবরের কাগজ পড়ছি আর মারীর উলবোনা দেখছি। কিন্তু, ওদের এই ধরনের কল্পনাকে জীবন্ত রূপ দেবার সামান্য চেষ্টাও আমি করিনি। আমি মারীর কাছেই ছিলাম। মারীও চাইত যে আমি বরং ওর কাছেই থাকি। আমি নিজেকে শিল্পী মনে করতাম (শেষের দিকটার চেয়ে অনেক বেশী)। আমরা আমাদের ছেলেমানুষী ধারণায় বোহেমিয়ান জীবনকে সত্যি করে তুলেছিলাম, দেয়ালে কুলুঙ্গিতে মদের বোতল রেখে আর চট আর রঙিন দড়ির পর্দা ঝুলিয়ে। ঐ বছরগুলোর কথা ভাবলে আমি আজও আবেগে ছলছলিয়ে উঠি। মারী যখনই সপ্তাহশেষে বাড়িওয়ালীর কাছে যেত, ভাড়া মেটাবার কিছু সময় চাইতে, বাড়িওয়ালী প্রত্যেকবারই ঝগড়া শুরু করত আর জিজ্ঞেস করত, আমি কেন তবে কাজ করতে যাই না। আর মারী ওর করুণ মরমী গলায় বলত, 'আমার স্বামী একজন শিল্পী, হ্যাঁ, একজন শিল্পী।' একবার শুনেছিলাম ও নোংরা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বাড়িওয়ালীর খোলা দরজার দিকে বলছে, 'হ্যাঁ, একজন শিল্পী', আর বাড়িওয়ালী তার ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উত্তর দিয়েছিল, 'কী, শিল্পী?' বাড়িওয়ালী সবচেয়ে বেশী বিরক্ত হতো আমরা দশটা এগারোটা অবধি বিছানায় শুয়ে থাকতাম বলে। ওর সহজ হিসাবটা মাথায় আসত না যে, আমরা ও-ভাবে একবারের খাওয়া আর হিটারের ইলেকট্রিক খরচ বাঁচাতাম। সে জানতো না যে, বারোটার আগে আমি গীর্জার হলঘরে ট্রেনিং-এর জন্য যেতে পারতাম না; কারণ সকালের দিকে সব সময়েই কিছু না কিছু লেগে থাকত সেখানে—মাতৃমঙ্গল, কম্যুনিয়ন শিক্ষা, রন্ধন শিক্ষা বা কোন ক্যাথলিক বস্তিসমিতির উপদেশসভা। আমরা একটা গীর্জার কাছে থাকতাম, হাইনরিখ বেহ্‌লেন সেখানে কাপলান* ছিল। ওই গীর্জার ছোট্ট হলঘরে একটা স্টেজ ছিল, ওখানে সে আমাকে ট্রেনিং-এর সুবিধাজনক ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। মেস বাড়ির খবরটাও পেয়েছিলাম ট্রেনিং-এর জন্য। সে সময় অনেক ক্যাথলিক আমাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করত। যে মহিলাটি ওখানে 'রন্ধন শিক্ষা' নিত, সে আমাদের সব সময় যা বাঁচত তার কিছু খেতে দিত, বেশীর ভাগ সময়েই পেতাম স্যুপ আর পুডিং, মাঝেমধ্যে মাংসও। আর মারী কখনো তাকে গোছগাছ করতে সাহায্য করলে সুবিধামত এক প্যাকেট মাখন অথবা এক ঠোঙা চিনি গুঁজে দিত। আমি যখন ট্রেনিং শুরু করতাম,

* গীর্জার প্রার্থনা পরিচালক।

কখনও কখনও তখন মহিলাটি সেখানে থেকে যেত, ট্রেনিং দেখতে দেখতে হাসির চোটে পেট চেপে ধরত আর বিকেলের দিকে কফি করে দিত। যখন জানতে পেরেছিল যে, আমাদের বিয়ে হয়নি, তখনও আমাদের সঙ্গে সে ভাল ব্যবহার করেছে। আমার ধারণা হয়েছিল যে, শিল্পীরা 'ঠিক বিয়ে' করে না বলেই সে ধরে নিয়েছিল। কোনও কোনও দিন, যখন শীত পড়ত, আমরা সকাল সকাল ওখানে যেতাম। মারী রন্ধন-শিক্ষার ক্লাস করত, আর আমি ক্লোকরুমে ইলেকট্রিক হিটারের কাছে বসে পড়তাম, হাল্কা দেয়ালের মধ্য দিয়ে শুনতে পেতাম ও-পাশের হলঘরের খিলখিল হাসি, তারপর ক্যালরী, ভিটামিন, হিসাব ও এসব নিয়ে গম্ভীর বক্তৃতা। সব মিলিয়ে ওখানকার ব্যাপারটা আমার বেশ মজারই মনে হতো। মাতৃমঙ্গল-এর সময় সব শেষ না হওয়া অবধি আমরা ওখানে যেতে পারতাম না। অল্প বয়সী লেডি ডাক্তার, যে ওখানে পরামর্শ দিত সে খুব কড়াকাড়ি করত। অবশ্য ভদ্রভাবে, তবে তার নিজস্ব ধরনে। তার প্রচণ্ড ভয় ছিল, আমি স্টেজে লাফালাফি করবার সময় যে ধুলো উড়ত, সেই ধুলোকে। পরের দিকে তার ধারণা হয়েছিল, এই ধুলো পরের দিনও ভেসে বেড়ায়, আর তা বাচ্চাদের পক্ষে খুব মারাত্মক। সে তারপর এমন ব্যবস্থা করেছিল যে, তার ওই মাতৃমঙ্গলের আগে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি ওই স্টেজ ব্যবহার করতে পারতাম না। হাইনরিখ বেহ্‌লেন তো তার পাদ্রীর সঙ্গে এ নিয়ে ঝগড়াটেই পড়েছিল। পাদ্রী জানত না যে, আমি রোজ ওখানে ট্রেনিং নিই। সে হাইনরিখকে সাবধান করে দিয়েছিল, 'বন্ধুত্বের বাড়াবাড়ি যেন না করে'। মাঝে মাঝে আমি মারীর সঙ্গে গীর্জাতেও যেতাম। ওখানটায় চমৎকার গরম। আমি বরাবর হিটার পাইপের ওপর বসতাম, ; সেখানটা সম্পূর্ণ শান্ত থাকত। বাইরের রাস্তার শব্দ মনে হতো বহুদূর থেকে আসছে। গীর্জাটাও ফাঁকা থাকত। বেশ ভাল লাগত—মাত্র সাতজন কি আটজন লোক। আমার মাঝে মাঝে গা শিরশির করত এই ভেবে যে, গুরুত্বপূর্ণ কোন মহিমময় গুণের অবশেষ ওই সমবেত বিবর্ণ ক'টা মানুষের সঙ্গে আমি যেন কখনো কখনো সামিল হয়ে যাচ্ছি। ওখানে মারী আর আমি ছাড়া কেবল বুড়ির দল। আর হাইনরিখ বেহ্‌লেন-এর অকরুণ ধরন ওই অন্ধকার কুৎসিত গীর্জার সঙ্গে খুব ভাল মানিয়ে যেত। একবার, ওর সহকারী সেদিন অনুপস্থিত, আমি প্রার্থনা অনুষ্ঠানের শেষে, ওকে সাহায্য করেছিলাম, যখন বইটা ডানদিক থেকে বাঁদিকে নিয়ে যাবার কথা। আমার হঠাৎ চোখে পড়েছিল হাইনরিখ কেমন থতমত খেয়ে গেল, ছন্দপতন হল তার, তখনি আমি

ছুটে গিয়েছিলাম। বলটা ডানদিক থেকে নিয়ে এসেছিলাম, খেলার মাঠের মাঝখানে এসে হাঁটু গেড়ে তারপর ওটা বাঁদিকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার নিজের কাছেই অসভ্যতা মনে হতো যদি আমি হাইনরিখকে ওর ওই অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে না বাঁচাতাম। মারী লাল টকটকে হয়ে উঠেছিল। হাইনরিখ মুচকে হেসেছিল। আমাদের পরিচয় অনেকদিনের। ও বোর্ডিং স্কুলে আমাদের ফুটবল টিমের ক্যাপটেন ছিল, বয়েসে আমার চেয়ে বড়। বেশীর ভাগই আমরা অনুষ্ঠানের শেষে গীর্জার চত্বরে হাইনরিখ-এর জন্য অপেক্ষা করতাম, ও আমাদের ব্রেকফাস্টে নিমন্ত্রণ করত, ছোট্ট একটা দোকান থেকে ধারে ডিম, হ্যাম, কফি আর সিগারেট কিনত। ওর বাসার কাজের লোকটা অসুস্থ হলে শিশুর মত খুশী হত সে।

আমাদের যারা সাহায্য করেছিল আমি তাদের সকলের কথা ভাবতাম। আর ওদিকে আমার বাড়িতে ওরা ওদের রপ্তি টাকার গদীতে বসে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়াটার নৈতিক কারণ উপভোগ করত। আমার বাবা তখনও সোফার পেছনে পাইচারি করছে আর ঠোঁট নেড়ে হিসাব করছে। ইচ্ছা হল বলি, চাই না তোমার টাকা, কিন্তু কি করে যেন আমার মনে হল আমার একটা অধিকার আছে ওর কাছ থেকে কিছু পাবার। আর একটা মাত্র মার্ক পকেটে নিয়ে এমন কোনও বীরত্ব দেখাতে চাই না, যাতে পরে আফসোস করতে হতে পারে। আমার সত্যিই টাকার দরকার। ভীষণভাবে দরকার। আমি বাড়ি ছেড়ে যাবার পর, বাবা আমাকে এক ফেনিও দেয়নি। লেয়ো আমাদের ওর পুরো পকেট খরচ দিয়েছে। আন্না মাঝে মাঝে ওর নিজের হাতে তৈরি রুটি পাঠিয়েছে, পরের দিকে ঠাকুর্দাও মাঝে মধ্যে টাকা পাঠিয়েছে,—পনের মার্ক, কুড়ি মার্কের এ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক। আর একবার কোনও এক কারণে, কারণটা আমি কোনদিন জানতে পারিনি, বাইশ মার্কের একটা চেক পাঠিয়েছিল। প্রত্যেকবার ওই চেক নিয়ে এক কাণ্ড হতো। আমাদের বাড়িওয়ালীর ব্যাঙ্কে কোনও এ্যাকাউণ্ট ছিল না, হাইনরিখেরও না, এ্যাকাউণ্ট পেয়ী চেকের ব্যাপারে আমাদের চেয়ে বেশী ও বুঝত না। প্রথম চেকটা ও সোজা ওর গীর্জার ওয়েলফেয়ার এ্যাকাউণ্টে জমা দিয়ে দিয়েছিল। ব্যাঙ্ক থেকে শুনে গিয়েছিল এ্যাকাউণ্ট পেয়ী চেকের সব বৃত্তান্ত। তার পর ওর পাদ্রীর কাছে গিয়ে একটা পনের মার্কের বেয়ারার চেক চেয়েছিল, তাতে পাদ্রী রাগে প্রায় ফেটে পড়ে অবস্থা। পাদ্রী হাইনরিখকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, সে বেয়ারার চেক দিতে পারে না ঃ তাকে কারণ দেখাতে হবে কি জন্য ওই চেক কাটা

হয়েছে। ওয়েলফেয়ার একাউন্ট একটা বড্ড ব্যাপার, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়, আর যদি সে লেখে, 'কাপ্লান বেহলেন-এর উপকারার্থে ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক-এর পরিবর্তে' তাহলে সে ঝামেলায় পড়বে, আর তাছাড়া ওয়েল ফেয়ার এ্যাকাউন্ট তো আর 'সন্দেহজনক' এ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক ভাঙাবার জন্য নয়। ঐ এ্যাকাউন্ট পেয়ী চেকটা সে কেবল একমাত্র কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে খ্রীয়ারের কাছ থেকে দান হিসেবে জমা করতে পারে, আর খ্রীয়ারকে সাহায্য হিসেবে, তাকে সে টাকা ওয়েলফেয়ার তহবিল থেকে দান হিসেবে দিতে পারে। সেটা সম্ভব। তবে তাও নাকি খুব নীতিসম্মত নয়। ঐ পনেরো মার্ক সত্যি সত্যিই হাতে পেতে সবশুদ্ধ দশদিন লেগেছে তার। কারণ হাইনরিখের আরও হাজারটা অন্য কাজ ছিল, আমার এ্যাকাউন্ট পেয়ী চেকের জন্য তো আর ও নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে পারে না। তারপর যতবারই ঠাকুর্দার কাছ থেকে চেক পেয়েছি, ততবারই একটা আতঙ্কের মধ্যে কেটেছে। সে একটা দুর্দশা, টাকা কিন্তু তবুও টাকা নয়, আর আমাদের তখন যা দরকার—পরিষ্কার টাকা, সে তো ওটা কখনোই নয়। শেষমেশ হাইনরিখ নিজে ব্যাঙ্কে একটা এ্যাকাউন্ট খোলে, আমাদের এ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক-এর বদলে বেয়ারার চেক দেবার জন্য। কিন্তু ও প্রায়ই তিন-চারদিনের জন্য বাইরে যেত, একবার ও তিন সপ্তাহের ছুটিতে বাইরে গেছে, আর তখন ঐ বাইশ মার্কের চেক এসে হাজির। অনেক খুঁজে আমার ছেলেবেলার বন্ধু এডগার হ্বীনেকেনকে বার করি। ও তখন কোন এক অফিসে বোধহয় এস-পি-ডির কালচারাল সেকশনে ছিল। ওর ঠিকানা পাই টেলিফোন ডাইরেক্টরীতে, কিন্তু ফোন করবার মত কুড়ি ফেনি পকেটে ছিল না, তাই কোলন এহ্‌রেনফেল্ড থেকে কোলন-কাল্ক অবধি হেঁটে যাই, কিন্তু ওর দেখা পাই না। রাত আটটা অবধি ওর বাড়ির দরজার সামনে বসেছিলাম, কারণ ওর বাড়িওয়ালী আমাকে ওর ঘরে ঢুকতে দিতে অস্বীকার করেছিল। ও থাকত একটা বেশ বড় আর বেশ অন্ধকার গীর্জার কাছে। এগ্রেলস্ট্রাসেতে (আজও জানি না এস-পি-ডিতে থাকবার জন্য ও এগ্রেলস্ট্রাসেতে থাকতে বাধ্য ছিল কিনা)। আমার তখন কাহিল অবস্থা, ভীষণ ক্লান্ত, খিদে পেয়েছে, সিগারেট ছিল না। আর জানতাম, মারী বাসায় বসে দুশ্চিন্তা করছে। কোলন-কাল্ক, এগ্রেলস্ট্রাসে, পাশে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী—একজন বিষাদবিলাসীর পক্ষে সুখী হবার মত দৃশ্য নয়। শেষমেশ একটা রুটির দোকানে গিয়ে দোকানের মহিলাটিকে একটা রুটি দিতে অনুরোধ করেছিলাম। মহিলাটির বয়স কম ছিল,

কিন্তু দেখতে সুন্দর ছিল না। দোকানটা একটু সময়ের জন্য একদম খালি না হওয়া অবধি অপেক্ষা করেছিলাম, তারপর ছুটে ভেতরে গিয়ে বলেছিলাম, গুড ইভনিং না বলেই, 'আমাকে একটা ছোট রুটি দিন।' আমার ভয় হচ্ছিল কেউ এসে পড়বে—মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়েছিল। ওর সরু বিবর্ণ ঠোঁট দুটো তখন আরও সরু হয়ে গিয়েছিল, তারপর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছে, তখন একটাও কথা না বলে সে একটা ঠোঙায় তিনটে ছোট রুটি আর একটুকরো কেক ভরে আমাকে দিয়েছিল। মনে হয় ঠোঙাটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে, যাবার সময় ধন্যবাদও বলিনি। এডগারের বাড়ির দরজায় বসে রুটি তিনটে আর কেকটা খেয়েছিলাম আর মাঝে মধ্যে পকেটের বাইশ মার্কের চেকটা হাত দিয়ে দেখছিলাম। বাইশ একটা অদ্ভুত সংখ্যা, আমি চিন্তা করে বার করতে চেষ্টা করছিলাম, কি করে ওরকমটা হল, বোধহয় কোনও এ্যাকাউন্টের অবশিষ্ট। বোধহয় ওটা এক রকমের ঠাট্টা, হয়ত বা দৈবাৎ, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপারটা হচ্ছে, অঙ্কে ২২ আবার অক্ষরেও বাইশ লেখা, ঠাকুরদা নিশ্চয় একটা কিছু ভেবেছিল। আমি তা কোনদিনই বার করতে পারিনি। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, আমি কাল্‌ক-এর এঙ্গেলস্‌ট্রাসেতে এডগারের জন্য মাত্র দেড়ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলাম—বাড়িগুলোর সামনের অন্ধকার, কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীর ধোঁয়া মনে হয়েছিল দুঃস্বপ্নে ভরা অনন্তকাল। এডগার আমাকে আবার দেখে খুশি হয়েছিল। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, আমার পিঠে চাপড় দিয়েছিল, আমাকে ওর ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে ব্রেখ্‌ট-এর একটা মস্ত ছবি ঝোলান ছিল, তার নিচে একটা গীটার আর একটা ওর নিজের হাতে তৈরি শেলফ্‌-এ অনেক পকেট সংস্করণের বই। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি বলে ওবাইরে ওর বাড়িওয়ালীকে বকাবকি করছিল, কানে এসেছে। তারপর ও মদ নিয়ে ফিরে এসেছে, খুশি মনে বলেছে, ও নাকি একটু আগেই 'সি. ডি. ইউ-এর নোংরা কুকুরগুলোর' সঙ্গে একটা তর্কাতর্কিতে জিতে এসেছে, তারপর আমাকে বলল, আমাদের শেষ দেখা হবার পর থেকে তখন পর্যন্ত আমি কি কি করেছিলাম তা বলতে। ছোটবেলায় বহু বছর আমরা একসঙ্গে খেলেছি। ওর বাবা ছিল সাঁতার শিক্ষক। পরে আমাদের বাড়ির কাছে খেলার মাঠের সুপারভাইজার হয়েছিল। আমি সংক্ষেপে কয়েক কথায় আমার অবস্থা ওকে বলে অনুরোধ করলাম চেকটা নিয়ে আমাকে টাকা দিতে। ও খুবই ভাল ব্যবহার করেছে। ও সব বুঝেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নগদ ত্রিশ মার্ক দিয়েছিল, চেকটা নিতেই চায়নি, কিন্তু আমি ওকে

চেকটা নিতে বাধ্য করেছিলাম। আমার মনে হয় ওকে চেকটা নিতে অনুরোধ করবার সময় প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলাম। ও একটু অসন্তুষ্টভাবেই চেকটা নিয়েছিল, আর আমি ওকে বলেছিলাম আমাদের ওখানে অবশ্যই একবার আসতে আর আমার ট্রেনিং দেখতে। কালক্-এর পোস্ট অফিসের কাছে ট্রাম স্টপ পর্যন্ত ও এসেছিল আমার সঙ্গে, কিন্তু আমি ওপাশে একটা খালি ট্যাক্সী দেখে ছুটে গিয়ে বসে পড়েছিলাম। এডগারের হতভম্ব, অসন্তুষ্ট, ফ্যাকাশে মস্ত মুখটাই কেবল চোখে পড়েছিল আমার। সেই প্রথম একটা ট্যাক্সী নিয়েছিলাম, আর যদি কারও কোনও দিন ট্যাক্সীর খুব প্রয়োজন হয়ে থাকে তবে সে সেই সন্ধ্যার আমি। সারা কোলন শহরটা ট্রামে ঢক্ ঢক্ করতে করতে পার হয়ে এসে আবার মারীর দেখা পেতে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করা আমার কিছুতেই সহ্য হতো না। ট্যাক্সীতে প্রায় আট মার্ক উঠেছিল আমি ড্রাইভারকে আরও পঞ্চাশ ফেনি বকশিস দিয়ে ছুটতে ছুটতে উঠেছিলাম আমাদের মেসের সিঁড়ি বেয়ে। মারী কাঁদতে কাঁদতে আমার গলা জড়িয়ে ধরেছিল, আর আমিও কেঁদেছিলাম। আমরা দুজনেই এত ভয় সহ্য করেছিলাম, যেন অনন্তকাল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম। আমরা এত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে চুমুও খাইনি, শুধুই চাপা গলায় বলেছিলাম, আর কখনও পরস্পরকে ছেড়ে যাব না, কখনও না, 'যতদিন না মৃত্যু আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়,' বলেছিল মারী। তারপর মারী 'তৈরি' হয়েছিল। 'তৈরি' হওয়াই বলত ও। গালে একটু পাউডার ঘষে নিয়েছিল, ঠোঁটে বুলিয়েছিল একটু লিপস্টিক। আমরা কেনলোয়ার প্লাসের একটা পাব্-এ গিয়েছিলাম, প্রত্যেকে ডবল 'গুলাস' খেয়েছিলাম, এক বোতল রেড-ওয়াইন কিনে ফিরেছিলাম বাসায়।

আমার ঐ ট্যাক্সী চড়া এডগার কোনদিন ক্ষমা করেনি। তারপর ওর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হতো। ও আরও একবার আমাদের অর্থ সাহায্য করেছিল, মারীর যেবার গর্ভপাত হয়। ও ঐ ট্যাক্সী চড়ার কথা কোনদিন বলেওনি, কিন্তু ওর মধ্যে একটা সন্দেহ রয়ে গিয়েছিল, সে আজও মুছে যায়নি।

'কি মুস্কিল,' বলল বাবা, জোরে আর অন্য এক স্বরে, বাবার এ স্বর আমি চিনি না, 'জোরে বলছি তো, আর স্পষ্ট করে বলছি। চোখ খোল, ওই কায়দায় আর ঘুমিয়ে হবে না।'

আমি চোখ খুলে বাবার দিকে তাকালাম। বাবা রেগে গেছে।

'কথা বলছিলাম বুঝি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ,' বলল বাবা, 'আপন মনে কি বিড়বিড় করছিলি যেন। কিন্তু একটা মাত্র কথা আমি বুঝেছিলাম; বারে বারেই বলছিলি, 'বন্দি টাকার গদী'।

'ওই একটা কথাই তুমি বুঝতে পার আর ওটাই তোমার বোঝা স্বাভাবিক।'

'আর এ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক কথাটাও বুঝেছি'—বলল বাবা।

'হুঁ, হ্যাঁ,' বললাম, 'এস, বস তো আবার, আর বল, তুমি কি ভেবেছ, এক বছর মাসে কত করে দেবে ঠিক করেছ?'

আমি বাবার কাছে গিয়ে হালকাভাবে কাঁধ ধরে চেপে বসিয়ে দিলাম তাকে সোফায়। বাবা সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে দাঁড়াল, তখন আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

'আমি সবটা ভাল করে ভেবে দেখলাম,' বাবা বলল আস্তে, 'যদি তুই আমার কথামত সুস্থ, সংযত শিক্ষার ব্যবস্থা মেনে নিতে না চাস আর এখানে ট্রেনিং করতে চাস···তাহলে আমি ভেবে দেখলাম মাসে দুশো মার্কই যথেষ্ট। আমি ঠিক জানি, বাবা আড়াইশো বা তিনশো বলতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে দুশো বলেছে। আমার মুখের চেহারা দেখে বাবা ঘাবড়ে গেছে মনে হল। বাবার আদবকায়দায় যেমন মানায় তার চেয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'গেনেহোলম্ বলছিল, সংযম নাকি মূকাভিনয়ের মূল কথা।' তবুও কিছু বললাম না। আমি শুধু তাকিয়ে থাকলাম। 'ফাঁকা চোখে', ক্লাইস্ট-এর পুতুলের মত। আমার একবিন্দু রাগ হয়নি, কেবল একরকম অবাক লাগল, যার ফলে, আমার কষ্ট করে শেখা 'ফাঁকা চোখে তাকানো', নিজ থেকেই এসে গেছে। বাবা অস্বস্তিতে পড়ল, ওপরের ঠোঁটে হালকা ঘাম দেখা দিয়েছে। আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া তবুও রাগ নয় বা তিক্ততা নয় কিংবা ঘৃণাও নয়। আমার ফাঁকা-চোখ আস্তে আস্তে করুণায় ভরে উঠল।

'শোন বাবা' আস্তে বললাম, 'দুশো মার্ক নেহাত কম নয়, তুমিও তো তাই ভাবছ মনে হচ্ছে। ওটা বেশ অনেক টাকা, ও নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, কিন্তু এটা তো জান যে, সংযম এমন একটা মজার ব্যাপার যাতে অর্থের প্রয়োজন, অন্ততপক্ষে সেই সংযম যার কথা গেনেহোলম্ বলেছে। ও আসলে বলতে চেয়েছে খাওয়া-দাওয়ার সংযম, শুধু সংযম নয়—প্রচুর চর্বিহীন মাংস আর সব্জি—সংযমের সবচেয়ে সস্তা চেহারা হচ্ছে না খেয়ে থাকা, অথচ একজন ক্ষুধার্ত ক্লাউন—যাই হোক, মাতাল ক্লাউনের চেয়ে ভাল।' আমি সঙ্গে

বললাম, বাবার অত কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার কষ্ট হচ্ছিল, এত কাছে যে আমি বাবার ঠোঁটের ঘামের বিন্দুগুলোকে বড় হতে দেখতে পাচ্ছিলাম।

'শোন এবার', আবার বললাম, 'আমরা, ভদ্রলোকদের যেমন মানায়, আর টাকা পয়সা নিয়ে কথা বলব না, এস, অন্য কথা বলি।'

'কিন্তু আমি তোকে সত্যি সত্যিই সাহায্য করতে চাই', হকচকিয়ে গিয়ে বলল বাবা, 'আমি তোকে খুশি মনে তিনশো মার্ক দিতে চাই।'

'আমি এখন টাকা পয়সা সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই না,' বললাম, 'আমি তোমাকে শুধু জানাতে চাই, কি রকম অবাক হবার মত অভিজ্ঞতা আমার ছেলেবেলায় হয়েছে।'

'কি রকম?' জিজ্ঞেস করল বাবা, এবং আমার দিকে তাকাল যেন মৃত্যুদণ্ড আশঙ্কা করছে। বোধহয় ভেবেছিল, ওর নিজের সেই বান্ধবীর জন্য গোডেস-ব্যার্গ-এ যে একটা ভিলা বানিয়ে দিয়েছে, তার কথা বলব।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, তুমি অবাক হবে শুনে, আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের সবচেয়ে অবাক অভিজ্ঞতা এই যে, আমরা বাড়িতে গেলবার মত যথেষ্ট খাদ্য পাইনি।'

আমি 'গেলা' শব্দটা ব্যবহার করাতে বাবা মিইয়ে গেল, ঢোক গিলল, দাঁত কিড়মিড় করে হাসল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুই বলতে চাস, তোদের ঠিক পেট ভরেনি?' বললাম 'ঠিক তাই', শান্তভাবে বললাম, 'আমাদের কোনদিন ঠিক পেট ভরেনি, অন্ততপক্ষে বাড়িতে নয়। আমি আজও জানি না, কারণটা কৃপণতা, না নীতি ছিল। কৃপণতা জানতে পারলেই আমার বরং ভাল লাগবে—কিন্তু তুমি কি জান, সারা বিকেল সাইকেল চড়া, ফুটবল খেলা, রাইনে সাঁতার কাটার পর একটা বাচ্চা ছেলের কি হয়?'

'ধরে নিচ্ছি, খেতে ইচ্ছে হয়,' বাবা বলল ঠাণ্ডা গলায়।

'না,' বললাম, 'খিদে হয়। মুশকিলের কথা, ছেলেবেলায় আমরা কেবল জানতাম আমরা বড়লোক, খুব বড়লোক—কিন্তু সে অর্থের কিছুই আমরা পাইনি—এমনকি ঠিকমত খেতে পর্যন্ত না।'

'তোদের কখনও কোনও ব্যাপারে কমতি ছিল?'

'ছিল,' বললাম, 'বললাম তো, খাদ্যে—আর তাছাড়া পকেট খরচে। জান, ছেলেবেলায় কি খেতে আমার সবচেয়ে বেশি ইচ্ছা হতো?'

'হায় ভগবান,' বলল বাবা উৎকণ্ঠিতভাবে, 'কি?'

'আলু,' বললাম, 'কিন্তু মায়ের মাথায় তখন রোগা হবার বাতিক—তুমি জান তো, মা সব সময় অতিরিক্ত আধুনিক চিন্তা করত,—আর আমাদের বাড়িতে অনবরত একটা না একটা গাধামার্কা বাচাল গুজগুজে ফিসফিস করত, প্রত্যেকেরই একটা করে নিজস্ব থিয়োরি ছিল খাদ্য সম্বন্ধে, কিন্তু দুঃখের কথা কারও থিয়োরিতেই আলুর কোনও স্থান ছিল না। তোমরা বাড়ি না থাকলে রান্নাঘরের ঝি-রা মাঝে-মধ্যে নিজেদের জন্য রান্না করত—আলু সেদ্ধ—মাখন, নুন আর পেঁয়াজ দিয়ে। কখনও কখনও ওরা আমাদের ডাকত আর আমরা পাজামা পরা অবস্থায় নিচে গিয়ে পেট পুরে আলু খেতাম, শর্ত ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু বলা হবে না। প্রায়ই শুক্রবার করে আমরা হ্বীনেকেনদের ওখানে যেতাম, যেখানে সব সময় আলুর স্যালাড পেতাম, আর মিসেস হ্বীনেকেন আমাদের প্লেট-এ বিশেষ করে বেশি বেশি আলু দিত। আমাদের বাড়িতে কখনই যথেষ্ট রুটি থাকত না ঝুড়িতে। যা সামান্য থাকত তা রুটি না ছাই, একটা জঘন্য কটকটে ব্যাপার, কিম্বা দু-এক টুকরো রুটি, যেগুলো 'স্বাস্থ্যের কারণে' আধা শুকনো থাকত। যখন হ্বীনেকেনদের ওখানে যেতাম আর এডগার হয়ত তখন সবে টাটকা রুটি এনেছে, ওর মা বাঁ হাত দিয়ে আস্ত রুটিটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে ডানহাত দিয়ে রুটি কাটত আর আমরা সেগুলো লুফে নিয়ে তাতে আপেলের জেলি মাখাতাম।

আমার বাবা অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল। সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিলাম। একটা নিল, আমি আগুন দিলাম। বাবার জন্য কষ্ট হচ্ছে। একজন বাবার পক্ষে তার প্রায় আঠাশ বছর বয়স হয়ে যাওয়া ছেলের সঙ্গে জীবনে প্রথম ঠিকমত আলোচনা করা নিশ্চয় কঠিন। 'আরও হাজারটা জিনিস,' বললাম, 'যেমন ফুল, বেলুন। মায়ের মতে বেলুনটা অপচয়। ঠিক। বেলুন অপচয়, কিন্তু তোমাদের ঐ বস্তাপচা লক্ষ লক্ষ মার্ক বেলুন করে আকাশে উড়িয়ে দিতে আমাদের অপচয়ের তৃষ্ণায় কুলোত না। আর ঐ সস্তা লজেন্স, ও ব্যাপারে মায়ের এক বিশেষ সুচিন্তিত পথ ছিল ভয় দেখাবার, যাতে মনে হতো, ওগুলো বিষ, খাঁটি টাটকা বিষ। কিন্তু তা বলে আমাদের ভাল লজেন্স দেয়নি, যেগুলো বিষ নয়। পরিবর্তে আমাদের কিছুই দেয়নি। বোর্ডিং স্কুলে সবাই অবাক হত,' বললাম আস্তে, 'আমিই একমাত্র লোক যে খাবার নিয়ে কখনও গজগজ করিনি, সব খেয়ে ফেলতাম আর খাবার চমৎকার লাগত।'

'তাহলে দেখ,' বাবা উদাস গলায় বলল, 'অন্তত ওর একটা উপকারের দিকও আছে।' যেভাবে বলল তাতে বিশেষ সন্তুষ্ট বা আদৌ খুশি শোনাল না।

'হ্যাঁ', বললাম, 'ঐ থিয়োরেটিক্যাল শিক্ষামূলক ব্যবস্থাটার দাম নিয়ে আমার কাছে সম্পূর্ণ কোন সংশয় নেই, কিন্তু ওসবই থিয়োরি, কিন্তু পরেরটা কি জান, সবই থিয়োরি, ওই শিক্ষা, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, রসায়ন—সবই একটা সাংঘাতিক ন্যাকামি। আমি জানতাম হ্বানেকেনদের ওখানে মাইনের দিন কবে, শুক্রবার করে। খ্রীষ্টমাস আর হোলারাথদের বেলাতেও জানা যেত মাসের প্রথমে না পনেরো তারিখে ওরা মাইনে পাচ্ছে—তখন একটা বিশেষ কিছু হতো, প্রত্যেকের জন্য বেশ মোটা একটুকরো সসেজ, কিম্বা কেক, আর কাউ হ্বানেকেন প্রত্যেক শুক্রবার সকালে হেয়ার গ্রেসারের কাছে যেত, কারণ সন্ধ্যের দিকে—হ্যাঁ, তুমি হয়ত বলবে, ভেনাসকে অর্ঘ্য দেওয়া হতো।'

'কি', বাবা চিৎকার করে উঠল, 'তা বলে তুই নিশ্চয় বলতে চাস না…' বাবা লাল হয়ে উঠল, আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে থাকল।

'হ্যাঁ', বললাম, 'আমি ঠিক তাই বলতে চাই। শুক্রবার করে বিকেলে ছেলে-মেয়েদের সিনেমায় পাঠানো হতো। তার আগে ওরা আইসক্রীম খেতে যেত, যাতে অন্তত সাড়ে তিন ঘণ্টা ওরা বাড়ির বাইরে থাকে, মা আসত হেয়ার গ্রেসারের ওখান থেকে, বাবা আসত মাইনে নিয়ে বাড়িতে। তুমি জান, সাধারণ লোকেদের বাসা তত বড় নয়।' 'তুই বলতে চাস', বাবা বলল, 'তুই বলতে চাস, তোরা জানতিস বাচ্চাদের কেন সিনেমায় পাঠান হতো?'

'সঠিক নিশ্চয়ই জানতাম না,' বললাম, 'আর, সবটা আমার পরে মনে হয়েছে, যখন ওকথা ভাবতাম—আর তারও অনেক পরে বুঝতে পেরেছি, যখন আমরা সিনেমা থেকে ফিরে আলুর স্যালাড খেতে বসতাম তখন কাউ হ্বানেকেনকে কেন সব সময় অদ্ভুত লাল দেখাত। তারপর যখন হেয়ার হ্বানেকেন খেলার মাঠের সুপারভাইজার হল, তখন সব অন্যরকম—তখন তো বেশীর ভাগ সময়ে বাড়িতেই থাকত। ছেলেবেলায় মনে হতো ওদের কি যেন একটা কষ্ট—পরে বুঝতে পেরেছি, কেন। কিন্তু একটা বড় ঘর আর একটা রান্নাঘরওয়ালা ফ্ল্যাটে, তিন বাচ্চা নিয়ে—কোনও উপায় ওদের ছিল না।'

বাবা এত অভিভূত হয়ে পড়ল যে আমার ভয় হল, এখন আবার টাকা পয়সার কথা তুললে সেটা ওর কাছে রুচিহীন মনে হবে। আমাদের এই সাক্ষাৎ বাবার কাছে বেদনাদায়ক মনে হয়েছে, কিন্তু এই বেদনাকে এক মহৎ পর্যায়ের দুর্দশা হিসাবে একটু উপভোগ করতেও শুরু করেছে ওর থেকে একটু স্বাদ পেতে। এখন আবার সেই মাসিক তিনশো মার্ক যে

আমাকে দিতে চেয়েছিল সেই প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনা বেশ কঠিন হবে। টাকা পয়সার ব্যাপারটা কতকটা ঐ 'রক্তমাংসের প্রয়োজনের' মত। কেউ সে বিষয়ে কথা বলে না, চিন্তাও করে না তাকে ঠিক, তবে ওটা হয়—মারী যেমন পাদ্রীদের রক্তমাংসের প্রয়োজনের ব্যাপারে বলেছিল—'প্রচ্ছন্ন' রাখা হয়। অথবা কার্য বলে বিবেচনা করা হয়, কখনোই সে মুহূর্তে যেমন, তেমন কিছুতেই ভাবা হয় না—খাদ্য বা ট্যাক্সী, এক প্যাকেট সিগারেট বা বাথরুমওয়ালা ঘর।

বাবার কষ্ট হচ্ছে, তা স্পষ্ট এবং বেদনাদায়ক। জানালার দিকে গেল, পকেট থেকে রুমাল বার করে দু এক ফোঁটা চোখের জল মুছল। আমি আগে কখনও দেখিনি বাবাকে কাঁদতে আর রুমাল ব্যবহার করতে। প্রত্যেক-দিন সকালে দুটো কাচা রুমাল বার করে দেয়া হতো তাকে, সন্ধ্যের সময় সে-দুটো একটু কোঁচকানো, আর বোঝবার মত ব্যবহার না করা অবস্থায় নিজের বাথরুমে ব্যবহার-করা কাপড়-চোপড়ের ঝুড়িতে ফেলে দিত। এক সময়, সাবান সহজে পাওয়া যেত না, তখন, আর মায়ের সঞ্চয় মনোবৃত্তি বলে মা বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে তর্ক করত, রুমাল অন্ততপক্ষে দুই কি তিনদিন রাখা যায় কিনা। তুমি তো কেবল সঙ্গেই নাও। ঠিক নোংরা হয় না ওগুলো কখনও—আর সমাজের প্রতিও তো একটা কর্তব্য আছে।' মা চেষ্টা করেছিল 'অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম'-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। কিন্তু বাবা, আমার যতদূর মনে পড়ে সেই প্রথম, সে-সব কথা না শুনে সেই একই কথা বলেছিল, সকালে দুটো কাচা রুমালই চাই আমার। আমি কোনও দিন বাবার নাকে মুছবার মত এক ফোঁটা জল বা ধুলো দেখিনি। এখন জানালায় দাঁড়িয়ে শুধু চোখের জলই মুছছে না, ওপরের ঠোঁটের ঘামের মত সামান্য জিনিসও মুছছে। বাবা তখনও কাঁদছে দেখে আমি রান্নাঘরে গেলাম, আমি একটু আধটু ফোঁপানোর শব্দও শুনতে পেলাম। এমন লোক খুব কম আছে মানুষের কাঁদবার সময় যাদের কাছে পেতে চাওয়া যায়, আর মনে হয়েছে, প্রায় অপরিচিত নিজের ছেলে সেখানে সবচেয়ে কম প্রত্যাশিত কেউ। আমি নিজে কেবল একজনকেই জানি, যার সামনে আমি কাঁদতে পারি—মারী। আমি জানি না, বাবার বান্ধবী সে রকম কিনা, যার সামনে বাবা কাঁদতে পারে। দেখেছি তাকে মাত্র একবার। মিষ্টি এবং সুন্দরী আর কেমন ভাল লাগবার মত বোকা মনে হয়েছে, তবে শুনেছি অনেক কথা তার সম্বন্ধে। আত্মীয় স্বজনরা তাকে অর্থলোভী বলত, তবে আমাদের আত্মীয় স্বজনরা তাকেই অর্থলোভী মনে

করত, সে নির্দোষের মত বলত যে, একজন মানুষের মাঝে মধ্যে পান ভোজন করতে হয়, আর জুতো কিনতে হয়। কেউ যদি মনে করে—সিগারেট, গরম জলে স্নান, ফুল, মদ বেঁচে থাকবার জন্য অবশ্য প্রয়োজন, তবে তার যাবতীয় সম্ভাবনা আছে, 'উন্মাদ অপচয়কারী' নাম পাবার। আমার ধারণা, বান্ধবী রাখা ব্যয়সাপেক্ষ—তাকে তো মোজা, পোশাক কিনতে হবে, বাসভাড়া দিতে হবে আর সব সময় উৎফুল্ল থাকতে হবে, তা কেবল সম্ভব সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আর্থিক অবস্থায় থাকলে, ওটা বাবার কথা। যখন বাবা জঘন্য, বৈচিত্র্যহীন ডিরেক্টার বোর্ডের মিটিং-এর পর তার কাছে যাবে, তখন বান্ধবীকে তো হাসিখুশী থাকতে হবে, সুন্দর গন্ধ থাকতে হবে গায়ে, চুলের থাকতে হবে চমৎকার ঢঙ। আমি ভাবতে পারি না, মহিলাটি অর্থলোভী। খুব সম্ভব ব্যয়সাপেক্ষ এই যা; কিন্তু আমাদের আত্মীয়-স্বজন মহলে ওটাই হল গিয়ে অর্থলোভী। আমাদের মালী হেঙ্কেলস্ মাঝে মধ্যে বুড়ো ফুরমানকে সাহায্যও করত। সে যদি হঠাৎ কখনও কোনও বিস্ময়কর প্রতিভা বশে বলে বসত, সে আমাদের কাছ থেকে যে মাইনে পায় সাধারণ মজুরদের মজুরী প্রকৃত পক্ষে কত বছর আগে থেকেই তার চেয়ে বেশি, তবে মা 'কিছু লোকের অর্থ লোভ' বিষয়ে তীক্ষ্ন স্বরে দুঘণ্টা ধরে বক্তৃতা শোনাত তাকে। মা একবার আমাদের ডাক পিওনকে নববর্ষে পঁচিশ ফেনি বখশিস দিয়েছিল। তার পরদিন যখন সেই পঁচিশ ফেনি খামের মধ্যে ভরা অবস্থায় মা ফেরত পেল, সঙ্গে একটা চিরকুট—পিওনটা লিখেছিল, "মহামান্যাসু, প্রাণে ধরে আমি কিছুতেই আপনাকে নিঃস্ব করতে পারব না"; তখন মা রেগে আগুন। ডাক মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারীর সঙ্গে মায়ের জানাশোনা ছিল, স্বাভাবিক। তার কাছে মা তৎক্ষণাৎ অর্বাচীনদের 'অর্থলোভ' ব্যাপারে নালিশ করেছিল।

রান্নাঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি উল্টেপড়া কফির বন্যার একটা ব্যবস্থা করলাম, বাথরুমে গিয়ে বাথটবের ছিপিটা খুলে দিলাম, আর তখন আমার মনে পড়ল, বেশ কয়েক বছর বাদে আমি লরেটানিক লিটানী না গেয়েই আজ প্রথম স্নান করছি। বাথটবের জল কমে যাচ্ছে, আমি বাথটবের গায়ের সাবানের ফেনা শাওয়ারটা দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে 'টানটুম এরায়োগা'-টা গুনগুন করে গাইলাম। 'লরেটানিক লিটানী'টাও একবার চেষ্টা করলাম। ঐ ইহুদী মেয়ে আমার বরাবরই ভাল লাগে, অনেক সময় গল্প বিশ্বাসও করতাম। কিন্তু

প্রোটেস্টানিক [illegible] কোনও সুবিধা হল না, ওরা বড্ড বেশী ক্যাথলিক, আর আমার রাগ ক্যাথলিসম্ আর ক্যাথলিকদের ওপর। ঠিক করলাম, হাইনরিখ বেলেনকে ফোন করতে হবে আর কার্ল এমন্ডস্‌কে। দু বছর আগে কার্ল এমন্ডস্-এর সঙ্গে আমার একটা বিশ্রী ঝগড়া হয়েছিল। সেই থেকে ওর সঙ্গে কোন কথা হয়নি—আর চিঠি আমরা কোনদিনই লিখিনি। ও আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিল। কারণটা অত্যন্ত সাধারণ। মারী তার 'চক্রে' গিয়েছিল আর কার্ল গিয়েছিল সাবিনের সঙ্গে সিনেমায়। তাই ওদের সবচেয়ে ছোট ছেলেকে পাহারা দিতে হয়েছিল আমাকে, সে সময় সেই একবছরের গ্রেগরকে একটা কাঁচা ডিম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়েছিলাম। সাবিনে আমাকে বলেছিল দশটার সময় দুধ গরম করে বোতলে ভরে গ্রেগরকে খাওয়াতে। ঐ বাচ্চাটাকে আমার বড্ড ফ্যাকাশে আর দুর্বল মনে হয়েছিল (বাচ্চাটা কাঁদতোও না; কেমন একটা হেঁচকি টানার মত শব্দ করত, কষ্ট হতো দেখলে) তাই ভেবেছিলাম, দুধের সঙ্গে একটা কাঁচা ডিম মিশিয়ে খাওয়ালে হয়তো ভাল হবে। দুধ গরম করতে বসিয়ে ওকে কোলে নিয়ে রান্নাঘরে পাইচারি করতে করতে ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, 'নাঃ, আমাদের সোনামণি এখন কি খাবে, কি দেব তাকে আমরা—একটা ডিম,' ইত্যাদি। তারপর ডিম ভেঙে মিক্সারের মধ্যে দিয়ে তারপর সেটা গ্রেগরের দুধে মিশিয়ে দিয়েছিলাম। কার্ল-এর অন্যসব বাচ্চারা খুব ঘুমোচ্ছিল, গ্রেগরের সঙ্গে আমি একা ছিলাম রান্নাঘরে, আর আমি যখন ওকে বোতলটা দিই, তখন আমার মনে হয়েছিল, ডিমমেশানো দুধটা ও খুব খুশী হয়ে খাচ্ছে। ও হাসছিল আর হেঁচকি টানার মত কান্না না কেঁদে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কার্ল সিনেমা থেকে ফিরে রান্নাঘরে ডিমের খোসা দেখতে পেল, বসবার ঘরে তখন আমি সাবিনের পাশে বসে। ও এসে বলল, 'ভালই করেছিস ডিমটা তৈরি করে খেয়ে।' আমি বললাম, 'ডিমটা আমি নিজে খাইনি, গ্রেগরকে দিয়েছি'—আর যায় কোথা, সঙ্গে সঙ্গেই ঝড় উঠল, গালাগালির বন্যা বয়ে চলল। সাবিনে পাগলা হয়ে গিয়েছিল, আমাকে বলেছিল 'খুনী'। কার্ল চেঁচিয়ে গালাগালি করেছিল, 'বেটা বাউণ্ডুলে—বেশ্যার ছাগল'। আর তাতে আমি এত ক্ষেপে গিয়েছিলাম যে আমি ওকে 'জরদগব মাস্টার' বলে ওভারকোট টেনে নিয়ে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছি তখনও ও আমাকে চিৎকার করে গাল পাড়ছিল, 'বেটা কাণ্ডজ্ঞানহীন ভিখিরী'। আর আমি চেঁচিয়ে বলেছিলাম, একটা বাতিকগ্রস্ত কিপ্‌টে তুই, তুই একটা '—'। বাচ্চাদের আমার

সত্যি ভাল লাগে, আর ওদের সঙ্গে বেশ মিশতেও পারি, বিশেষ করে কচি বাচ্চা। আমি ভাবতেই পারি না যে, একটা একবছরের বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে একটা ডিমে; কিন্তু কার্ল যে আমাকে 'বেশ্যার ছাগল' বলেছিল, তা স্যাবিনের 'খুনী'র চেয়ে বেশি লেগেছিল আমার। উত্তেজিত মা কিছু বললে উপেক্ষা করতে হয়, কিছু মনে করতে নেই। কিন্তু কার্ল বেশ ভালভাবেই জানে আমি 'বেশ্যার ছাগল' নই। আমাদের সম্পর্কের মধ্যে একটা অদ্ভুত রেষারেষি ছিল। বোকার মত। কারণ ও মনে মনে আমার ঐ 'স্বাধীন জীবন' 'চমৎকার' মনে করত, আর আমি মনে মনে ওর বুর্জোয়া জীবনে আকর্ষণ বোধ করতাম। আমি ওকে বোঝাতেই পারিনি, কীরকম প্রায় প্রাণ-ওষ্ঠাগত স্বচ্ছন্দ-জীবন আমার, কীরকম খুঁটিনাটি ব্যাপারেও অতি সতর্ক—ট্রেনজার্নি, হোটেল, ট্রেনিং শো, লুডোখেলা আর বীয়ার খাওয়া। আর ওর ঐ জীবন, বিশেষ করে ঐ বুর্জোয়া জীবন আমাকে টানত। ও-ও স্বভাবতই ভাবত আর সকলের মত, আমাদের নিজেদের ইচ্ছেতেই কোনও বাচ্চা হয়নি, মারীর গর্ভপাত ব্যাপারে ওর 'সন্দেহ'; ও জানত আমাদের বাচ্চার কী শখ। এসব সত্ত্বেও আমি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি আমাকে ফোন করতে বলে। ওর কাছ থেকে তা বলে ধার নেব না। ইতিমধ্যে ওর চারটে বাচ্চা, আর টাকাপয়সার খুব টানাটানি।

বাথটবটা আর একবার ধুলাম, সাবধানে করিডরে গিয়ে বসবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে দেখলাম—বাবা আবার টেবিলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। এখন আর কাঁদছে না। বাবার ঐ লাল নাক, ভাঁজপড়া ভেজা গাল, এসব মিলিয়ে বাবাকে দেখাচ্ছে কোনও এক বুড়োর মত। ঠাণ্ডায় জমে গেছে, কীরকম অদ্ভুত ফাঁকা আর প্রায় বোকা। আমি একটু ব্র্যাণ্ডি ঢেলে বাবাকে দিলাম। বাবা ওটা নিয়ে খেল। তখনও মুখের বিস্ময়কর বোকা ভাবটা রয়ে গেল। গ্লাসটা খালি করার ধরনে কেমন যেন প্রায় বুদ্ধিহীন ভাব, বাবার মধ্যে আমি কোনদিন ও-রকম দেখিনি। চুপচাপ অসহায় চোখে অনুরোধের ভঙ্গিতে গ্লাসটা এগিয়ে ধরল। বাবাকে দেখে মনে হল যেন লোকটার জীবনে আর কিছুতেই ঝোঁক নেই। কেবল ডিটেকটিভ গল্প, বিশেষ একপদের ওয়াইন আর বাজে ঠাট্টা ছাড়া কোনও কিছুতেই না। কোঁচকানো ভেজা রুমালটা টেবিলের ওপর ফেলে রেখেছে। আমার কাছে মনে হল, বিরাট একটা ভুল বাবার স্বভাবের বিরুদ্ধে, গোঁরাতুঁমি নয়—যা একটা বেয়াদপ বাচ্চা করে। হাজার বার টেবিলে রুমাল রাখতে নেই বলা সত্ত্বেও আমি আরও খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দিলাম। বাবা ব্র্যাণ্ডিটা খেয়ে

এমন একটা ভঙ্গি করল যার একটাই মাত্র অর্থ হয় আমার কাছে, 'আমার ওভার-কোটটা এনে দে।' আমি তা উপেক্ষা করলাম। বাবাকে আবার কোনরকমে টাকা পয়সার কথায় আনতে হবে। মার্কটা বার করে একটু জাগলিং দেখানোর চেয়ে আর ভাল কিছু মনে পড়ল না। আমি মার্কটাকে ডান হাত উঁচু করে গড়িয়ে নামতে দিলাম—তারপর সেই একই পথে আবার ফেরত। এই কায়দা দেখে বাবা যে মজা পেল তার প্রকাশটা দেখাল যন্ত্রণার মত। আবার মার্কটা ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে সেটা লুফে নিলাম। কিন্তু বাবা তার সেই আগের ভঙ্গিই আবার করল, 'আমার ওভারকোটটা।' আমি মার্কটা আবারও ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিলাম, প্রায় ছাদ অবধি, লুফে নিলাম ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে আর সেটাকে উঁচু করে ধরলাম, প্রায় বাবার নাকের কাছে। কিন্তু বাবা একটা বিরক্তির ভঙ্গি করল আর কোনও মতে একটা গোঙানোর শব্দ করল গলায়, 'বাদ দে।' আমি কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে বাইরে গিয়ে ওভারকোট আর টুপিটা নামালাম। বাবা এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমি ওভারকোট গায়ে দিতে সাহায্য করলাম। দস্তানাজোড়া টুপির মধ্যে ছিল, পড়ে গেছে, সে দুটোও তুলে দিলাম। বাবার আবার প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা, নাক আর ঠোঁটে এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে নাড়ল। ফিসফিস করে বলল, 'আমাকে বলবার মত ভাল একটা কথাও নেই তোর ছেলেবেলার?' 'হ্যাঁ', বললাম, 'সেই যেবার ঐ গাধাগুলো আমার শাস্তির ব্যবস্থা দিয়েছিল, তখন তুমি আমার কাঁধে হাত রেখেছিলে, আমার খুব ভাল লাগছিল—আর সবচেয়ে ভাল লাগছিল যে তুমি ফ্রাউ হুবীনেকেন-এর জীবন বাঁচিয়েছিলে, যখন সেই নির্বোধ মেজরটা তাকে গুলি করে মারতে চেয়েছিল।'

'আঃ', বাবা বলল, 'ওসব আমি প্রায় ভুলেই গেছি।'

বললাম, 'সেটাই সবচেয়ে চমৎকার যে, তুমি তা ভুলে গেছ। আমি ভুলিনি।'

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বোবা চোখে অনুরোধ করল, 'হেনরিয়েটের নাম নিস না।' আমি হেনরিয়েটের নাম নিলাম না, যদিও ঠিক করেছিলাম জিজ্ঞেস করব, ওর ঐ স্কুল থেকে ফ্লাক-এ যাবার সময় সে নিষেধ করেনি কেন। আমি মাথা নাড়লাম, আর বাবাও বুঝল, আমি হেনরিয়েটের কথা বলব না। বাবা নিশ্চয় সে সময় ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং-এ বসে কাগজের ওপর জানুয়ের ছবি আঁকিজুকি করছিল আর কখনও হয়ত একটা এচ্, আবার একটা এচ্,

জানিছিল কিংবা কখনও হয়ত ওর পুরো নামটাই, হেনরিয়েট। বাবার দোষ নেই, কেবল একরকম বোকামি। দুর্ভাগ্য ওকে নিয়ে গেছে কিংবা হয়ত তার দরকার ছিল। আমি জানি না। এত ভদ্র, কোমল আর রূপোলী চুল বাবার, দেখতে এত ভালমানুষ আর আমি যখন মায়ীর সঙ্গে কোলন-এ ছিলাম, তখন আমাদের একবারটি ভিক্ষেও পাঠায়নি—এমন চমৎকার মানুষটা, আমার বাবা, কেমন করে এত কঠিন হয়েছিল। কোথায় পেয়েছিল এত শক্তি, টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে কেন বলছিল সামাজিক দায়িত্ব, দেশাত্মবোধ, জার্মানী, এমন কি খ্রীস্টধর্মের কথা, যা সে নিজেই দু একবার স্বীকার করেছে যে, ওতে তার বিশ্বাস নেই। অথচ এমনভাবে বলছিল কেন যে লোকে ওর কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য। কারণটা তো হতে পারে একমাত্র টাকা—সেই টাকা নয়, যা দিয়ে লোকে দুধ কেনে, ট্যাক্সি চড়ে, বান্ধবী রাখে আর সিনেমায় যায়—এ্যাবস্ট্রাক্ট টাকা তা। আমার ভয় বাবাকে আর বাবার ভয় আমাকে নিয়ে। আমরা দুজনেই জানতাম যে আমরা বস্তুবাদী নই, আর আমরা দুজনেই তাদের ঘেন্না করি যারা 'নীতির' কথা বলে। ঐ নির্বোধরা আদৌ যা বোঝে আসল ব্যাপার তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাবার চোখ দেখে বুঝতে পারলাম, বাবা তার টাকা একটা ক্লাউনকে দিতে পারে না। যে টাকা দিয়ে একটা কাজই সে কেবল পারে, পারে খরচ করতে, টাকা দিয়ে যা করা উচিত ঠিক তার উলটোটা। আর আমি জানি, যদি আমাকে দশ লক্ষও দেয় তবে তাও আমি খরচ করে ফেলব। আর বাবার কাছে টাকা খরচ করা মানেই অপচয়।

বাবাকে একা কাঁদতে দেবার জন্য যখন আমি রান্নাঘরে আর বাথরুমে সময় কাটাচ্ছিলাম, তখন ভেবেছিলাম, বাবা এত বিচলিত হয়ে পড়েছে যে, আমাকে অনেকগুলো টাকা দিয়ে দেবে, কোনও রকম বাজে শর্ত ছাড়াই। কিন্তু এখন তার চোখ দেখে বুঝতে পারছি, বাবা তা পারে না। বাবা বস্তুবাদী নয় আর আমিও না, আর আমরা দুজনেই জানি যে, অন্য লোকেরা কেবল নিজেদের রিক্ততার জন্য বস্তুবাদী। পুতুলের মত বোকা, হাজার বার পরস্পরের কলার চেপে ধরে, তবুও কিন্তু সূত্রগুলো আবিষ্কার করতে পারে না, যেগুলো ওদের নাচাচ্ছে।

আমি আবার মাথা নাড়লাম, বাবাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য যে, আমি টাকার কথাও তুলব না, হেনরিয়েটের কথাও না। কেন যেন, আমার প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায় না, তবুও হেনরিয়েটের কথা মনে হল, মনে মনে ওকে চিন্তা করলাম এখন কেমন হতো ও—তেত্রিশ, সম্ভবত এক শিল্পপতির থেকে ডিভোর্সড।

আমি ভাবতেই পারি না যে, ওসব ন্যাকামি ও সহ্য করতে পারত, তোষামোদ আর পার্টি আর 'খ্রীস্টধর্মে অনুগত থাকা,' কমিটিগুলোর সভ্য হওয়া আর এস. পি. ডি-র লোকদের সঙ্গে বিশেষ ভাব রাখা। নইলে 'ঝঞ্ঝাট আরও বাড়বে'। আমি ওকে কেবল বেপরোয়া ভাবতে পারি, এমন কাজ করবে যে, বস্তুবাদীরা তা উন্মাসিকতা মনে করবে, কারণ ওদের কোন কল্পনাশক্তি নেই। প্রেসিডেন্টের অসংখ্য উপাধি পাওয়া কোনও একজনের ঘাড়ে ককটেল ঢেলে দিতে কিংবা দেঁতো হাসি ভণ্ডদের পালের গোদার মার্সেডেস্ গাড়ির সঙ্গে নিজের গাড়ির ধাক্কা লাগাবে। আর কি করত ও, যদি ছবি আঁকা বা মাখনদানী তৈরি করতে না পারত? ও নিশ্চয় অনুভব করত, আমি যেমন অনুভব করি, সর্বত্র যেখানেই প্রাণের স্পন্দন আছে—ঐ অদৃশ্য দেয়াল একটা যেখানে টাকা পয়সা আর খরচের জন্য নয়, তা কেবল একটা ক্ষণস্থায়ী আস্তানায় সংখ্যা আর স্তম্ভ হয়ে আছে।

বাবাকে পথ ছেড়ে দিলাম। বাবা আবার ঘামতে শুরু করেছিল। ওর জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি ছুটে বসবার ঘরে গিয়ে চট করে টেবিলের ওপর থেকে বাবার রুমালটা নিয়ে এলাম, আর বাবা ওটা ওভারকোটের পকেটে পুরল। মাসের কাপড়-চোপড়ের হিসাব নেবার সময় মা যদি একটা রুমাল কম দেখে, তবে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হবে। ঝিকে চুরি বা অসতর্কতার দায়ে অভিযুক্ত করবে।

'তোমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেব?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না,' বাবা বলল, 'আমি একটুখানি হাঁটব। স্টেশনের কাছে ফ্রমান অপেক্ষা করছে।' বাবা আমার পাশ কাটিয়ে এগোল, আমি দরজা খুলে ধরলাম, বাবার সঙ্গে লিফ্‌ট পর্যন্ত গিয়ে সুইচ টিপলাম। আমি আর একবার আমার মার্কটা বার করলাম পকেট থেকে, টান করে ধরা বাঁ হাতের তালুতে রেখে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বাবা বিতৃষ্ণায় মুখ ঘুরিয়ে নিল, মাথা নাড়তে শুরু করল। আমি ভাবলাম, বাবা অন্তত মানিব্যাগ বার করে আমাকে পঞ্চাশ, একশো মার্ক দিতে পারে। কিন্তু যন্ত্রণা, মহৎ স্বভাব আর নিজের বিষণ্ণ অবস্থা বাবাকে এমন এক উচ্চস্তরে নিয়ে গেছে যে, অর্থচিন্তা মাত্রেই ওর বিতৃষ্ণা আসছে, সে-কথা মনে করাবার জন্যে আমার এই চেষ্টাগুলো ওর মনে হচ্ছে আমি কোন পবিত্র জিনিসকে অপবিত্র করছি। দরজা খুলে ধরলাম, বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরল। হঠাৎ শুঁকতে শুরু করল আমাকে, খুকখুক করে হেসে বলল, 'তোর গা ভর্তি

কফির গন্ধ—আমি তোকে অনায়াসে এক কাপ ভাল কফি করে দিতে পারতাম, দিলি না তো—ওটা আমি পারি।' আমাকে ছেড়ে দিয়ে বাবা লিফ্‌টে গিয়ে উঠল, আর আমি দেখলাম বাবাকে ভেতরে গিয়ে সুইচ টিপতে আর লিফ্‌ট চলতে শুরু করার আগেই একটা ধূর্ত হাসি হাসতে। আমি আরও একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে সংখ্যাগুলোকে একে একে জ্বলে উঠতে দেখলাম—চার, তিন, দুই, এক—তারপর লাল আলোটা নিভে গেল।

১৬

ফ্ল্যাটে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে নিজেকে বোকা মনে হল। বাবা কফি তৈরি করতে চেয়েছিল, দিলেই হত। আর কিছুক্ষণ এখানে রাখা যেত। যখন কফি দিত, আর মনে মনে খুশি হত সেজন্য, তখন সুযোগ মত আমার বলতে হত, 'টাকা ছাড়ো দেখি' কিম্বা 'টাকা দাও'। কোনও কোনও সময় বন্য ব্যবহারে কাজ হয়; বর্বর ব্যবহারে। তখন বলা হয়—'তোমরা পাবে অর্ধেক পোল্যান্ড। আমরা অর্ধেক রুমানিয়া—আর শোন, সাইলেসিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ চাও, নাকি অর্ধেকেই চলবে? তোমরা চারটে মন্ত্রীর গদি পাবে, আমরা পাব দোলনার কারখানাটা।'

আমি বোকামি করেছি সোজা বাবার মানিব্যাগে হাত না দিয়ে। নিজের আর বাবার মানসিক অবস্থার দাসত্ব ঠিক হয়নি। আমার উচিত ছিল সোজা টাকার কথা তোলা, বাবার সঙ্গে টাকা নিয়ে কথা বলতে হতো, সেই মৃত এ্যাবস্ট্রাক্ট, সেকেলে বাঁধা টাকা, যা অনেকের কাছেই জীবন-মৃত্যুর সামিল। 'সেই চিরন্তন অর্থ''—এই সন্ত্রস্ত আর্তনাদ মা প্রতিটি সুযোগেই করত স্কুলের খাতার জন্য তিরিশ ফেনি চাইলেও। চিরন্তন অর্থ। চিরন্তন ভালবাসা।

রান্নাঘরে গেলাম। একচাকা রুটি কেটে নিয়ে তাতে মাখন লাগালাম, বসবার ঘরে গিয়ে বেলা ব্রোসেন্স-এর নম্বর ডায়াল করলাম। আমি শুধু ভাবছিলাম, বাবা বর্তমান অবস্থায়—বিচলিত কম্পিত—বাড়ি যাবে না, যাবে তার রক্ষিতার কাছে। বেলাকে দেখলে মনে হয়, ও বাবাকে বিছানায় পাঠাবে, হট্‌

ওয়াটার বোতল দেবে। মধু মিশিয়ে গরম দুধ দেবে। মায়ের ধরন জঘন্য রকমের। কারো যদি বিশ্রী মনের অবস্থা হয়, সংযত হতে বলবে আর মনের জোর-এর কথা বলবে। কয়েক বছর হল মায়ের 'একমাত্র ওষুধ' হল ঠাণ্ডা জল।

'ব্রোসেন বলছি,' বলল সে। আর আমিও বেঁচে গেলাম যে, কোনও গন্ধ ছড়াচ্ছে না। ওর গলার স্বরটা চমৎকার, বয়স্ক, উষ্ণ আর মিষ্টি।

আমি বললাম, 'শ্নীয়ার—হান্স—মনে আছে আপনার ?'

'মনে থাকবে না!' বলল সে মিষ্টি গলায়। 'বাবাঃ বাবাঃ, আপনার জন্যে আমার কি যে কষ্ট হচ্ছে।'

আমি বুঝতে পারলাম না, কোন্ কথা বলছে। তারপর যখন বলল, 'খেয়াল রাখবেন। সব সমালোচকই নির্বোধ, সবজান্তা আর অহঙ্কারী;' তখন বুঝলাম।

নিশ্বাস ফেললাম। বললাম, 'ওটা ভাবতে পারলে সত্যি ভাল হত।'

'কথাটা তাহলে বিশ্বাস করুন না', বলল সে। 'স্রেফ বিশ্বাস। আপনি জানেনই না। মনের জোর থাকলে বিশ্বাস করা কত সহজ।'

'আর কেউ যদি আমার প্রশংসা করে, তখন কি করব ?'

'ওঃ'—হাসল সে, আর ঐ 'ও'-টাকে একটা সুন্দর সুরে মিলিয়ে দিল, 'তাহলে ভাববেন যে লোকটার ঘাড়ে হঠাৎ সততা ভর করেছে, অহঙ্কার ভুলে গেছে—।'

আমি হাসলাম। বুঝতে পারলাম না কি বলে ডাকব। বেলা না শ্রীমতী ফ্রাউ বোসেন। আমাদের আদৌ পরিচয় নেই। আর এমন কোনও বই নেই যে খুলে দেখব, বাবার রক্ষিতাকে কি বলে ডাকতে হয়। শেষমেশ বললাম, যদিও এই ডাকটা আমার কাছে যাচ্ছেতাই রকমের হাঁদামি মনে হল। বললাম, 'ফ্রাউ বেলা, আমি একটা বিশ্রী অবস্থায় পড়েছি। বাবা এখানে এসেছিল, আমরা যতরকম সম্ভব সব কথাই বলেছি, কিন্তু টাকার ব্যাপারে কিছু বলতে পারিনি।' এদিকে আমি বুঝতে পারলাম, লাল হয়ে উঠেছে সে, ওকে আমার বেশ বিবেচক মনে হয়। জানি, বাবার সঙ্গে ওর সম্পর্ক 'প্রকৃত প্রেমের', আর টাকা-পয়সার ব্যাপারটা ওকে বিব্রত করে। 'শুনুন,' বললাম 'এখন আপনার মাথায় যে-সব চিন্তা হচ্ছে সব ভুলে যান, লজ্জা পাবেন না, আমি শুধু অনুরোধ করছি, বাবা যদি আপনার সঙ্গে আমার বিষয়ে কথা বলে,—মানে, হয়ত আপনি

তাকে বলতে পারেন যে, আমার বিশেষ প্রয়োজন টাকার। ক্যাশ টাকা। এক্ষুনি আমি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন। শুনছেন ?'

'হ্যাঁ,' সে জবাব দিল। এত আস্তে যে আমার ভয় হল। তারপর শুনলাম, নাক টানছে। 'আপনি নিশ্চয় আমাকে বাজে মেয়েছেলে মনে করেন, হান্স', বলল সে। আর এবার পরিষ্কার কেঁদে ফেলল, 'দেহ বিক্রি করি, যেমন আছে অনেকে। আপনি নিশ্চয় আমাকে তাই ভাবেন। ওঃ।'

'মোটেও না,' আমি জোর দিয়ে বললাম, 'আপনাকে কখনও তেমন ভাবিনি—সত্যি না।' ভয় হল, এবার বুঝি নিজের মনের কথা, বাবার মনের কথা এইসব নিয়ে শুরু করবে। ওর ঐ প্রচণ্ড ফোঁপানি শুনে মনে হল বোধহয় অল্পেতেই মুষড়ে পড়ে সে, বলা যায় না, হয়ত মারীর কথাই শুরু করবে। 'সত্যি,' বললাম, গলায় তেমন জোর নেই আমার, খারাপ মেয়েছেলেদের অতটা ঘৃণার পাত্র করে তুলতে চাওয়াতে আমার কেমন সন্দেহ হল, বললাম, 'সত্যি, আপনার মন খুব উঁচু, সে আমি জানি, আর আপনার সম্বন্ধে কখনও খারাপ ভাবিনি। সে কথা ঠিক। আর তাছাড়া,'—খুব ইচ্ছা হল আর একবার নাম ধরে কথা বলতে। কিন্তু ঐ বিশ্রী বেলা শব্দটা কিছুতেই ঠোঁট দিয়ে বার করতে পারলাম না, 'তাছাড়া আমার বয়স প্রায় ত্রিশ। শুনছেন তো ?'

'হ্যাঁ,' গোডেনবার্গ-এ বসে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, ফোঁপাল, যেন সে স্বীকারোক্তিকরণের চেয়ারে বসে আছে।

'আপনি কেবল একটু চেষ্টা করবেন বাবাকে বোঝাতে যে আমার টাকার দরকার।'

'আমার মনে হয়,' বলল সে উদাস গলায়, 'সোজাসুজি ও ব্যাপারে কথা বলা ঠিক হবে না। ওর পারিবারিক কোনও ব্যাপারে আমাদের কথা বলা নিষেধ, তবে একটা অন্য উপায় আছে।' আমি কথা বললাম না। ফোঁপানোটা সর্দিতে নামিয়ে আনতে পেরেছে। 'ও আমাকে মাঝে-মধ্যে দুঃস্থ সহকর্মীদের জন্য টাকা দেয়,' বলল সে, 'আর সেটা আমি সম্পূর্ণ নিজের খুশিমত দিতে পারি, আর—আর আপনার কি মনে হয় না যে আপনাকে এখন দুঃস্থ সহকর্মী মনে করে এই সামান্য অর্থ দেওয়া যেতে পারে।' 'আমি সত্যিই একজন দুঃস্থ সহকর্মী, শুধু এই মুহূর্তের জন্য নয়, অন্ততপক্ষে ছয় মাস। কিন্তু বলুন তো, সামান্য অর্থ বলতে আপনি কি বোঝাতে চান ?'

গলা পরিষ্কার করল সে, আর একবার বলল তবে কোনও সুর না তুলে,

বলল, 'ওগুলো বেশির ভাগই সাহায্য, বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, যদি কেউ মারা যায়, অসুখে পড়ে, কোনও মহিলার বাচ্চা হয়, এইসব—মানে, একটানা সাহায্য নয়, এককালীন সাহায্য।'

'কত ?' জিজ্ঞেস করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দিল না, আমি ওর চেহারাটা ভাবতে চেষ্টা করলাম। পাঁচ বছর আগে একবার দেখেছিলাম, মারী সেবার আমাকে জোর করে অপেরায় নিয়ে গিয়েছিল। এক জমিদারের ফুসলে-নেওয়া চাষীর মেয়ের পার্ট করেছিল ফ্রাউ রোসেন, বাবার পছন্দ দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। মাঝারি লম্বা, ভাল স্বাস্থ্য, বোধহয় ফসাহি আর বেশ মানানসই বুক। একবার একটা কাঠের বাক্সের ওপর, একটা চাষীর গাড়িতে আর সবশেষে, আছাড় খেয়ে পড়েছিল একটা বিচালিটানা আঁকশীর ওপর। সুন্দর গলায় সাধারণ মানসিক পরিবর্তন চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছিল।

'হ্যালো ?' ডাকলাম, 'হ্যালো ?'

'ও,' সাড়া দিল সে, আর এবার আগের মত না হলেও সেই সুরটা বার করল। 'আপনার প্রশ্নটা বড্ড সোজাসুজি ধরনের।'

'আমার অবস্থা তাহলে বুঝুন,' বললাম। বুকের ভেতর শিরশির করছে। যত দেরি করবে উত্তর দিতে, এত ছোট হবে অঙ্কটা, যেটার কথা একটু আগে বলেছে।

'এই,' সে বলল অবশেষে, 'অঙ্কটা ওঠা-নামা করে দশ আর এই ত্রিশ মার্কের মধ্যে।'

'আর যদি আপনি এমন একজন সহকর্মী যোগাড় করতে পারেন যে অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়েছে, এই ধরুন, সাংঘাতিক এ্যাক্সিডেন্ট করেছে তো কয়েক মাস ধরে একশো মার্ক মত সহ্য করতে পারবেন ?'

'শুনুন,' বলল সে আস্তে, 'আপনি নিশ্চয় আশা করেন না যে আমি মিথ্যা কথা বলি ?'

'না,' বললাম, 'আমার সত্যিই এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে—আর আমরা কি সহকর্মী নই ? শিল্পী নই ?'

'আমি চেষ্টা করব,' বলল সে। 'তবে জানি না, তাতে কাজ হবে কিনা।'

'আমি জানি না, ব্যাপারটা এমনভাবে বলতে পারব কিনা যাতে ও বিশ্বাস করে। আমার মাথায় অত খেলে না।' ওকথা বলার দরকার ছিল না। আমি ইতিমধ্যেই আমার জানাশোনার মধ্যে ওকেই সবচেয়ে বেকুব মহিলা বলে

ভাবতে শুরু করে দিয়েছি।

'তাহলে এক কাজ করলে কেমন হয়,' বললাম, 'আপনি যদি একটু চেষ্টা করে দেখেন, আপনাদের থিয়েটারে, আমার একটা কাজ—ছোটখাট পার্ট, ছোট-খাট পার্ট আমি খুব ভাল করতে পারি।'

'না, না, হান্স,' সে জবাব দিল, 'ওসব যোগসাজসের ব্যাপার আমি একদম পারি না।'

'বেশ, ঠিক আছে,' বললাম, 'আপনাকে শুধু বলে রাখছি, সামান্য অর্থেও উপকার হবে। ছেড়ে দিচ্ছি, আর অনেক ধন্যবাদ।' ও আর কিছু বলতে পারার আগেই আমি রেখে দিলাম। আর একটা আশঙ্কা ছিল, এখান থেকে কিছু বের হবে না। মহিলাটি বড্ড বোকা। কাজ হওয়া বলার ধরনটা আমাকে কেমন সন্দেহের মধ্যে ফেলেছে। 'দুঃস্থ সহকর্মীদের জন্য সাহায্য' নিজেই পকেটে পোরে কিনা কে জানে। বাবার জন্য কষ্ট হচ্ছে, আমার ধারণা ছিল, বাবার রক্ষিতা সুন্দরী আর বুদ্ধিমতী। আমার এখনও দুঃখ হচ্ছে যে, আমি তাকে কফি করবার সুযোগ দিইনি। বাবা যখন ওর ফ্ল্যাটে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকবে কফি করার জন্য, তখন এই হাঁদারাম লক্ষ্মীছাড়া হয়ত মুচকে হাসবে, একজন মাস্টারনীকে একটা কাজ করতে না দিলে যেমন অলক্ষ্যে মাথা নাড়ে, তেমনি মাথা নাড়বে, আর তারপর কপট আনন্দ প্রকাশ করবে, কফির প্রশংসা করবে, পাথর ছুঁড়ে দিলে কুকুর সেটা নিয়ে এলে তখন সেটাকে যেমন প্রশংসা করা হয় তেমনি করে। টেলিফোনের ওখান থেকে জানালার দিকে গিয়ে সেটা খুলে দাঁড়ালাম যখন, তখন আমার মনে ভীষণ রাগ। রাস্তার দিকে তাকালাম। আমার ভয় হচ্ছিল একদিন হয়ত সমারহিল্ড-এর প্রস্তাবে রাজী হতে হবে। হঠাৎ আমার মার্কটা পকেট থেকে বার করলাম, ছুঁড়ে ফেলে দিলাম সেটা রাস্তায় আর সঙ্গে সঙ্গে আফসোস হল। ওটাকে দেখবার চেষ্টা করলাম, দেখতে পেলাম না, মনে হল একটা চলতি ট্রামের ছাতে গিয়ে পড়বার শব্দ শুনতে পেয়েছি। টেবিলের ওপর থেকে মাখন মাখানো রুটি নিয়ে রাস্তার দিকে দেখতে দেখতে খেলাম। প্রায় আটটা। প্রায় দু ঘণ্টা হয়ে গেছে বন্-এ এসেছি, ইতিমধ্যে ছ'জন তথাকথিত বন্ধুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছি, মায়ের সঙ্গে আর বাবার সঙ্গে কথা বলেছি, কিন্তু পকেটে একটা মার্কও বাড়েনি, বরং কমেছে। খুব ইচ্ছা হচ্ছে নিচে গিয়ে মার্কটা খুঁজে নিয়ে আসি, সাড়ে আটটা বাজতে চলেছে, লেয়ো যে কোনও মুহূর্তে আসতে পারে বা টেলিফোন করতে পারে।

মারী ভালই আছে, এখন ও রোম-এ, ওর গীর্জার বন্ধুদের মধ্যে, আর ভাবছে পোপের সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় কোন্ পোশাক পরবে। ওর জন্য হেয়ারড্রেসারকে জ্যাকোলিন কেনেডির একটা ছবি যোগাড় করতে হবে, একটা স্প্যানিশ ম্যান্টিলা আর একটা ঘোমটা কিনে দিতে হবে। কারণ সত্যি কথা বলতে কি, মারী তো এখন জার্মান ক্যাথলিসিজম-এর একজন প্রায় 'ফার্স্ট লেডি'। ঠিক করলাম, আমিও রোম-এ গিয়ে পোপ-এর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করব। একজন জ্ঞানী, বয়স্ক ক্লাউনের কিছুটা তো ও'র মধ্যেও আছে, আর যাই হোক মূকাভিনয়ের উৎপত্তি তো ব্যারগামোতেই। গেয়েহোল্ম তো সবজান্তা, তাকে দিয়ে আমি সেকথা বলাব। আমি পোপকে বলব যে, মারীর সঙ্গে আমার বিয়েটা আসলে রেজেস্ট্রীর ব্যাপারেই বানচাল হয়ে গিয়েছিল। ও'কে অনুরোধ করব, আমার মধ্যে যেন অষ্টম হেনরীর বিপরীত চরিত্রটা দেখেন। সে ছিল বহুপত্নীক আর ধর্মবিশ্বাসী, আমি একপত্নীবাদী আর অবিশ্বাসী। আমি ও'কে বলব, 'কর্তাস্থানীয়' জার্মান ক্যাথলিকরা কেমন অহঙ্কারী আর নীচ প্রকৃতির। উনি যেন ওদের কথায় না ভোলেন। কয়েকটা মূকাভিনয় দেখাব, সুন্দর হাল্কা গোছের—যেমন স্কুলে যাওয়া এবং বাড়িতে ফেরা। তবে আমার ওই কার্ডিনালটা দেখাব না, কষ্ট পাবেন. উনি নিজেও তো একসময় কার্ডিনাল ছিলেন—ও'কে আমি কষ্ট দিতে চাই না।

বারে বারেই আমি নিজের ভাবপ্রবণতার শিকার হয়ে পড়ি। পোপের সঙ্গে দেখা করাটা যেন দেখতে পাচ্ছিলাম, নিজেকে হাঁটু গেড়ে বসে অবিশ্বাসী হিসেবে ও'র আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে দেখতে পাচ্ছিলাম। দরজায় সুইজারল্যাণ্ডের প্রহরী আর কোনও একজন শুভাকাঙ্ক্ষী—তবে একটুখানি ঘৃণাভরা আতঙ্কগ্রস্ত মু'সিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে—আমার প্রায় মনে হবার উপক্রম হচ্ছিল যে, আমি পোপের সামনে। লেয়োকে বলতে চেষ্টা করব, আমি পোপের ওখানে গিয়েছিলাম আর তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। এই মুহূর্তে আমি পোপের কাছেই ছিলাম, তাঁকে হাসতে দেখেছি, তাঁর গ্রাম্য কণ্ঠস্বর শুনেছি, তাঁকে বলেছি, ব্যারগামোর গাড়োলটা কি করে মূকাভিনেতা হয়েছিল। এসব ব্যাপারে লেয়ো খুব কড়া। ও আমাকে সব সময় মিথ্যেবাদী বলে। লেয়োকে যখনই বলতাম, "জানিস্, আমরা কেমন করে কাঠ চিরেছি?" ও ক্ষেপে যেত। সাধারণ, অপ্রয়োজনীয়ভাবে দেখতে গেলে লেয়ো ঠিকই করে। তখন ওর বয়স ছয় কিম্বা সাত, আমার আট কিম্বা নয়। ও আস্তাবলে একটুকরো কাঠ পায়, ঘোড়ার কাঠের একটা

টুকরো। ঐ আস্তাবলে ও একটা মরচে পড়া করাতও পেয়েছিল। আমাকে বলেছিল, দ্বজনে মিলে একসঙ্গে সেই কাঠের টুকরোটা করাত দিয়ে কাটতে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওই কাঠের টুকরোটা কাটার দরকার কি। ও কোনও কারণ দেখাতে পারেনি, ও স্রেফ কাটতে চেয়েছিল। আমার ব্যাপারটা কেমন সম্পূর্ণ অকারণ মনে হয়েছিল, লেয়ো আধ-ঘণ্টা ধরে কেঁদেছিল। অনেকদিন বাদে, দশ বছর বাদে স্কুলে, ফাদার হ্বনিবাল্ড লোসিং সম্বন্ধে বলছিল জার্মান ক্লাসে, সেই ক্লাসের মধ্যে, অকারণে আমার হঠাৎ মনে পড়েছিল লেয়ো সেদিন কি চেয়েছিল। ও চেয়েছিল কেবল করাত দিয়ে কাটতে। সেই সময়টাতে ওর ইচ্ছা হয়েছিল আমার সঙ্গে একত্রে করাত চালাতে। ওর ব্যাপারটা আমি হঠাৎ ব্বঝতে পেরেছিলাম, দশ বছর বাদে। ওর আনন্দ, উত্তেজনা, উদ্বেগ, সবকিছ্ব। ও কেন ওরকম হয়ে গিয়েছিল তা এমন গভীরভাবে আমার মনের ভেতরে তখন দোলা দিয়েছিল যে, আমি ক্লাসের মধ্যে করাত চালাবার ভঙ্গি করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। আমার চোখের সামনে তখন ওর খ্বশিতে উপচে পড়া কচি ম্বখ, আমি মরচে ধরা করাতটা একবার ঠেলে দিচ্ছিলাম, ও আর একবার ঠেলে দিচ্ছিল—হঠাৎ ফাদার হ্বনিবাল্ড আমার চুলের ম্বঠি ধরে আমাকে 'সজ্ঞানে ফিরিয়ে এনেছিল'। সেই থেকে আমি সত্যিসত্যিই লেয়োর সঙ্গে করাত দিয়ে কাঠ কেটেছিলাম—ওসেটা ব্বঝতেই পারে না। ও রিয়্যালিস্ট। এখন ও আর বোঝে না যে, অদ্ভুত মনে হয় যে-সব কাজ তা তৎক্ষণাৎ করতে হয়। এমন কি, কখনও কখনও খ্বব ইচ্ছা হয় সেই ম্বহ্বর্তে চিমনীর ধারে বসে তাস খেলতে কিম্বা রান্নাঘরে গিয়ে নিজে চা বানাতে। নিশ্চয় মনে হয় মায়ের স্বন্দর ঝকঝকে পালিশ করা মেহগিনি কাঠের টেবিলে বসতে, তাস খেলতে, খ্বশি পরিবার হতে। কিন্তু যখনই মায়ের ওরকম ইচ্ছা হতো, আমাদের কারোই তখন সে ইচ্ছে হতো না। কত কাণ্ড হতো, মায়ের-ভালবাসা-ব্বঝতে-না-পারা, তখন মা বলতো, কথা শ্বনতে হবে, চতুর্থ কম্যান্ডমেন্ট। তারপরই কিন্তু মার খেয়াল হতো যে, যেসব ছেলেমেয়েরা চায় না, তাদের সঙ্গে হ্বকুম করে তাস খেলতে বসলে কি অদ্ভুত আনন্দ হয়—মা তখন কাঁদতে কাঁদতে নিজের ঘরে যেত। কখনও কখনও মা ঘ্বষ দেয়ার চেষ্টা করত, 'খ্বব ভাল' একটা কিছ্ব খাওয়ার ব্যবস্থা করবে বলত—মায়ের দেয়া অনেক কান্নাকাটিভরা সন্ধ্যা এভাবে আর একটায় গিয়ে শেষ হতো, যখন নানা জিনিস পরিবেশন করত মা। মা জানতো না আমরা কেন ওরকম গোঁয়ার্তুমি করতাম—হয়তনের সাতটা যে

তখনও ছিল তাসের মধ্যে, আর তাস খেলতে বসলেই হেনরিয়েটের কথা মনে পড়ত। কেউ কিন্তু সেকথা মাকে বলেনি। অনেক পরে, মায়ের ঐসব নিষ্ফল চেষ্টার কথা, চিমনীর ধারে খুশি পরিবারের ভাবের কথা মনে পড়লেই আমি মনে মনে মায়ের সঙ্গে তাস খেলতাম, যদিও দুজনে যেসব খেলা করা যায় সবই বিরক্তিকর। আমি সত্যি সত্যিই মায়ের সঙ্গে তাস খেলতাম, "ছেষট্টি" আর "যুদ্ধ"। চা খেতাম, তাতেও আবার মধু দেয়া থাকত, মা খোশমেজাজে আঙুল নেড়ে সাবধান করে দিয়ে একটা সিগারেটও দিত আমাকে। পেছনদিকে কোথাও বসে লেয়ো তার পড়া তৈরির ভান করত, আর আমরা সবাই জানতাম, ঝিয়েরাও যে, বাবা "সেই মেয়েটার" ওখানে। যে করেই হোক মারী এইসব 'মিথ্যে' জেনেছিল, কারণ ওকে কিছু একটা বলতে গেলেই ও কেমন অবিশ্বাসের ভাব নিয়ে আমার দিকে তাকাত। ওস্‌নাব্রুক-এর সেই ছেলেটাকে আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই দেখেছিলাম। কখনও কখনও আবার আমার সব যেন উল্টো মনে হয়। যা সত্যি সত্যিই ঘটেছে তা মনে হয় ঘটেনি, মনে হয় মিথ্যে। যেমন সেই ঘটনাটা, সেবার যে কোলন থেকে বন্-এ গিয়েছিলাম মারীর দলের মেয়েদের ভার্জিন মেরীর সম্বন্ধে বলতে। সবাই যাকে ঘটনা বলে, তা আমার কাছে কেমন গল্পের মত মনে হয়।

১৭

নোংরার মধ্যে পড়ে থাকা মার্কটার আশা ত্যাগ করে জানালা থেকে সরে এলাম। রান্নাঘরে গেলাম আরেক পিস্ মাখন রুটি তৈরি করবার জন্য। খাবার মত তেমন কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না। এক কৌটো কড়াইশুঁটি, এক কৌটো প্লাম (আমার প্লাম ভাল লাগে না, মনিকার তো আর তা জানবার কথা নয়), আধখানা পাঁউরুটি, আধ বোতল দুধ, সিকিটাক কফি, পাঁচটা ডিম, দু চিলতে বেকন আর এক টিউব মাস্টার্ড। বসবার ঘরের টেবিলের ওপরকার কৌটোয় আর চারটে মাত্র সিগারেট আছে। আমার বড্ড বিশ্রী লাগছিল। আবার কোনও দিন যে একটু মহড়া দিতে পারব, সে আশা ত্যাগ করেছিলাম।

হাঁটুটা এত ফুলে উঠেছিল যে, প্যান্টটা তার ওপর চেপে বসেছিল। মাথার যন্ত্রণাটা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তা আর কহতব্য নয়। আমার মনের ভেতরে একটা একটানা যন্ত্রণা, কোনও দিন এত খারাপ অবস্থা হয়নি, তারপর সেই 'রক্তমাংসের আকর্ষণ'—আর মারী রোম-এ। ওকে আমার দরকার, ওর দেহ, আমার বুকের ওপর ওর হাতদুটো। সমারহ্বীল্ড একবার যেমন বলেছিল, আমার "দৈহিক সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা সচেতন এবং প্রকৃত সম্পর্ক" আছে, আর আমার ভাল লাগে কাছেপিঠে সুন্দরী মহিলা থাকলে। এই পাশের বাড়ির শ্রীমতী গ্রেবয়েল যেমন, এদের প্রতি কিন্তু আমি 'রক্ত-মাংসের আকর্ষণ' বোধ করি না। বেশির ভাগ মহিলাই তাতে দুঃখ পায়, আমি যদি ওদের সেই কষ্টের কথা টের পেয়ে গোপনে একটু চেষ্টা করি, তবে কিন্তু ওরা ঠিক পুলিশে খবর দেবে। বেশ জটিল আর কদর্য ব্যাপার এই রক্তমাংসের আকর্ষণ। যেসব পুরুষ একপত্নীক নয় তাদের পক্ষে এটা একটা চিরন্তন শাস্তি। আমার মত একপত্নীবাদীর কাছে ওটা সুপ্ত এক ঔদ্ধত্যের ওপর চিরন্তন চাপ। বেশির ভাগ মহিলাই কি করে যেন দুঃখ পায়, যদি ঐ যাকে 'কামচেতনা' বলে পুরুষের মতে, তা অনুভব না করে। এমন কি শ্রীমতী রোথার্টও যে এমনিতে সম্ভ্রান্ত, ধর্মভীরু তারও যেন 'অপমানিত বোধ করছেন' সর্বদাই এই রকম একটা ভাব। সময় সময় বরং আমি সমকামীদের ব্যাপারটা বুঝতে পারি, ওদের নিয়ে তো কাগজে কতই লেখা হয়। কিন্তু যখনই ভাবি 'বিবাহগত কর্তব্য' বলে একটা কথা আছে, তখনই আমার কেমন আতঙ্ক হয়। এই সব বিয়েতে নিশ্চয়ই একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটে। কারণ একজন মহিলা সরকার আর গীর্জার তরফ থেকে এই ব্যাপারটাতে চুক্তিবদ্ধ হয়। পোপের সঙ্গে এ ব্যাপারেও কথা বলবার ইচ্ছা আমার ছিল। উনি নিশ্চয়ই ভুল খবর পান। আরেক পিস্ রুটিতে মাখন লাগিয়ে বসবার ঘরে গেলাম। কোলন-এ ট্রেনে কেনা সন্ধ্যার কাগজটা বার করলাম ওভার-কোটের পকেট থেকে। কখনও কখনও সন্ধ্যার কাগজটা কাজে লাগে, টেলিভিশন দেখতে গেলে। আমি যেমন উদাস হয়ে যাই, তেমনি হয় সন্ধ্যার কাগজে। পাতা উল্টে যাচ্ছিলাম, হেডলাইনগুলো দেখতে দেখতে একটা খবরের ওপরে চোখ পড়তে হেসে ফেললাম। ডঃ হেরবার্ট কালিক-কে 'সরকারের তরফ থেকে উপাধি দেয়া হয়েছে। কালিক হচ্ছে সেই ছেলে, যে সেবার আমার বিরুদ্ধে ডিফিটিস্‌ম্-এর নালিশ এনেছিল, আর বিচারের সময় নির্মম

কঠিন হাতে বিচারের দাবি জানিয়েছিল। সে সময়ে ওর মাথায় সেই অভিনব বুদ্ধি এসেছিল: অনাথ আশ্রমগুলোকে শেষ যুদ্ধ চালাবার জন্যে প্রস্তুত করা। আমি জানতাম ও একজন হোমড়াচোমড়া হয়েছে। কাগজে লিখেছে, "যুবক সমাজের মধ্যে গণতন্ত্রের চেতনা প্রচারের পুরস্কার হিসাবে" তাকে ঐ উপাধি দেয়া হয়েছে।

দু বছর আগে কালিক আমাকে একবার নিমন্ত্রণ করেছিল, আমার সঙ্গে সব মিটমাট করে নেবার জন্য। বাপ-মা-মরা গেয়র্গ—যে গ্রেনেড নিয়ে মহড়া দেবার সময় দুর্ঘটনায় মারা গেল—কিম্বা আমাকে—একটা দশ বছরের ছেলেকে ডিফিটিসম-এর দায়ে অভিযুক্ত করেছিল, আর নির্মম কঠিন হাতে বিচার দাবি করেছিল, এ সবই কি আমার ভুলে যাওয়া উচিত? মারীর মতে মিটমাটের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে নেই। তাই আমরা ফুল কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম ওর ওখানে। ওর ভিলাটা সুন্দর, প্রায় আইফেলের মত ওর স্ত্রী সুন্দরী আর ওদের দুজনের গর্বের বিষয় ওদের একমাত্র ছেলে যাকে ওরা সগৌরবে বলত 'বাচ্চা'। ওর স্ত্রী এমন এক ধরনের সুন্দরী যে ঠিক বোঝা যায় না জ্যান্ত না তৈরি করা। ওর পাশে বসে সারাটা সময় ধরে ইচ্ছা করছিল হাত ধরে টান দিই কিম্বা কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিই অথবা পা ধরে টান দিই—আমার ভুল ভাঙাবার জন্য যে, ও সত্যিই পুতুল নয়। সমস্ত কথাবার্তায় ও যা বলেছিল তা হচ্ছে স্রেফ দুটো অভিব্যক্তি—'আঃ কি সুন্দর' আর 'আঃ কি জঘন্য'। প্রথমে ওকে কেমন ক্লান্তিকর মনে হয়েছিল। তারপর বেশ লাগল। অনেক কথাই বলে-ছিলাম, ঐ যেমন লোকে অটোম্যাট-এ একটা দশ ফেনি ঢুকিয়ে দেয়, কি হয় দেখবার জন্য, সেইরকম। আমি যখন ওকে বললাম যে, আমার ঠাকুমা মারা গেছে—কথাটা আদৌ ঠিক না, আমার ঠাকুমা তো বারো বছর আগেই মারা গেছে—তখন ও বলেছিল, 'ও, কি জঘন্য।' আমার তাতে মনে হয় কেউ মারা গেলে অনেকরকম অদ্ভুত কথাই বলা যায়, কিন্তু 'ও, কি জঘন্য' বলা যায় না। তারপর আমি বলেছিলাম, কোনও একজন হুমেলোহ্-এর কথা (ও নামের কেউ ছিলই না, অটোম্যাটে বিশেষ একটা কিছু ফেলবার জন্য), সেই লোকটা অনারারী ডক্টরেট পেয়েছে, মহিলাটি বলেছিল, 'ও, কি সুন্দর'। তারপর যখন তাকে বলেছিলাম যে, আমার ভাই লেয়ো ক্যাথলিক হয়েছে, তখন সে একটু সময় বলব কি বলব না ভাবল। এই বলব কি বলব না ভাবটা আমার কাছে তার প্রাণের লক্ষণ বলে মনে হল। মস্ত বড় বড় চোখে, উদাস পুতুলের চোখে

আমার দিকে তাকিয়ে দেখল, আমাকে কোন দলে ফেলবে, তারপর বলল, 'জঘন্য, আই না ?' ওর মুখ দিয়ে যাই হোক একটা অন্য শব্দ তো বার করতে পেরেছি। আমি ওকে বললাম, ঐ দুটো ও-ই বাদ দিয়ে, শুধু ঐ সুন্দর আর জঘন্য বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ে আমাকে আরও খানিকটা অ্যাসপারগাস দিয়ে, তারপর বলল, 'ও, কি সুন্দর'। শেষকালে আমরা ওদের সেই গর্বের—ওরা যাকে 'বাচ্চা' বলে, তাকে দেখলাম। একটা পাঁচ বছরের দুরন্ত ছেলে, ওকে দেখে মনে হল, টেলিভিশনে বিজ্ঞাপনের ছবিতে বাচ্চার কাজ করতে পারত। এই দাঁত মাজতে ভালবাসা, গুডনাইট বাপি, গুডনাইট মাম্মী বলা, বাও করা মারীর সামনে, আমার সামনে। অবাক হচ্ছিলাম এই ভেবে যে, বিজ্ঞাপনী টেলিভিশন ওকে এখনও আবিষ্কার করেনি। পরে যখন আমরা চিমনীর ধারে বসে কফি আর ব্র্যান্ডি খাচ্ছিলাম তখন হেরিবার্ট বলছিল আমাদের স্বর্ণযুগের কথা, যে যুগের আমরা বাসিন্দা। তারপর ও গিয়ে শ্যাম্পেন নিয়ে এল, আর তারপর এল করুণ রস। আমার কাছে মাপ চেয়েছিল, আমার কাছে ও 'নিরপেক্ষ মুক্তি' ভিক্ষা চাইবার জন্য হাঁটু গেড়ে বসেও ছিল—আর আমার ইচ্ছা করছিল সোজা ওর পাছায় একটা লাথি ঝাড়তে। কিন্তু টেবিলের ওপর থেকে চীজ কাটবার ছুরিটা নিয়ে নাটকীয়ভাবে ওর মাথায় সেটা ছুঁইয়ে ওকে গণতন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলাম। ওর স্ত্রী চিৎকার করে উঠেছিল, 'আ, কি সুন্দর।' তারপর হেরিবার্ট যখন অভিভূত অবস্থায় আবার টেবিলে এসে বসল, আমি ইহুদী ইয়াংকিদের নিয়ে একটা বক্তৃতা দিলাম। বলেছিলাম, অনেককাল ধরে লোকের ধারণা ছিল, শ্নীরার নামটা, আমার নাম, বুঝি শ্নরেন—ভিক্ষা চাওয়া বা ফেরি করা থেকে এসেছে, কিন্তু পরে প্রমাণ হয়েছে ওটা শ্নাইডার (দর্জি), শ্নীডার থেকে এসেছে, শ্নরেন থেকে নয়। আর আমি ইহুদীও নই, ইয়াংকিও না, তবুও—এবার আমি হেরিবার্টকে হঠাৎ একটা চড় কষালাম। কারণ আমার মনে পড়ে গিয়েছিল ও একবার আমাদের স্কুলের একটা ছেলের কাছে তার বংশের আর্যতা দাবি করেছিল, ছেলেটার নাম ছিল গ্যোৎস্ বুখেল। গ্যোৎস্-এর অবস্থা কাহিল, কারণ ওর মা ছিল ইটালীর মেয়ে, দক্ষিণ ইটালীর এক গ্রামে জন্ম। সেই মায়ের সম্বন্ধে খবর জোগাড় করা, আর তা থেকে প্রয়োজনীয় আর্যতা প্রমাণ করা, অসম্ভব কাজ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। আর ওপর গ্যোৎস্-এর মায়ের জন্ম যে গ্রামে, সেটা তখন ইহুদী ইয়াংকিদের দখলে। ক'টা সংকটজনক, প্রাণঘাতী সপ্তাহ কাটাল কাউ বুখেল আর গ্যোৎস্। শেষে

গ্যোৎস্-এর মাস্টারমশাই-এর মাথায় একটা বুদ্ধি আসে, বন্ ইউনিভার্সিটির একজন শ্রেণী বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট যোগাড় করে আনার। সেই লোকটি প্রমাণ করেছিল যে, 'গ্যোৎস্ খাঁটি, সম্পূর্ণ খাঁটি পশ্চিমী'। হেরারবার্ট কালিক তখন তাল তুলেছিল, ইটালীর সব লোকই বিশ্বাসঘাতক আর গ্যোৎস্ যুদ্ধ শেষ না হওয়া অবধি এক মিনিটও শান্তি পায়নি। ইহুদী ইয়াংকিদের ওপর বক্তৃতা দিতে গিয়ে আমার সেকথা মনে পড়াতে আমি সোজা হেরারবার্ট কালিকের মুখের ওপর একটা চড় মেরেছিলাম, আমার শ্যাম্পেনের গ্লাসটা ছুঁড়ে ফেলেছিলাম চিমনীর আগুনে, তারপর চীজ কাটবার ছুরিটাও, মারীর হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ওখানে ট্যাক্‌সি পাওয়া সম্ভব ছিল না, তাই অনেকটা হেঁটে বাস অবধি এসেছিলাম। মারী সারাটা পথ কান্নাকাটি করেছিল, ব্যবহারটা নাকি অখ্রীষ্টীয়, অমানুষিক। কিন্তু আমি বলেছিলাম, আমি খৃষ্টান নই এবং আমার কোনও 'কন্‌ফেশন চেয়ার'ও নেই। মারী আমাকে এমন কথাও জিজ্ঞেস করেছিল, আমি ওর, হেরারবার্টের, গণতন্ত্রের দীক্ষাতেও সন্দেহ করি কিনা। তাতে আমি বলেছিলাম, 'না, না, তাতে আমার আদৌ কোনও সন্দেহ নেই—বরং উল্টো—কিন্তু আমি ওকে দেখতে পারি না, আর কোনদিন দেখতে পারবও না।'

টেলিফোন ডাইরেক্টরীটা খুলে আমি কালিক-এর নম্বরটা খুঁজলাম। ওর সঙ্গে টেলিফোন-এ কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল। মনে পড়ল, পরে আবার একবার ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল আমাদের বাড়িতে এক 'ঘরানা উৎসবে'। ও আমার দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে চোখভরা অভিশাপ নিয়ে তাকিয়েছিল, তখন ও একজন ইহুদী শাস্ত্রজ্ঞ-এর সঙ্গে 'ইহুদী অধ্যাত্মবাদ' নিয়ে কথা বলছিল। ওই শাস্ত্রজ্ঞের জন্য আমার কষ্ট হচ্ছিল। লোকটা বেশ বৃদ্ধ, সাদা দাড়ি তার, বেশ ভালমানুষ আর একধরনের নিরীহ গোছের, সেইজন্য আমার অস্বস্তি। হেরারবার্ট অবশ্যই সবাইকে, যার সঙ্গেই আলাপ হচ্ছিল, বলে বেড়াচ্ছিল, ও নাৎসী ছিল আর ইহুদী-বিদ্বেষী ছিল। বলে বেড়াচ্ছিল যে, 'ইতিহাস ওর চোখ খুলে দিয়েছে'। ওদিকে আমেরিকানরা যেদিন বন্ শহরে ঢুকেছে তার আগের দিনও ও আমাদের বাগানে যুদ্ধের মহড়া দিয়েছে ছেলেদের সঙ্গে। তাদের বলেছে, 'প্রথম যে ইহুদী শুয়োরকে দেখতে পাবে, তারই ওপর ঝাড়বে এই মালটা।' সেই 'ঘরানা উৎসবের' দিনে আমার মায়ের যে ব্যবহারটা আমাকে সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত করছিল, সে হচ্ছে বিদেশ থেকে আবার ফিরে আসা লোকদের সম্বন্ধে

মাত্রার জোরালো ভাবটা। ওরা সবাই যাবতীয় দুর্ব্যবহার আর গণতন্ত্রের প্রকট ক্ষমতার এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, বারে বারেই সৌভ্রাতৃত্বের কথা উঠছিল আর পরস্পর আলিঙ্গন করছিল; ওরা বুঝতে পারছিল না যে, আতঙ্কের রহস্যটা অনেক গভীরে। বড় বড় ব্যাপারে অনুতাপ করা তো সোজা—রাজনৈতিক ভুল, বিবাহ বিচ্ছেদ, খুন, ইহুদী-বিদ্বেষ—কিন্তু ক্ষমা কে করে কাকে, কে বোঝে তলিয়ে? আমার বাবা সেবার যখন আমার কাঁধে হাত রেখেছিল, তখন ব্র্যুল আর হেয়ারবার্ট কালিক কিভাবে বাবার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর হেয়ারবার্ট কালিক রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে কিভাবে আমাদের টেবিলে লাথি মেরেছিল, ওর নির্জীব চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'শক্ত হাতে, নির্মম কঠিন হাতে', কিম্বা কিভাবে গ্যোৎস্ বুখেলের জামার কলার ধরে স্কুলের ওপর ক্লাসের সামনে দাঁড় করিয়ে, যদিও মাস্টারমশাই সামান্য প্রতিবাদ করেছিল, কালিক বলেছিল, 'দেখ তোমরা সবাই এটাকে—এ যদি ইহুদী না হয় তো কি বলেছি!' মুহূর্তগুলো বড্ড বেশি আমার মাথায় থাকে, বড্ড বেশি খুঁটিয়ে দেখি। কত সামান্য সব ঘটনা—এই হেয়ারবার্ট কালিক-এর চোখ দুটো পাল্টায়নি। বোকাসোকা ইহুদী বিশেষজ্ঞের সামনে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার অস্বস্তি লাগছিল। বুড়ো মানুষটা সেই ভুলের অপমানে এত বেশি অভিভূত হয়েছিল যে, হেয়ারবার্ট-এর আনা একটা ককটেল আর 'ইহুদী অধ্যাত্মবাদ' নিয়ে বড় বড় কথা হজম করছিল। এই এমিগ্রান্টরা—একথাও জানেন যে, খুব সামান্য নাৎসীকেই সামনাসামনি যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল, মারা গেছে বলতে গেলে শুধু অন্যরা। হ্বীনেকেনদের পাশের বাড়ির হুব্যার্ট ক্লীপস আর গ্যুনটার ক্রেমার, ওর বাবার রুটি তৈরির কারখানা ছিল, এরা তো হিটলার-ইয়োথ দলের নেতা ছিল, তবুও এদের এগিয়ে দেয়া হয়েছিল, কারণ ওরা 'রাজনৈতিক চালচলনে ওয়াকিফহাল' ছিল না: পরস্পরের গন্ধ শুঁকে বেড়াবার সেই জঘন্য ব্যাপারটায় ওরা সায় দেয়নি। কালিককে কখনই সামনাসামনি যুদ্ধে পাঠান হত না, ও ওয়াকিফহাল ছিল, ঠিক এখন যেমন ওয়াকিফহাল। ও জন্ম থেকেই ওয়াকিফহাল। এই এমিগ্রান্টরা যেমন ভাবছে, আসলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। এরা তো কেবল দুটো ভাগের কথা ভাবতে পারে—দোষী, নির্দোষ—নাৎসী, অনাৎসী।

অঞ্চল-প্রধান কীনেনহান মাঝে মাঝে আসত মারীর বাবার কাছে

দোকানে, ড্রয়ার থেকে সিগারেট নিত এক প্যাকেট, পয়সাকড়ি কিছুই দিত না। একটা সিগারেট ধরিয়ে মারীর বাবার সামনের ডেস্কের ওপর বসে বলত, 'নাঃ মার্টিন, তোমাকে সুন্দর, ছোট্ট, তেমন কর্কশ নয় এমন একটা কনসেনট্রেশন সেলে পুরে দিলে কেমন হয়?' তখন মারীর বাবা বলত, 'শুয়োর শুয়োরই থাকে, স্বভাব যায় না মলে, তুমি চিরকাল একটা শুয়োর।' ওরা ছয় বছর বয়স থেকে পরস্পরকে চেনে। কীরেনহান খেপে গিয়ে বলত, 'মার্টিন, বাড়াবাড়ি করো না, বেশি বাড়াবাড়ি ভাল না।' মারীর বাবা বলত, 'আমি আরও বেশি বাড়াবাড়ি করব। এখন সরে পড় এখান থেকে।' কীরেনহান বলেছিল, 'বেশ, এমন ব্যবস্থা করব যে, তোমাকে সুন্দর মত নয় বরং একেবারে জঘন্য একটা কনসেনট্রেশন সেলে ঢোকানো হবে। এইরকম চলেছিল। যদি গাউলাইটার তার 'রক্ষণকারী হাত' দিয়ে আড়াল করে না রাখত তো মারীর বাবাকে কবেই নিয়ে যেত। গাউলাইটার কেন বাঁচিয়েছিল তা আমরা কোনও দিনই বার করতে পারিনি। লোকটা অবশ্যই সকলকে আড়াল করত না তার ঐ 'রক্ষণকারী হাত' দিয়ে। চামড়ার কারবারী মার্কস আর কম্যুনিস্ট ক্রুপেকে আড়াল করেনি। ওরা দুজনেই খুন হয়েছিল। আর গাউলাইটার-এর অবস্থা এখন বেশ ভালই, একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর মালিক। মারীর সঙ্গে একদিন দেখা হলে বলেছিল, তার নামে 'কোনও অভিযোগ নেই'। মারীর বাবা আমাকে সব সময় বলত, 'এই নাৎসীদের ব্যাপার স্যাপার কিরকম বীভৎস ছিল সে কথা বুঝতে হলে তোমাকে কল্পনা করে নিতে হবে যে, ঐ গাউলাইটারের মত একটা শুয়োরের কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ, আমি বেঁচে আছি বলে, আর তা আমাকে লিখেও দিতে হবে যে, আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ।'

ইতিমধ্যে আমি কালিকের নম্বর পেয়ে গেছি। ডায়াল করতে একটুখানি ইতস্তত করছিলাম। মনে পড়ল, কাল হচ্ছে মায়ের সেই ঘরানা উৎসব। আমি সেখানে যেতে পারতাম, অন্ততঃপক্ষে বাবা-মার পয়সায় কেনা সিগারেট আর নোনতা কাজুবাদামে পকেট বোঝাই করতে পারতাম। জলপাই-এর জন্য একটা ঠোঙা নিয়ে যেতে হত আর একটা ঠোঙা চীজ বিস্কুটের জন্য, তারপর টুপি হাতে করে চক্কর মারা। 'পরিবারের একজন বিপন্ন ব্যক্তির জন্য' চাঁদা তোলা। পনেরো বছর বয়সে একবার ও কাজ করেছি 'এক বিশেষ উদ্দেশ্যে' চাঁদা তুলেছিলাম আর প্রায় একশো মার্ক হয়েছিল। নিজের জন্য সেই টাকা খরচ

করতে আমার বিবেকে একটুও বাধেনি। কাল যদি আমি 'পরিবারের একজন বিপন্ন ব্যক্তির জন্য' চাঁদা তুলি, তাহলে তা মিথ্যা বলাও হবে না। আমি পরিবারের একজন বিপন্ন ব্যক্তি—আর তারপর রান্নাঘরে গিয়ে আমার বুকের মধ্যে কেঁদেকেটে উদ্বৃত্ত দু-চারটে সসেজের টুকরো পাচার করতে পারতাম। আমায় মায়ের চারপাশে জড়ো-হওয়া বেকুবগুলোকে আমার ঐ চাঁদা তোলাটাকে একটা চমৎকার রসিকতা বলে বুঝিয়ে দেয়া হত। আমার মা নিজে ওটাকে তেতো হাসি হেসে রসিকতা বলে মেনে নিতে বাধ্য হত—কেউই বুঝতে পারত না যে ওটা এত সত্যি। এ লোকগুলো কিছুই বোঝে না। ওরা অবশ্য সবাই জানে যে, একজন ভাল ক্লাউন হতে হলে তাকে বিষণ্ন হতেই হবে। কিন্তু সেই বিষাদ যে তার কাছে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃত, সে কথা ওরা ভাবে না। মায়ের 'ঘরানা উৎসবে' ওদের সকলের সঙ্গে দেখা হত, সবাই আসবে—সমারহ্বাল্ড আর কালিক, লিবারাল আর সোস্যাল-ডেমক্র্যাট, ছয়জন বিভিন্ন পদের প্রেসিডেন্ট, এমন কি এ্যাটম-বিরোধী লোকেরাও। (আমার মা একবার তিনদিনের জন্য এ্যাটম-বিরোধী দলে যোগ দিয়েছিল। তারপর যখন কিসের কোন এক প্রেসিডেন্ট পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলে যে, এ্যাটম-বিরোধী নীতির ফলে রাজনীতির বাজারে সরাসরি মন্দা দেখা দেবে তৎক্ষণাৎ—সত্যিই সত্যিই তৎক্ষণাৎ মা ছুটে গিয়ে টেলিফোন করে সেই কমিটি থেকে নিজেকে 'সরিয়ে' এনেছিল।) তারপর আমি—সব শেষে, টুপি হাতে করে চক্কর মারা শেষ করে, কালিককে সকলের সামনে চড় মারতাম, সমারহ্বাল্ডকে হামবড়া পাদ্রী বলে গাল পাড়তাম আর সাধারণ ক্যাথলিকদের উন্নয়ন সমিতির উপস্থিত প্রতিনিধিকে অপকর্মের প্ররোচনা আর বিবাহভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করতাম।

টেলিফোনের ডায়াল থেকে আঙুলটা সরিয়ে নিলাম, কালিককে ফোন করলাম না। ওকে কেবল জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম, ও ওর অতীতকে ইতিমধ্যে আয়ত্তে এনেছে কি না, শাসকদলের সঙ্গেও ওর সম্পর্কটা এখনও ঠিক আছে কি না, ও আমাকে ইহুদী অধ্যাত্মবাদ বুঝিয়ে দিতে পারে কি না। হিটলার-ইয়োথদের এক জমায়েতে কালিক একবার বক্তৃতা দিয়েছিল। বিষয়ঃ 'মাথিয়াভেল্লী কিম্বা শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা'। সে বক্তৃতার বিশেষ কিছু আমি বুঝিনি। যেটুকু বোধগম্য হয়েছে সে শুধু কালিকের 'স্পষ্ট, এখানে স্পষ্টভাবে বলা শক্তির স্বীকৃতি'। কিন্তু উপস্থিত

আর সব হিটলার-হীরোথদের মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে, সেই বক্তৃতা ওরাও তেমন পছন্দ করেনি। কালিক যাই হোক কদাচিৎ মাখিয়াভেলী সম্বন্ধে বলেছিল। বলেছিল, কেবল কালিক সম্বন্ধে, আর অন্য সব নেতাদের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, ওরা ঐ বক্তৃতা প্রকাশ্য-নির্লজ্জতা বলে ধরে নিয়েছিল। কতই তো আছে এমন লোক, যাদের কথা প্রায়ই কাগজে দেখা যায়—লজ্জাকে আঘাত করে এরা। কালিকের রাজনৈতিক লজ্জা আঘাতকারী ছাড়া আর কিছু না, ও যেখানেই যায় লজ্জাহতদের রেখে সেখান থেকে সরে পড়ে।

'বয়ানা উৎসবের' কথা ভেবে ভাল লাগছিল। অবশেষে আমার বাবা-মায়ের পয়সার কিছু পাওয়া যেতে পারে, জলপাই আর নোনতা কাজুবাদাম, সিগারেট—গাদা গাদা সিগারেট পকেটে পুরব আর তা কম দামে বিক্রী করব। কালিকের বুকের থেকে মেডেলটা ছিঁড়ে নেব আর ওকে চড় মারব। কালিকের সঙ্গে তুলনা করলে আমার মাকেও মানুষ মনে হয়। শেষ যেবার ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়, আমাদের বাড়িতে ওভারকোট নেবার সময়, সেবার ও আমার দিকে বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে বলেছিল, 'প্রত্যেক মানুষেরই একবার সুযোগ আসে, খ্রীষ্টানরা তাকে বলে করুণা।' আমি ওর কথার কোনও উত্তর দিইনি; আমি তো আর খ্রীষ্টান নই। আমার মনে পড়েছিল যে, সেবার ওর বক্তৃতার সময় 'নির্দয়তার ব্যাভিচার' কথাটাও ও বলেছিল আর কামুকদের মাখিয়াভেলিয়ম-এর কথা। ওর সেই যৌন মাখিয়াভেলিয়ম-এর কথা ভাবলে, ও যেসব বেশ্যাদের কাছে যেত তাদের জন্য আমার করুণা হত। যেমন করুণা হত আমার, বউদের জন্য, যারা কোনও এক অস্বাভাবিক কাজের জন্য চুক্তির দ্বারা দায়বদ্ধ। অসংখ্য সুন্দরী যুবতী মেয়েদের কথা ভাবছিলাম। ওদের এমন ভাগ্য যে, হয় ওরা পয়সার জন্য কালিকের মত লোকের সঙ্গে, কিম্বা পয়সা ছাড়াই স্বামীর সঙ্গে এমন একটা কাজ করবে, যা করতে তাদের মন কিছুতেই চায় না।

১৮

কালিকের নম্বরের বদলে সেই জায়গাটার নম্বর ডায়াল করলাম, যেখানে জেরো থাকে। কখনও না কখনও তো খাওয়া শেষ হবে, শেষ হবে ওদের নৈতিক চরিত্র সংশোধনী শাক-পাতা গলাধঃকরণ। আগের বারের সেই গলাটা শুনতে পেয়ে খুশি হলাম। এবার লোকটা একটা চুরুট ধরিয়েছে, কাজেই বাঁধাকপির গন্ধটা আর ততটা প্রকট নয়। বললাম, 'শ্রীয়ার—মনে আছে আমার কথা?'

হাসল সে। বলল, 'নিশ্চয়, আশা করছি আমার কথাটার তেমন গুরুত্ব দেননি, অগাস্টিনাসটা পুড়িয়ে ফেলেননি সত্যি সত্যি।'

'নিশ্চয়।' বললাম, 'ফেলেছি পুড়িয়ে। ছিঁড়ে আলাদা করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছি উনুনে।'

একটু সময় চুপ করে থাকল। 'ঠাট্টা করছেন,' বলল রুক্ষ গলায়।

'উঁহু,' বললাম, 'এসব ব্যাপারে আমি খুঁত রাখি না।'

'হায় ঈশ্বর,' বলল, 'আমার কথার ডায়ালেক্‌টিক ব্যাপারটাই বোঝেননি নাকি?'

'না,' বললাম, 'আমি মশাই সোজা কথার মানুষ, প্যাঁচ-ঘোঁচ বুঝি না। এখন বলুন দেখি, আমার ভাই-এর খবর? মহাশয়রা দয়া করে খাওয়ার পাট কখন শেষ করবেন?'

'এই মাত্র শেষ পদ পৌঁছেছে', বলল সে। 'আর বেশি দেরি হবে না।'

'মালটা কি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'শেষ পদ?'

'হ্যাঁ।'

'আসলে আমার বলবার কথা নয়। তবে আপনাকে বলছি। প্লাম কম্‌পট্‌, তার ওপর খানিকটা ঘন দুধ। দেখতে চমৎকার। প্লাম ভালবাসেন?'

'না,' বললাম, 'প্লামের ব্যাপারে আমার বিতৃষ্ণা যেমন বুঝিয়ে বলা যায় না, তেমনি কাটিয়ে ওঠাও যায় না।'

'আপনার উচিত একবার হেব্যায়ার-এর মেজাজ বা খেয়ালের ওপর লেখাটা পড়ে দেখা। সব কিছুরই মূলে একটাই কারণ, খুব অতীতের

কোনও অভিজ্ঞতা বেশির ভাগই জন্মের আগের। চমৎকার। হোব্যারার আটশো কেস খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছে। আপনার সব সময় মন খারাপ লাগে ?'

'কী করে জানলেন সেকথা ?'

'গলা শুনেই টের পাচ্ছি। আপনার উচিত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা আর ভাল করে স্নান করা।'

'স্নান তো করেছি, তো প্রার্থনা করা হবে না আমার দ্বারা।' জবাব দিলাম।

'চিন্তার কথা'—সে বলল, 'আমি আপনাকে নতুন একটা অগাস্টিনাস্ দেব কিম্বা কীর্কেগার্ড।'

'ওটা আছে এখনও।' বললাম, 'আচ্ছা, আমার ভাইকে আর একটা কথা বলে দেবেন ?'

'নিশ্চয়।'

'ওকে বলবেন, ও যেন আমার জন্য কিছু টাকাকড়ি নিয়ে আসে। যতটা পারে।'

লোকটা আপন মনে বিড়বিড় করল, তারপর বলল, 'লিখে রাখলাম। যতটা সম্ভব টাকাকড়ি নিয়ে যেতে হবে। ভাল কথা, বোনাভেন্টুরাটা আপনার পড়ে রাখা দরকার। দারুণ—তা বলে উনবিংশ শতাব্দীকে অত শাপ-শাপান্তি করবেন না। আপনার গলা শুনে মনে হয় আপনি উনবিংশ শতাব্দীকে খিস্তি করেন।'

'ঠিক বলেছেন,' বললাম, 'দু চক্ষে দেখতে পারি না।'

'ভুল,' বলল সে, 'বাজে ধারণা। বাড়িঘর বানিয়েছিল দেখেছেন ? তাও তেমন খারাপ নয়। উনবিংশ শতাব্দীকে ঘেন্না করার আগে বিংশ শতাব্দীর শেষটা আগে দেখুন। কথা বলতে বলতে যদি আমি আমার শেষ পদটা খাই, তাতে আপনার আপত্তি আছে ?'

'প্রাম ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না' বলল, 'আমি বর্তমানে শাস্তি ভোগ করছি। ওদের খানা আমাকে দেয়া হয় না, আমি পাই চাকর-বাকরের খাবার। আজকে ক্যারামেল পুডিং।' ভাল কথা। বেশ বোঝা গেল লোকটা এক চামচ মুখে পুরে দিয়েছে, গিলে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'যা বলছিলাম, আমিও শোধ নিই।

পুরোনো এক কনভেন্ট-এর বন্ধুর সঙ্গে ঘন্টার পর ঘণ্টা টেলিফোন করি, সে মিউনিকে থাকে। ও লোকটাও লেলার-এর ছাত্র ছিল। কখনও কখনও হাম্বুর্গের সিনেমা হলে ফোন করি, কিম্বা বার্লিনের আবহাওয়া অফিসে, খোঁজ নেবার জন্য। আজকালকার এই টেলিফোনে আর কেউ তা ধরতেও পারবে না।' আবার খেল, জড়ানো শব্দ হল, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'গীর্জার অনেক টাকা ; প্রচুর টাকা। টাকা পচছে, গন্ধ বেরোয়, ঠিক বড়লোকের লাশ পচলে যে গন্ধ হয়, তেমনি গন্ধ।—জানতেন সে কথা ?'

'না', বললাম। টের পাচ্ছিলাম মাথাধরাটা আস্তে আস্তে কমের দিকে, ঐ জায়গাটার নম্বরের চারপাশে একটা লাল বৃত্ত আঁকলাম।

'আপনি ধর্মে বিশ্বাস করেন না, তাই না ? না, বলবেন না, আপনার গলা শুনেই বুঝতে পেরেছি যে আপনি ধর্মে বিশ্বাস করেন না। ঠিক কিনা ?'

'হ্যাঁ', বললাম।

'তাতে কিছু যায় আসে না, কিচ্ছুই যায় আসে না,' বলল 'ইসাইয়াসে এক জায়গায় আছে। পাউলুস তো তা রোমের চিঠিতে তুলেই দিয়েছে। ভাল করে শুনুন, 'তাহারা দেখিবে, যাহাদের নিকট তাঁহার কথা অদ্যাপি কথিত হয় নাই এবং তাহারা বুঝিবে যাহারা অদ্যাপি জ্ঞাত হয় নাই।' অসভ্যের মত হাসতে লাগলো খিক্‌খিক্ করে। 'বুঝেছেন ?'

'হ্যাঁ,' বললাম, সাদামাটাভাবে।

লোকটা চেঁচিয়ে বলল, 'গুড ইভনিং, ডিরেক্টর স্যার, গুড ইভনিং।' তারপর রেখে দিল। ওর গলাটা শেষের দিকে কেমন বিশ্রীরকম বিনীত শোনাল।

আমি জানলার কাছে গিয়ে বাইরের কোণের দিকে ঘড়িটা দেখলাম। প্রায় সাড়ে আটটা হয়ে গেছে। মনে হল ওরা বেশ রসিয়ে রসিয়ে খায়। লেয়োর সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালই হত। কিন্তু ও আমাকে যা ধার দেবে সেটাই এখন বলতে গেলে আসল কথা। আস্তে আস্তে আমার দুরবস্থাটা পরিস্কার হচ্ছে। মাঝে মাঝে বুঝে উঠতে পারি না। এই যে যা ধরা-ছোঁয়া যায়, যা প্রকৃতপক্ষে ঘটে তাই সত্যি, নাকি আমার প্রকৃত অভিজ্ঞতা সত্যি। সব জিনিস আমার গোলমাল হয়ে যায়। ওস্‌নাব্রুকের সেই ছেলেটাকে আমি দেখেছিলাম কি না, তা আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি না। কিন্তু লেয়োর সঙ্গে বসে কাঠ কেটেছিলাম করাত দিয়ে—সেটা আমি শপথ নিয়ে বলতে পারতাম। ঠাকুর্দার চেকটা ভাঙিয়ে বাইশ মার্ক পাবার জন্য এতবার

ব্রাৱেকেন-এর ওখানে কাল্কে অবধি পারে হেঁটে গিয়েছিলাম কিনা, তাও আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি না। আমি খুঁটিনাটি খুব ভাল মনে করতে পারি। তাই বলে যে মেয়েটা আমাকে রুটি দিয়েছিল তার ব্লাউসের রঙটা যে সবুজ ছিল, কিম্বা আমি যখন দরজার গোড়ায় এডগারের আশায় বসে ছিলাম তখন যে জোয়ান মজুরটা আমার সামনে দিয়ে গিয়েছিল, তার মোজার ফুটো-গুলোর কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। আমি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত যে, সেই করাত চালাবার সময় আমি লেয়োর ওপরের ঠোঁটে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে দেখেছি। কোলন্-এ যেবার মারীর প্রথম গর্ভপাত হয় সেই রাত্রের যাবতীয় খুঁটিনাটি আমি মনে করতে পারি। হাইনরিখ বেলেন ছোট ছেলেমেয়েদের শো করবার কয়েকটা কাজ করে দিয়েছিল। প্রত্যেক শোতে কুড়ি মার্ক। প্রায় সময়েই মারী সঙ্গে যেত। শরীর খারাপ লাগছিল বলে সেদিন বাসায় থেকে গিয়েছিল। পকেটে নিট লাভ উনিশ মার্ক নিয়ে যখন রাত করে বাড়ি ফিরলাম, দেখি ঘর ফাঁকা, বিছানার ওপর রক্তমাখা চাদর আর শেল্ফ-এর ওপর চিরকুটটা। 'আমি হাসপাতালে, তেমন কিছু না। হাইনরিখ সব জানে।' তক্ষুনি ছুটলাম। হাইনরিখের বদমেজাজী কাজের মেয়েলোকটা বলল, মারী কোন্ হাসপাতালে। ছুটলাম সেখানে, কিন্তু ওরা আমাকে ঢুকতে দিল না। সেই হাসপাতালে হাইনরিখকে খুঁজে বার করে তাকে দিয়ে ফোন করালো, তারপর গেটের নানরা আমাকে ঢুকতে দিল। ততক্ষণে রাত সাড়ে এগারোটা হয়ে গেছে। অবশেষে যখন মারীর ঘরে পৌঁছুলাম ততক্ষণে সব শেষ। মারী বিছানায় শোওয়া, একদম ফ্যাকাসে, কাঁদছে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে একজন নান প্রার্থনা করছে। নানটা প্রার্থনা করেই চলল, আর হাইনরিখ মারীকে চাপা গলায় বোঝাতে চেষ্টা করতে থাকল—যার জন্ম ও দিতে পারল না তার আত্মার কী গতি হতে পারে। আমি গিয়ে মারীর হাত ধরে থাকলাম। মনে হল, মারীর বদ্ধ ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, বাচ্চাটা, ও তাই বলত—কখনও স্বর্গে যেতে পারবে না, কারণ ওর ব্যাপটিস্‌ম্ হয় নি। ও কেবলই বলছিল, ওটা নরকের মুখে থাকবে। আর সেই রাত্রেই আমি প্রথম জানলাম, ক্যাথলিকরা ধর্মের নামে কি সব জঘন্য জিনিস শেখায়। মারীর সেই আতঙ্কের কাছে হাইনরিখ সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছিল। আর ও যে অসহায় হয়ে পড়েছিল, সেইটাই আমার সান্ত্বনা মনে হচ্ছিল। ও ঈশ্বরের করুণার কথা বলছিল, সেটা তো অবশ্যই 'ধর্মবিদদের আইনের

বিচারের তুলনায় অনেক বেশী মহৎ।’ সারাটা সময় নাল্জা প্রার্থনা করে চলেছিল। ধর্মের ব্যাপারে মারীর বেশ কিছু গোঁয়ার্তুমী আছে। ও কেবলই জিজ্ঞেস করেছিল, কল্পনা আর আইনে তাহলে কোথায় সংঘর্ষ। সংঘর্ষ শব্দটা আমার বেশ মনে আছে। শেষ কালে আমি বাইরে চলে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, আমাকে জোর করে বার করে দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত। বাইরে এসে আমি জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, সিগারেট খাচ্ছিলাম। প্রাচীরের ওপাশে পুরোনো গাড়িগুলো সব ঢিপি করে রাখার জায়গা, সেদিকে তাকিয়েছিলাম। প্রাচীরের গা ভর্তি ভোটের পোস্টার। এস. পি. ডি-কে বিশ্বাস কর। সি. ডি. ইউ-কে ভোট দাও। যেসব রোগীরা তাদের ঘরের ভেতর থেকে প্রাচীরের দিকে তাকাতে পারবে, নিজেদের অকথ্য বোকামির সাহায্যে তাদের হতাশ করাটাই ওদের উদ্দেশ্য বলে মনে হচ্ছিল। বিশেষ করে এস. পি. ডি-কে বিশ্বাস কর ব্যাপারটা বেশ চমকপ্রদ। ছাঁদামি করে ছাপা সি. ডি. ইউ-কে ভোট দাও-এর পাশে তো সাহিত্যকর্ম বলেই মনে হচ্ছিল। তখন প্রায় রাত দুটো হয়ে এসেছে। পরে আমি মারীর সঙ্গে ঐ নিয়ে তর্ক করেছি, আমি তখন যা দেখেছিলাম, তা সত্যিই ঘটেছিল কি না। বাঁ দিক থেকে একটা নেড়ী কুকুর এসেছিল। ল্যাম্প-পোস্টের গন্ধ শুঁকেছিল, তারপর এস. পি ডি-র পোস্টারের আর পি. ডি. ইউ-এর পোস্টারের। শেষে সি. ডি. ইউ পোস্টারে পেচ্ছাব করে অন্ধকার রাস্তা ধরে চলে গেল ধীরে সুস্থে। রাস্তার ডানদিকটা একদম অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল তখন। পরে আমরা যখনই সেই সান্ত্বনাহীন রাতের কথা বলেছি মারী কুকুরের প্রসঙ্গটা বাদ দিত। আর কুকুরটা ‘মেনে’ নিলেও, ওটা যে সি. ডি. ইউ-এর পোস্টারে পেচ্ছাব করেছিল সে নিয়ে তর্ক করতো। ও বলত, আমার ওপর নাকি ওর বাবার প্রভাব বড় বেশি। তাই মিথ্যা বলতে বা সত্যকে বিকৃত করা সম্বন্ধে সচেতন না হয়েও আমি ধারণা করে নিয়েছি যে, কুকুরটা সি. ডি. ইউ পোস্টারে ‘অপকর্ম’টা করেছিল। এস. পি. ডি পোস্টারে করে থাকলেও আমি ধরে নিয়েছি ওটা সি. ডি. ইউ পোস্টার। ওদিকে ওর বাবা কিন্তু সি. ডি. ইউ-এর চেয়ে এস. পি. ডি-কে বেশি খিস্তি করতো—আর আমি যা দেখেছি, তা ঠিকই দেখেছি।

হাইনরিখকে যখন তার বাসায় পেঁাছে দিচ্ছি তখন প্রায় পাঁচটা। যখন

আমরা এরেনফেল্ড-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তখন 'ও' সব বাড়ির দরজাগুলো দেখিয়ে বারেবারেই বিড়বিড় করে বলছিল 'সবই আমার প্রিয়, সবই আমার প্রিয়।' তারপর ওর খেঁকিয়ে ওঠা কাজের মেয়েলোকটা যার পা দুটো হলুদ, বিশ্রীভাবে ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, এ সবের মানে কি? আমি বাড়ি গিয়ে গোপনে ধুয়ে ফেললাম বিছানার চাদরটা, বাথরুমের ঠাণ্ডা জলে।

এরেনফেল্ড, কয়লার গাড়ি, কাপড় শুকোবার তার, স্নান নিষেধ আর মাঝে মাঝে রাত্রে আমাদের জানলার পাশ দিয়ে হুসহুস করে পড়া জঞ্জালের প্যাকেট, যেন বোমা। সমস্ত আতঙ্ক প্যাকেটটা ফেটে পড়ার বিস্ফোরণেই শেষ। বড় জোর একটা ডিমের খোসা ছিটকে বেরিয়ে যেতে যেতে একটু সময় জাইয়ে রাখে।

আমাদের জন্য হাইনরিষ তার পাদ্রীর সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েছিল। ও কারিটাস তহবিল থেকে টাকা তুলতে চেয়েছিল তাই। তখন আমি আবার একবার এডগার হ্বীনেকেন-এর ওখানে যাই। লেয়ো ওর পকেট-ঘড়িটা পাঠিয়ে দিয়েছিল, বন্ধক দিয়ে কিছু টাকাকড়ি যোগাড় করতে। এডগার এক শ্রমিক-কল্যাণ সমিতির থেকে আমাদের জন্য কিছু যোগাড় করেছিল। তাই নিয়ে আমরা যাহোক করে ওষুধ-পত্রের দাম, ট্যাক্সি ভাড়া আর ডাক্তারের পাওনার অর্ধেকটা মিটিয়েছিলাম।

মারীর কথা মনে পড়ছিল, প্রার্থনা করছিল সেই নানটার কথা, সংঘর্ষ শব্দটার কথা, কুকুরটা, ভোটের পোস্টারগুলো, ভাঙা মোটর গাড়ির গাদা, আর ভাবছিলাম আমার ঠাণ্ডা হাতের কথা। বিছানার চাদর ধোবার পর ও দুটো জমে গিয়েছিল,—এ সবের কোনটাই কিন্তু শপথ নিয়ে বলতে পারতাম না। আর একটা কথাও আমি শপথ নিয়ে বলতে চাই না যে, লেয়োদের কনভেন্ট-এর ঐ লোকটা আমাকে বলেছিল, গীর্জার ক্ষতি করবার জন্য লোকটা টেলিফোন করে বার্লিনের আবহাওয়া অফিসে। কিন্তু আমি তো বেশ শুনেছি, ক্যারামেল পুডিং খাচ্ছিল, সক্‌সক্‌ শব্দ করছিল, গিলছিল লোকটা।

১৯

বেশি ভাবনা চিন্তা না করে কি বলব তা না জেনেই, আমি মনিকা সিল্‌ভস্‌-এর নম্বরটা ডায়াল করলাম। প্রথম শব্দটা শেষ হবার আগেই ও রিসিভার তুলে বলেছিল, 'হ্যালো'।

ওর গলাটা শুনেই বেশ লাগল। মেয়েটি বুদ্ধিমতী আর শক্ত স্বভাবের। আমি বললাম, 'হান্স বলছি, আমি…'। আমার কথা শেষ হবার আগেই ও বলল, 'আঃ আপনি…'। বলার ধরনটায় হতাশা বা অস্বস্তি ছিল না, তবে বেশ বোঝা গেল, আমার টেলিফোন আশা করেনি, আশা করেছিল অন্য কারও; হয়তো ওর বান্ধবীর বা ওর মায়ের ফোন আশা করেছিল—যাই হোক, আমিই হতাশ হলাম।

'আমি শুধু ধন্যবাদ জানাতে চেয়েছিলাম,' বললাম, 'আপনি অনেক করেছেন।' ওর পারফিউমের গন্ধটা স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম, টাইগা, না কি যেন নাম, তবে ওকে মানায় না।

'আমার খুব খারাপ লাগছে,' বলল, 'আপনার নিশ্চয় খুব লেগেছে।' আমি বুঝতে পারছিলাম না, কোন্‌ কথা বলছে: কোস্টার্ট-এর সমালোচনা, সমস্ত বন্‌-শহর তো ওটা পড়েছে মনে হচ্ছে, নাকি মারীর বিয়ে, নাকি দুটোই।

'আমি কি কিছু করতে পারি আপনার জন্য?' আস্তে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ,' বললাম, 'আমার এখানে চলে আসতে পারেন আর আমার মানসিক অবস্থার জন্য মমতা দেখাতে পারেন, আমার হাঁটুটার জন্যও, বেশ ফুলে উঠেছে ওটা।'

ও চুপ করে থাকল। আমি আশা করেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ বলবে, ও যে চলে আসতে পারে তা ভেবেই অদ্ভুত লাগল। কিন্তু ও বলল, 'আজ নয়, আমার এখানে একজনের আসবার কথা আছে।' ও বলতে পারত কে আসবে, অন্তত একজন বান্ধবী বা বন্ধুর আসবার কথা আছে বলতে পারত। ঐ একজন শব্দটা শুনে আমার খুব খারাপ লাগল। আমি বললাম, 'তাহলে কাল। আমাকে খুব সম্ভব সপ্তাহখানেক শুয়ে থাকতে হবে।'

'আপনার জন্য আর কিছু করতে পারি না? টেলিফোনে সারা যায় এমন একটা কিছু।' কথাকটা ও এমনভাবে বলল যে, আমার আশা হল সেই একজন তাহলে বান্ধবীই হবে।

'হ্যাঁ,' আমি বললাম, 'শোপ্যাঁর মাজুরকা, বি-ফ্লাট ওপ্‌স ৭ বাজিয়ে শোনাতে পারেন।'

হেসে বলল, 'আপনার মাথায় আসেও বটে।' ওর বলার ধরনে এই প্রথম আমার একপত্নীত্বে বিশ্বাসী চরিত্রে একটা ধাক্কা লাগল। 'শোপ্যাঁ আমার তেমন ভাল লাগে না,' বলল, 'আর, ভাল বাজাতেও পারি না।'

'আঃ ভগবান,' বললাম, 'তাতে কি। সরগমের কাগজগুলো আছে আপনার কাছে?'

'আছে কোথাও,' বলল, 'একটু ধরুন।' রিসিভারটা রাখল টেবিলের ওপর, ঘরের ভেতরে যাবার শব্দ শুনতে পেলাম। ওর ফিরে আসতে বেশ একটু সময় লাগল। আমার মনে পড়ল, মারী একবার বলেছিল, কিছু ধার্মিক লোকেরও বান্ধবী থাকে। অবশ্যই ধর্মসংক্রান্ত সম্বন্ধ, যাই হোক না কেন, ঐ ব্যাপারে যেটুকু ধর্ম রয়েছে, মেয়েরা সেটুকু তাদের দেয়। আমার তো তাও নেই।

মনিকা আবার রিসিভারটা তুলল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'হ্যাঁ মাজুরকাগুলো পেয়েছি।'

'বেশ তো,' বললাম, 'এবার বি-ফ্লাট ওপ্‌স ৭ নম্বরের প্রথমটা বাজান।'

'বেশ কয়েক বছর হল শোপ্যাঁ বাজাইনি, একটুখানি বাজিয়ে অভ্যাস করে নিতে হবে।'

'আপনার ওখানে যে আসবে, সে আপনাকে শোপ্যাঁ বাজাতে দেখবে, এটা বোধ হয় আপনি তেমন চান না?'

ও হেসে বলল, 'ওহ্, সে লোক অনায়াসে শুনতে পারে।'

'সমারহ্বীল্ড?' জিজ্ঞেস করলাম খুব আস্তে, ওর অবাক হওয়ার শব্দটা শুনতে পেলাম। তারপর বললাম, 'সত্যিই যদি সমারহ্বীল্ড হয় তবে ওর মাথার ওপর পিয়ানোর ঢাকনাটা আছড়ে বন্ধ করে দেবেন।'

'ওরকম বলছেন কেন,' বলল, 'ও আপনাকে খুব পছন্দ করে।'

'জানি,' বললাম, 'চাইকি তা বিশ্বাসও করি। কিন্তু, আমার যদি সাহস থাকত তাহলে আমি ওকে খুন করতাম, সেটাই ভাল হতো।'

'আমি একটু বাজিয়ে নিয়ে আপনাকে শোনাব'। বলল তাড়াতাড়ি, 'আমি কোন কল্পথ আপনাকে।'

'বেশ,' বললাম। কিন্তু আমরা কেউই রিসিভার রাখলাম না; ওর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, জানিনা কতক্ষণ, কিন্তু শুনছিলাম, তারপর ও রেখে দিল। ওর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনবার জন্য আমি আরও অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকতে রাজী ছিলাম। সাবাস, একজন মহিলার নিঃশ্বাস অন্তত শুনতাম।

এর আগে খাওয়া শিমগুলো পেটের ভেতর গজগজ করছিল আর আমার মনের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছিল, তবুও রান্নাঘরে গেলাম, কড়াইশুঁটির কৌটোটা খুলে ওগুলো এর আগে ব্যবহার করা প্যানটার মধ্যে ঢাললাম। ঢেলে গ্যাস জ্বালালাম। কফির অবশিষ্ট সমেত ফিলটার পেপারটা জঞ্জালের বালতিতে ফেললাম। একটা পরিষ্কার ফিলটার পেপার নিয়ে তার মধ্যে চার চামচ কফির গুঁড়ো দিলাম। তারপর জল বসিয়ে রান্নাঘরটা একটু গোছাতে চেষ্টা করলাম। আগের বার কফি পড়ে যা নোংরা তৈরি হয়েছিল তার ওপর দিয়ে ন্যাতাটা বোলালাম, খালি কৌটোগুলো আর ডিমের খোসা সব জঞ্জালের বালতিতে ফেললাম। অগোছাল ঘর দেখলে আমার ঘেন্না করে, কিন্তু নিজেও গোছাতে পারি না। বসবার ঘর থেকে নোংরা গ্লাসগুলো এনে ওয়াশ বেসিনে রাখলাম। কিছুই আর বেজায়গার রইল না, কিন্তু তবুও গোছানো মনে হয় না। মারী কেমন সুন্দর চটপটভাবে সব করে, ফ্ল্যাটটা বেশ গোছানো দেখায়। যদিও কি করে তা হয় ঠিক দেখা বা বোঝা যায় না। বোধ হয়, ওর হাত দুটোর জন্যই অমন হয়। মারীর হাতের কথা মনে পড়তে আমার মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল, কেমন গোলমাল হয়ে গেল সব। মারী ৎস্যুফনারের কাঁধে হাত রাখতে পারে ভাবতেই ওরকম হল। মেয়েরা হাত দিয়ে কত কথাই প্রকাশ করতে পারে কিংবা আড়াল করতে পারে। সেই তুলনায় পুরুষদের হাত আমার কাছে সবসময় কেমন কাঠ-কাঠ মনে হয়। পুরুষদের হাত হ্যান্ডশেক করার জন্য, পেটাবার জন্য। বন্দুক ছোঁড়বার জন্য তো বটেই, সেই সঙ্গে সই করবার জন্য। চেপে ধরা, পেটানো, বন্দুক ছোঁড়া, চেক সই করা—ব্যস্ ওই সব। পুরুষের হাত তাই পারে, আর পারে কাজ করতে। মেয়েদের হাত বলতে গেলে

হাতেই নয়, তা সে রুটিতে মাখনই লাগাক, বা কপালের চুলই সরিয়ে দিক। আজ অবধি কোনও থিয়োলজিস্ট-এর মাথায় আসেনি, মেয়েদের হাত দিয়ে ঈভাঞ্জেলিয়াম-এ বক্তৃতা করবার কথা। ভেরোনিকা, মাগডালেনা, মারিয়া আর মার্থা—ঈভাঞ্জেলিয়ামে কতই তো আছে মেয়ে যাদের হাত খ্রীস্টকে আরাম দিয়েছে। তা না কপে ওরা বক্তৃতা করে আইন, শৃঙ্খলা, শিল্প, রাষ্ট্র নিয়ে। যীশু তো বলতে গেলে এমনিতে শুধু মেয়েদের মধ্যেই থাকত। পুরুষ দরকার ছিল তার নিশ্চয়। কালিকের মত লোক, যার সঙ্গে শাসকদের একটা সম্পর্ক আছে, সন্ধবন্ধ করবার ক্ষমতা এবং ঐজাতীয় সব হাবিজাবি ব্যাপারে হাত আছে। পুরুষের দরকার ছিল তার অনেকটা আমাদের যেমন বাসা পাল্টাবার সময় আসবাবপত্র ইত্যাদি প্যাক করার কাজে দরকার হয়, ভারী কাজে। আর পিটার আর যোহান তো এত প্রিয় ছিল যে, ওদের আর পুরুষ না বললেই চলে, ওদিকে পল ছিল ঐ রোমের পুরুষেরা যেমন ছিল সে সময়, সেই রকম। আমাদের বাড়িতে একটা উপলক্ষ পেলেই বাইবেল পড়ে শোনানো হতো, কারণ আমাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একগাদা পাদ্রী ছিল। কিন্তু কেউ কোনওদিন ঈভাঞ্জেলিয়ামে মেয়েদের সম্বন্ধে বা ঐ অনুচিত কোটিপতিদের সম্বন্ধে বলেনি। ক্যাথলিকদের ঐ 'চক্রেও' কেউ কখনও অনুচিত কোটিপতিদের সম্বন্ধে কথা বলতে চায়নি। আমি যখনই সেকথা তুলেছি, কিংকেল আর সমারহ্বাল্ড অপ্রস্তুতভাবে মুচকে হেসেছে—ভাবটা যেন খ্রীস্টের এক অস্বস্তিকর ভুল ধরা পড়ে গেছে। আর ব্লেডেবয়েল বলত, ঐ 'অসঙ্গতি' ওর মনোমত নয়, অসঙ্গত হচ্ছে ইতিহাসের টানাপোড়েনের ফলে সৃষ্ট ঐ 'অনুচিত কোটিপতি' কথা। যেন টাকাকড়ি ব্যাপারটা খুব সঙ্গত একটা কিছু। মারীর হাতে পড়লে টাকাকড়িও তার সেই অবস্থা হারাত। ওর এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বেহিসাবী আবার সেই সঙ্গে বিচক্ষণ খরচ করবার। চেক বা অন্য কোনও কিছু আমি কখনও নিতাম না বলে আমার প্রাপ্য আমি সব সময় ক্যাশ পেতাম, আর তাই দুদিন বা বড় জোর তিনদিনের বেশি সময় আমাদের কখনই লাগত না, কি করব ঠিক করতে। মারীর কাছে যে চাইত সে-ই টাকাপয়সা পেত, কখনও কখনও অনেকে না চাইতেই পেত—হয়তো তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছে তাদের অর্থকষ্ট চলছে। গ্যোটিঙ্গেনের এক হোটেল বয়ের ছেলে স্কুলে যাবে, তার শীতের ওভারকোটের দাম মারী দিল, অসহায় অবস্থায় কেউ পড়লেই মারী

সাহায্য করত। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসের কামরায় উঠে পড়েছে এক বুড়ী দিদিমা, কার মৃত্যুসংবাদ শুনে যাচ্ছে, তার টিকিটের সব পাওনা মারী মেটাল। প্রচুর বুড়ী দিদিমা আছে, তারা ট্রেনে করে যায় নাতির, ছেলের, ছেলের বৌ-এর বা মেয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে—অনেক সময় বুড়ী দিদিমাদের যেমন হয়—মস্ত এক ভারী বাক্স, প্যাকেট ভর্তি সসেজ, বেকন, কেক এনে ফেলে ফার্স্ট ক্লাসের কামরায়। মারীর তাড়ায় আমি গিয়ে সেইসব ভারী বোঝা জায়গামত রাখি। সবাই কিন্তু জানে দিদিমার কাছে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট। মারী তারপর বাইরে করিডোরে গিয়ে টিকিটচেকারের সাথে সব 'মিটমাট' করে। এসবই ঘটে যায় দিদিমার ভুল ভাঙবার আগে। মারী আগেই জিজ্ঞেস করে নিত সব সময়, কতদূর যাবে আর কে মারা গেছে—যাতে টিকিটের দামটা পুরো দিতে পারে। দিদিমাদের মন্তব্যগুলো বেশির ভাগ সময়েই শুনতে খুব ভাল, 'আজকালকার ছেলেমেয়েদের যতটা খারাপ বলা হয় ততটা খারাপ তারা নয়।' আর পাওয়া যেত বেশ মোটাসোটা হ্যামরুটি। আমার প্রায়ই মনে হতো, বিশেষ করে ডর্টমুণ্ড আর হ্যানোভারের মধ্যেই যেন রোজ এই দিদিমারা যাতায়াত করত। আমরা ফার্স্ট ক্লাসে যাতায়াত করতাম বলে মারীর খুব লজ্জা ছিল। আর, কেউ সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট নিয়ে উঠেছে বলে তাকে নামিয়ে দেবে, তা ওর পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব ছিল। আত্মীয়তার জট ছাড়ানো, শুনবার বা সম্পূর্ণ অচেনা লোকদের ছবি দেখবার মত সাংঘাতিক ধৈর্য ছিল ওর। একবার আমরা দুঘণ্টা ধরে বসেছিলাম ব্লুকেবুর্গের এক চাষীবৌ-এর পাশে, তার তেইশটি নাতি-নাতনী, প্রত্যেকের একটা করে ফটো তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো। তেইশজনের জীবনকাহিনী শুনেছিলাম, তেইশটা যুবক যুবতীর ফটো দেখেছিলাম, তারা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু হয়েছে। মুনস্টারের মিউনিসিপ্যালিটির ইন্‌সপেক্টর, কিম্বা বিয়ে হয়েছে এ্যাসিস্টেণ্ট স্টেশনমাস্টারের সাথে, করাতকলে বড় চাকরী করে। আর, একজন একটা 'পার্টি' অফিসে কাজ করে, যে পার্টিকে আমরা ভোট দিই। জানেন তো, অন্য একজন মিলিটারিতে, বুড়ীর মন্তব্য, 'ও সবসময় ভাল দেখে একটা কিছু করবে তা আমরা জানতাম।' মারী সবসময় এইসব গল্পে ডুবে যেত, ওর কাছে ওসব খুবই ভাল লাগত, বলত 'প্রকৃত জীবনের' কথা। ঐ জাতীয় একই গল্প বারে বারে শুনে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। ডর্টমুণ্ড আর হ্যানোভারের মধ্যে কত যে দিদিমা ছিল যাদের নাতিরা

এ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশনমাস্টার ছিল, আর যাদের নাতবৌরা অকালে মারা গেছে, কারণ, 'তারা তো আর সব বাচ্চার জন্ম দেয় না, আজকালকার বৌরা— আসল কথাটা তাই'। মারী পারত, মিষ্টি করে সুন্দর করে এইসব বৃদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলতে, ওদের তো সাহায্য দরকার। সুযোগ পেলেই মারী ওদের টেলিফোন করতেও সাহায্য করত। একবার বলেছিলাম, ওর স্টেশনের মিশনারী দলে যাওয়া উচিত ছিল। তাতে ও একটু অসন্তুষ্টভাবে বলেছিল, 'কেন যাব না?' আমি আদৌ রাগ করে বা কিছু মনে করে কথাটা বলিনি। এখন তো ও একরকমের স্টেশনের মিশনারী দলে। আমার মনে হয় স্ট্যেফ্‌নার মারীকে বিয়ে করেছে ওকে উদ্ধার করবার জন্য, আর মারীও ওকে 'উদ্ধার' করবার জন্য। আমি কিন্তু ঠিক জানি না, স্ট্যেফ্‌নার তার পয়সায় দিদিমাদের টিকিটের দাম দিতে দেবে কিনা। স্ট্যেফ্‌নার কৃপণ নয়, কখনই নয়, তবে ঐ লেয়োর মত যাচ্ছেতাই রকমের আকাঙ্ক্ষাহীন। ফ্রান্‌ৎস্‌ফন আসিসির মত আকাঙ্ক্ষাহীনও নয়। ফ্রান্‌ৎস্‌ফন আসিসি নিজে আকাঙ্ক্ষাহীন হলেও অন্যের আকাঙ্ক্ষার কথা বুঝতো। মারীর ব্যাগে স্ট্যেফ্‌নারের টাকাপয়সা আছে ভাবতেও আমার অসহ্য লাগছিল। যেমন অসহ্য ওই হানিমুন বা সেই ধারণা যে আমি মারীর জন্য মারপিট করব। মারপিট তো গা-হাত-পা দিয়ে করতে হয়। যত খারাপ ক্লাউনই হই না কেন, স্ট্যেফ্‌নার বা সমারহবীল্ড-এর তুলনায় আমার ক্ষমতা সেদিক দিয়ে অনেক বেশি। ওরা ঠিকমত দাঁড়াবার আগেই আমি তিনবার ডিগবাজী খেয়ে নিতে পারি, ওদের পেছনদিক থেকে পাকড়াও করে চিৎ করে ফেলে থামিয়ে ফেলতে পারি। নাকি ওরা দস্তুরমত দাঙ্গাবাজীর কথা ভাবে? নিবেলুঙের কথায় এ জাতীয় বিকৃত প্রবৃত্তি ওদের হতে পারে। নাকি ওরা বুদ্ধির লড়াই-এর কথা ভেবেছিল? ওদের আমি ভয় পাই না। মারীকে লেখা চিঠিগুলোতে তো আমি একরকম বুদ্ধির লড়াই-এরই আভাস দিয়েছি, ওকে সেগুলোর উত্তর দিতে দেয়া হয়নি কেন তবে? ওরা উচ্চারণ করলো হানিমুন, মধুচন্দ্রিমা জাতীয় কথা, চেয়েছিল আমি খিস্তি করি, যতসব হামবড়ার দল। ওদের শুধু একবার শোনার দরকার, হোটেলের ঝিরা আর পাব-এর বেয়ারারা হানিমুন সম্বন্ধে কিসব কথা বলে। ট্রেনে, হোটেলে, ঐ হানিমুন করনেবালারা যেখানেই যায়, সবাই জানে, একটা বাচ্চা ছেলেও জানে যে ওরা সবসময় সেই 'ব্যাপারটা' করে। বিছানার চাদর তুলে ধোয় কে? ও যখন স্ট্যেফ্‌নারের

কাঁধে হাত রেখে শোয়, তখন ওর নিশ্চয় মনে পড়ে আমি ওর বরফঠাণ্ডা হাত বগলে চেপে গরম করেছি।

ওর হাত, ওই হাত দিয়ে ও বাড়ির দরজা খোলে, ছোট মারীর বিছানায় চাদর টান করে দেয়, নিচের রান্নাঘরে পোস্টারের পলাশ ঢোকায়, জল বসায়, প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নেয়। ঝি-এর চিরকুটটা এবার রান্নাঘরের টেবিলে পায় না, পায় ফ্রীজের ওপর। 'সিনেমায় গেলাম। দশটায় ফিরব।' বসবার ঘরে টেলিভিশনের ওপর হস্যফনার-এর চিরকুট। 'এফ-এর ওখানে যেতেই হচ্ছে। অনেক চুমু, হ্যারিব্যার্ট'। রান্নাঘরের টেবিলের বদলে ফ্রীজ, চুমুর বদলে অনেক চুমু। রান্নাঘরে টোস্টের ওপর পুরু করে মাখন, পুরু করে লিভার সসেজ লাগাতে লাগাতে, দু'চামচের বদলে তিন চামচ চকোলেট পাউডার কাপে ঢেলে প্রথম তোমার মনে হয় পাতলা থাকবার আনন্দের কথা, তোমার মনে পড়ে ফ্রাউ শ্বোথার্ট-এর ঘুরিয়ে বলা কথা, 'সেই যে একবার তুমি দু'টুকরো কেক নিয়েছিলে, সে সময়—' ওতে কিন্তু সবসুদ্ধ পনেরোশোরও বেশি ক্যালরি আছে, অতটা খাওয়া কি আপনার ঠিক হবে?' কসাই-এর মত কোমরের দিকে তাকানো, তাকানোটা বলে দিচ্ছে, 'উহু', অতটা খাওয়া ঠিক হবে না।' ওঃ, সর্বশক্তিমান কা-কা-কা, তুমি নৎলার আর-খোলন! 'হুঁ, হুঁ, মোটা হতে শুরু করেছ।' সারা শহরে কথা হবে, কথার শহরে। এই অশান্ত ভাব কেন, এই ইচ্ছা, অন্ধকারে একা থাকবার, সিনেমায় আর গীর্জায়, এখন এই অন্ধকার বসবার ঘরে টোস্ট আর চকোলেট। নিচের পার্টিতে ছোকরা মস্তানটাকে কি উত্তর দিয়েছিল, ছোকরা হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, 'চট্ করে বলুন তো, আপনার কি ভাল লাগে, জলদি।' তুমি ওকে সত্য কথাই বলে থাকবে, 'বাচ্চাকাচ্চা, কনভেন্টের চেয়ার, সিনেমা, গ্রেগরিয়ান সঙ্গীত আর ক্লাউন।' —'মানুষ ভালবাসেন না, পুরুষ মানুষ?' 'বাসি, একজনকে,' বলে থাকবে। 'এসব মানুষ না, এরা বড্ড বেকুব।'—'বলব সবাইকে সেকথা?' —'না, না, ঈশ্বরের দোহাই বলবেন না!' ও যদি একজনের কথা বলে থাকে তবে কেন আমার কথা বলল না? যদি কেউ একজনকে ভালবাসে, একজন বলতে যা বোঝায় ঠিক সেই একজনকে, তাহলে তো কেবল নিজের জনকে বোঝায়, আপনজনকে। ওঃ, ঐ ভুলে যাওয়া!

ঝি বাড়ি ফিরল। তালায় চাবি ঢোকাল। দরজা খুলল, বন্ধ হল, তালায় চাবি ঢুকল। আলো জ্বলল সামনে, নিভল, রান্নাঘরে জ্বলল, ফ্রীজ খুলল, বন্ধ হল, রান্নাঘরের আলো নিভল। দরজায় খুব হালকা টোকা পড়ল। 'গুড নাইট ম্যাডাম ডিরেক্টর।'—'গুড নাইট। মারী দুষ্টুমি করেনিতো?'—'না, একদম না।' সামনের আলো নিভল, পায়ের শব্দ উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। ('তাহলে অন্ধকার ঘরে একদম একা বসে গীর্জার গান শুনছিল।')

বিছানার চাদর কেচে এসেছিলে, আমি তোমার হাতদুটো বগলে চেপে গরম করেছিলাম। সেই হাত দিয়ে তুমি সব ছোঁও, রেকর্ডপ্লেয়ার, রেকর্ড, হাতল, বোতাম, কাপ, রুটি, বাচ্চার চুল, বাচ্চার লেপ, টেনিস র‍্যাকেট। 'আচ্ছা, তুমি আর টেনিস খেলতে যাও না কেন?' কাঁধ নাচল। ইচ্ছে করে না। কোন ইচ্ছে করে না। রাজনীতি যারা করে তাদের স্ত্রীদের আর হোমড়া-চোমড়া ক্যাথলিকদের স্ত্রীদের পক্ষে টেনিস খুব ভাল জিনিস। না, না, ওটা এখনও সবাই বোঝে না। পাতলা থাকা যায়, চটপটে আর লোকের নজর টানে এমন। 'ওদিকে এফ্ তো তোমার সাথে টেনিস খেলতে ভালবাসে। ওকে তুমি পছন্দ কর না?' হ্যাঁ, নিশ্চয়। ওর মনটা বেশ ভাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, লোকে বলে 'মুখ আর কনুই-এর' জোরে মন্ত্রী হয়েছে। লোকটা খল প্রকৃতির, লোকটা ধূর্ত, আর হ্যারিব্যার্টকে যে স্নেহ করে সেটা ঠিক। অন্য চরিত্র এবং বর্বর প্রকৃতির লোকেরা মাঝেমধ্যে সৎ এবং কর্তব্য-সচেতন লোকেদের পছন্দ করে। হ্যারিব্যার্টের বাড়ি তৈরির সময় তো সব কেমন সোজা পথে সাধারণভাবে হয়েছিল—কোনও রকম ধারদেনা ছাড়া পার্টির বা গীর্জার কোন বন্ধুর, যার বাড়ি তৈরির অভিজ্ঞতা আছে তার 'সাহায্য' ছাড়া সব হয়েছে। বাড়ির সামনেটা 'ঢালু' চেয়েছিল বলে ওকে একটু বেশি দাম দিতে হয়েছে, সেটা ওর কাছে 'আসলে' অন্যায় বলে মনে হয়েছে। আর ঐ ঢালু জমিটাই কিন্তু এখন অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঢালু জমিতে বাড়ি করতে গেলে বেছে নেয়া যায়, বাড়ির সামনেটা ঢালু হবে না উঁচু হবে। হ্যারিব্যার্ট সামনেটা ঢালু চেয়েছিল—তার অসুবিধা এখন প্রমাণ হয়েছে। ছোট্ট মারী যখন বল নিয়ে খেলা শুরু করবে, বলটা কেবলি গড়িয়ে যাবে বেড়ার দিকে, কখনও কখনও ওর ফাঁক দিয়ে গলে

বাগানের মধ্যে চলে যাবে, চারাগাছ নষ্ট করবে—ফুল, দামী দামী মস। দারোয়ানা মাথা চাওয়াচাওয়ির দরকার হবে। 'এমন কচি মিষ্টি বাচ্চার ওপর রাগ যে করে কি করে!' করা যায় না। মসৃণ স্বরে উদারতার অভিনয় হবে আড়ম্বরের সাথে। রোগা থাকার চেষ্টা করা কঠিন, মুখে শান্ত ধারে প্রকাশ পাবে উজ্জ্বলতা, আসলে একটা পুরোপুরি গলাবাজি, কাটা কাটা কথাই হচ্ছে প্রকৃত মিটমাটের পথ। সব হজম করতে হবে, প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাল ব্যবহারের মুখোশে সব চাপা পড়বে। তারপর একদিন বসন্তের নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় বন্ধ দরজা আর ব্লাইন্ড-নামানো জানলার আড়ালে দামী চীনেমাটির বাসন ছোঁড়া হবে ভৌতিক ভ্রূণের উদ্দেশ্যে। 'আমি তো তাই চেয়েছিলাম, তুমি, তুমি তো চাওনি।' দামী বাসন ভাঙার আওয়াজটা খানদানি নয়, বিশেষ করে রান্নাঘরের দেয়ালে আছড়ে ভাঙলে। এ্যাম্বুলেন্স আসবে সশব্দে ঐ ঢালু জমি বেয়ে। ক্রোকাসের ভাঙা ডাল, নষ্ট মস, বাগানে কচি হাতের ছোট্ট বল গড়াচ্ছে। এ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে প্রকাশ পাবে অঘোষিত বন্ধের কথা। ওঃ, বাড়ির সামনের ঢালটা উল্টো বাছলেই হত সে সময়ে।

টেলিফোনের শব্দে চমকে উঠলাম। রিসিভারটা তুলে লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম, মনিকা সিল্ভস্-এর কথা ভুলে গিয়েছিলাম। মনিকা বলল, 'হ্যালো, হান্স?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ,' কেন ফোন করেছে তখনও জানি না। যখন বলল, 'আপনি হতাশ হবেন,' তখন আমার মনে পড়ল আবার সেই মাজুরকার কথা। তখন আর না বলা যায় না, বলতে পারলাম না, 'থাকগে।' ঐ জঘন্য মাজুরকা সহ্য করতেই হবে। মনিকা রিসিভারটা পিয়ানোর ডালার নিচে রাখলো শুনতে পেলাম। বাজাতে শুরু করল, চমৎকার বাজাল, অপূর্ব ঝঙ্কার। ও যতক্ষণ বাজাচ্ছিল সে সময় আমি কষ্টে কেঁদে ফেলেছিলাম। সেই মুহূর্তটাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা উচিত হয়নি। সেই যে মারীর ওখান থেকে ফিরেছিলাম, লেয়ো মাজুরকা বাজাচ্ছিল। মুহূর্তের পুনরাবৃত্তি হয় না, মুহূর্ত জানানো যায় না। শীতের আগ দিয়ে সন্ধ্যাবেলা, এডগার হ্বীনেকেন আমাদের পার্কে একশ মিটার দৌড়চ্ছিল ১০·১ সেকেণ্ডে। আমি নিজে ঘড়ি দেখেছি, নিজে একশ মিটার মেপেছি, ও সেদিন সন্ধ্যায় ১০·১ সেকেণ্ডে দৌড়েছিল। ও সেদিন চমৎকার মেজাজে ছিল, চমৎকার দৌড়েছিল—তবু কেউই কিন্তু আমাদের

সেকথা বিশ্বাস করেনি। দেখত আমাদের! ও কথা বলে সেই মুহূর্তটাকে অনন্ত করবার চেষ্টা করেছিলাম, সেটাই ভুল। ও সত্যিই ১০'১ সেকেণ্ডে দৌড়েছিল জেনে আমাদের খুশি হওয়া উচিত ছিল। পরে যা হয়, যতবারই চেষ্টা করেছে ১০'৯ কিম্বা ১১ সেকেণ্ডে, কেউই আমাদের কথা বিশ্বাস করেনি। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। এসব মুহূর্ত নিয়ে কথা বলাই ভুল, আর তা আবার ঘটাবার চেষ্টা আত্মহত্যা। ও মাজুরকা বাজাচ্ছিল, আমি টেলিফোনে শুনছিলাম, আমার এ-কাজ একজাতীয় আত্মহত্যা। কিছু পবিত্র মুহূর্ত আছে যার পুনরাবৃত্তি অসম্ভব। যেমন ক্লাউ হ্বীনেকেনের রুটি কাটা—আমি কিন্তু মারীকে দিয়ে সেই মুহূর্তটা ও আবার একবার ঘটাবার চেষ্টা করেছিলাম। ওকে অনুরোধ করেছিলাম ক্লাউ হ্বীনেকেন যেভাবে রুটি কাটে সেইভাবে রুটি কাটতে। শ্রমিকের রান্নাঘর আর হোটেলের ঘরে তফাৎ আছে, মারীতে আর ক্লাউ হ্বীনেকেনে তফাৎ আছে। ছুরিটা পিছলে গিয়ে মারীর বাঁ হাতের ওপরের দিকে লাগে, তার ফলে আমাদের তিন সপ্তাহ খারাপ কেটেছে। ভাবপ্রবণ হলে এমনি জঘন্য শাস্তিও পেতে হতে পারে। মুহূর্তগুলো সেইজন্য টেনে আনতে নেই, কখনও পুনরাবৃত্তি করতে নেই।

এত কষ্ট হচ্ছিল যে কাঁদতেও পারছিলাম না আর। মনিকার বাজনা শেষ হল। ও বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। টেলিফোন তুলে শুধু আস্তে করে বলেছিল, 'দেখলেন তো।' আমি বলেছিলাম, 'ভুলটা আমারই—আপনার নয়—আমাকে মাফ করবেন।'

মনে হচ্ছিল যেন মাতাল অবস্থায় নর্দমার মধ্যে পড়ে আছি, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছি, বমিতে ঢাকা পড়ে আছি, মুখে কাঁচা খিস্তি। যেন কাউকে খবর দিয়েছি আমার ফটো তোলবার জন্য আর মনিকাকে সেই ফটো পাঠিয়েছি। আস্তে করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাকে আবার ফোন করব ?' 'কদিন বাদে করতে পারেন। এমন বিশ্রীভাবে কেন বলছি, তার একটাই কারণ আছে। আমার এত জঘন্য লাগছে যে তা বুঝিয়ে বলতে পারব না।' আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না, শুধু ওর নিঃশ্বাসের শব্দ, একটু সময় তাই শুনলাম, তারপর ও বলল, 'আমি বাইরে যাচ্ছি, চোদ্দ দিনের জন্য।'

'কোথায় ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তপস্যা করতে,' বলল, 'আর একটু আধটু ছবি আঁকতে।'

'এখানে কবে আসছেন?' জিজ্ঞাসা করলাম, 'এসে আমার জন্য মাশরুমের ওমলেট বানাবেন তার আপনার চমৎকার স্যালাড?'

'আসতে পারছি না,' বলল, 'এখন।'

'পরে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'আসব,' বলল। ও কেঁদে ফেলেছিল তাও আমি শুনতে পেয়েছি, তারপর রেখে দিল!

১০

মনে হল, একবার স্নান করতেই হবে, এমন নোংরা লাগছিল যে মনে হচ্ছিল গা দিয়ে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, লাজারুস-এর গায়ে যেমন দুর্গন্ধ ছিল। আমি কিন্তু আসলে সম্পূর্ণ পরিষ্কার, গায়ে গন্ধও ছিল না। রান্নাঘরে ঢুকে কড়াইশুঁটির নিচের স্টোভের গ্যাস বন্ধ করলাম, জলের নিচে গ্যাসও। আবার বসবার ঘরে গিয়ে ব্র্যান্ডির বোতলে মুখ লাগালাম, লাভ হলো না কিছুই। টেলিফোনের আওয়াজেও আমার ঘোর ভাবটা কাটল না। রিসিভার তুলে বললাম, 'হ্যাঁ?' ওদিকে সাবিনে এমন্ডস বলল, 'হান্স, কি সব কাণ্ড করছ বল তো?' আমি চুপ করে থাকলাম। ও বলল, 'টেলিগ্রাম পাঠিয়েছ। বেশ নাটকীয়। এমন খারাপ অবস্থা নাকি?'

'যথেষ্ট খারাপ,' বললাম কোনও রকমে।

'আমি বাচ্চাদের নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম,' বলল, 'কার্ল এক সপ্তাহের জন্য বাইরে গেছে, ওর ক্লাসের ছেলেদের নিয়ে একটা গাঁয়ের বোর্ডিং স্কুলে—বাচ্চাদের দেখাশোনার একজন লোক ঠিক করে তবে এলাম ফোন করতে।' ওর গলাটা উত্তেজিত আর একটুখানি অস্বস্তিমাখা, বরাবরই ঐরকম। ওর কাছে অর্থ সাহায্য চাইতে পারলাম না কিছুতেই। বিয়ের পর থেকেই কার্ল খুব হিসেব করে সামান্যভাবে চলে। ওর তিনটে বাচ্চা। সেবার যখন ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয় তখন সাবিনের পেটে চতুর্থ বাচ্চা। কিন্তু কিছুতেই সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না সেটা ইতিমধ্যে জন্মেছে কিনা।

ওর বাসার সব সময় একটা অস্বস্তির ভাব, তাতে কোনও লুকোচুরি নেই। সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে নোটবই, তাতে কেবল হিসেব লেখা, ওর মাইনের টাকায় সংসার চালাবার সব পরিকল্পনা। আর আমার সাথে একা বসলেই কার্ল কেমন যেন বিশ্রীভাবে 'স্পষ্ট' কথাবার্তা শুরু করতো, পুরুষদের কথা। বলত বাচ্চা হবার কথা, আর প্রত্যেকবারই ক্যাথলিক গীর্জাকে দোষ দিতে শুরু করতো (আর লোক পায় না আমার কাছে !), এমনি করে এমন এক জায়গায় আমরা পৌঁছুতাম যে ও আমার দিকে তাকাত, যেন আমি একটা কুকুর, তারস্বরে চিৎকার করছি। আর ঠিক এই সময়ে আসত সাবিনে, ওর দিকে তাকাত বিরক্তভাবে, বিরক্তির কারণ ও আবার পোয়াতি হয়েছে। স্ত্রী পোয়াতি হয়েছে বলে যদি স্বামীর দিকে বিরক্তভাবে তাকায়, তবে তার চেয়ে বেশি দুঃখের ব্যাপার আমার জানা নেই। তারপর ওরা দুজনেই বসে কাঁদতে থাকত, ওরা দুজনে যে পরস্পরের প্রতি সত্যিই অনুরক্ত। ওদিকে বাচ্চারা চেঁচামেচি শুরু করতো, মহানন্দে এটা ওটা ছুঁড়ে ফেলত, ভেজা ন্যাতা ছুঁড়তো নতুন রঙ করা দেয়ালে, এদিকে কার্ল সমানে 'ডিসিপ্লিন, ডিসিপ্লিন' আর সম্পূর্ণ এবং 'তাৎক্ষণিক অনুবর্তিতার' কথা বলে চলতো। তখন বাচ্চাদের ঘরে গিয়ে ওদের দু'চারটে ভাঁড়ামি দেখানো ছাড়া আর কোনও গতি থাকত না। ওদের থামাবার জন্য অত চেষ্টা, কিন্তু ওদের কখনও থামানো যেত না, ওরা মহানন্দে পাক খেত আর আমার মত ভাঁড়ামি করতে চাইত। সবশেষে আমরা তিনজনই বসে থাকতাম, প্রত্যেকের কোলে একটা করে বাচ্চা, বাচ্চারা আমাদের ওয়াইন গ্লাসে চুমুক দেবার আস্কারা পেত। কার্ল আর সাবিনে শুরু করতো সেই সব বই আর ক্যালেন্ডার-এর কথা, যাতে লেখা থাকে কিভাবে বাচ্চা হওয়া এড়ানো যায়। তবুও কিন্তু ওদের কেবলই বাচ্চা হতো, আর ওরা বুঝতেই পারত না যে ঐসব আলাপ আলোচনায় আমি আর মারী সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেতাম, আমাদের তো বাচ্চা হতো না। তারপর কার্ল মাতাল হলে শুরু করতো রোমের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করতে, প্রধান কার্ডিনালদের আর পোপের চরিত্র সম্বন্ধে গাদা গাদা মারাত্মক সব ইচ্ছা প্রকাশ করতো। সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি তখন পোপের হয়ে লড়াই করতাম। মারী সব ব্যাপারটা অনেক ভাল বুঝত, কার্ল আর সাবিনেকে বোঝাতো যে এসব ব্যাপারে রোমের ওদের হয়ে অন্যরকম কিছু করা সম্ভব নয়। শেষকালে ওরা দুজনেই ধূর্তের মত

আমাদের দিকে তাকাত, যেন বলতে চাইতো—তোমরা নিশ্চয় দারুণ একটা কিছু ব্যবস্থা কর, আর তাই তোমাদের বাচ্চা হয় না। তারপর কোনও একটা বাচ্চা ভীষণ ক্লান্ত অবস্থায় মারীর, আমার, কার্লের বা সাবিনের গ্লাস হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কার্লের লেখার টেবিলে রাখা স্কুলের খাতার ওপর ঢেলে দিত—কার্ল সবসময় খাতাগুলো লেখার টেবিলের ওপর গাদা করে রাখত। ঐভাবে সাধারণত শেষ হত। কার্লের কাছে ওটা খুবই মর্মান্তিক, কারণ ও ছাত্রদের সবসময় ডিসিপ্লিন আর টিপটপ থাকবার কথা বলত, এখন ওকে সেই ছাত্রদের খাতা ওয়াইনের দাগ-লাগা অবস্থায় ফেরত দিতে হবে। ফলে মারপিট, কান্না আর সাবিনে আমাদের দিকে তাকাতো সেই 'আঃ-এইসব পুরুষ' চোখে। তারপর ও মারীকে নিয়ে রান্নাঘরে যেত কফি তৈরি করতে, ওখানেও নিশ্চয় ওরা মেয়েদের কথা বলত, আর মারীর কাছে নিশ্চয় তা বিশ্রী লাগত, আমার যেমন বিশ্রী লাগত পুরুষদের কথা। আমি আর কার্ল তারপর একা হলেই ও আবার টাকাপয়সার কথা তুলত, ওর বলার ধরনটায় মনে হত যেন বলতে চাচ্ছে, এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলছি কারণ তুমি লোকটা ভাল, তবে বুঝতে তুমি কিছুই পারছ না।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'সাবিনে, আমি একদম শেষ হয়ে গেছি, কাজের দিক থেকে, মনের দিক থেকে, শরীর, অর্থ, সবদিক থেকে···আমি···' 'তোমার যদি সত্যি কখনও খিদে পায়,' বলল, 'তাহলে তুমি বোধহয় জান, কোথায় তোমার জন্য সবসময় একবাটি স্যুপ্ উনোনে চাপানো আছে।' আমি কথা বললাম না, ওর কথাটা আমার ভেতরে গিয়ে আঘাত করেছে, খুবই আন্তরিক আর স্পষ্ট। 'শুনেছ?' বলল।

'শুনেছি', বললাম, 'আর যদি বড্ড বেশি দেরি হয় তবে কাল দুপুরে আসব, আমার ঐ একবাটি স্যুপ্ খাব। আর তোমাদের যদি আবার কখনও বাচ্চাদের দেখাশোনা করার লোকের দরকার হয়, তবে আমি—আমি, আটকে গেল আমার কথা। যে কাজ আমি সবসময় ওদের জন্য বিনা পয়সায় করে এসেছি, সেই কাজের জন্য এখন পয়সা চাইবার কথা বলা গেল না। তার ওপর সেবার গ্রেগরকে ডিম খাওয়ানোর হাঁদামির কথা আমার মনে পড়ে গেল। সাবিনে হেসে বলল, 'কি হল, বলেই ফেল।' আমি শেষকালে বললাম, 'মানে, আমি

বলছিলাম, তোমাদের জানাশোনা লোকেদের কাছে যদি আমার কথা বলো, আমার তো টেলিফোন আছে—আর অন্য সবাই যা নেয়, আমি তার চেয়ে বেশি নেব না।'

ও চুপ করে থাকল, আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, ও আঘাত পেয়েছে। 'শোন' বলল, 'আমি আর বেশিক্ষণ কথা বলতে পারব না, কিন্তু বল তো—হয়েছেটা কি?' ওই বোধ হয় এই বন্ শহরে একমাত্র লোক যে কোস্টার্ট-এর লেখাটা পড়েনি, আর আমার মনে পড়ল, মারী আর আমার মধ্যে কি হয়েছে তাও ওর জানবার কথা নয়। সেই 'চক্রের' কাউকেই তো ও চিনত না।

'সাবিনে,' বললাম, 'মারী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে—আর এক ৎস্যুফ্‌নার বিয়ে করেছে।'

'হায় ভগবান,' চিৎকার করে উঠলো, 'তা কি হয়?'

'তাই হয়েছে,' বললাম।

ও চুপ করে থাকল। টেলিফোন বুথ-এর দরজায় কে যেন জোর শব্দ করছিল শুনতে পেলাম। নিশ্চয় কোনও এক গাড়োল, স্কাট্ খেলার সঙ্গীকে জানাতে চায়, হরতনের সোলো তিনটে গোলাম ছাড়া কিভাবে জেতা যায়।

'তোমার উচিত ছিল ওকে বিয়ে করা,' সাবিনে বললো আস্তে, 'মানে,—তুমিতো জানো আমি কি বলছি।'

'জানি,' বললাম, আমি তো রাজী ছিলাম, কিন্তু তখন জানা গেল যে রেজেস্ট্রী অফিসের ঐ একটা চোথা কাগজ দরকার, তারপর আমাকে সই করে দিতে হবে যে ছেলেমেয়েরা ক্যাথলিক মতে শিক্ষা পাবে।'

'কিন্তু তার জন্য নিশ্চয় এমন কাণ্ড হয়নি?' জিজ্ঞেস করলো। টেলিফোন বুথ-এর দরজায় শব্দ এবার আরও জোরে শোনা গেল।

'জানি না,' বললাম, 'তবে শুরুটা ঐভাবেই—অনেক কিছুই ঐ সঙ্গে জড়িয়ে আছে যার মাথামুণ্ডু আমি বুঝি না। তুমি বরং এখন রেখে দাও সাবিনে, নইলে দরজায় ঐ উত্তেজিত জার্মান তোমাকে খুনই করে ফেলবে। এদেশে ঐসব পিশাচরা গিজগিজ করছে।' —'তোমাকে কথা দিতে হবে যে তুমি আসবে,' বলল, 'আর মনে রেখ, তোমার জন্য একবাটি স্যুপ সারাদিন উনোনে চাপানো থাকবে।' ওর গলাটা কেমন দুর্বল হয়ে এল শুনতে পেলাম। ও তখনও বিড়বিড় করছে, 'কি বিশ্রী, কি বিশ্রী।' ওর এমন অবস্থা হয়ে গেছিল যে রিসিভারটা জায়গামত না রেখে যেখানে সবসময়

কোন ডাইরেক্টরী থাকে সেই ছোট্ট টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছিল। সেই লোকটা, 'যাক বাবা, হল তাহলে' বলল, শুনতে পেলাম। ততক্ষণে সাবিনে ততক্ষণ চলে গেছে মনে হল। আমি টেলিফোনে চিৎকার করে উঠলাম, 'বাঁচাও, বাঁচাও', গলাটা তীক্ষ্ণ আর জোর, লোকটা ঢোঁপটা গিলল, ফিলিডার দিয়ে বলল, 'কিছু করতে পারি আপনার জন্য?' লোকটার গলাটা গম্ভীর, সংযত আর ভরাট, একটা টক কিছু খেয়েছে, গন্ধ পাচ্ছিলাম, কোটোয় রাখা হেরিং বা ঐ জাতীয় কিছু। 'হ্যালো, হ্যালো', বলল লোকটা, আর আমি বললাম, 'আপনি জার্মান, আমি একমাত্র জার্মানদের সাথে কথা বলি।'

'সেটা অবশ্য খুব ভাল,' বলল, 'তা, আপনার হয়েছে কি?'

'সি ডি ইউ-এর জন্য চিন্তা হচ্ছে,' বললাম, 'আপনিও সবসময় সি ডি ইউকে ভোট দেন তো?'

'আরে সে কথা আর বলতে,' বলল, যেন অপমানিত হয়েছে, তখন আমি বললাম, 'যাক বাঁচা গেল,' তারপর ফোনটা রাখলাম।

২১

লোকটাকে খুব করে অপমান করতে হতো, জিজ্ঞেস করতে হত, ও নিজের স্ত্রীর ওপর কখনও বলাৎকার করেছে কিনা, দুটো গোলাম নিয়ে গ্রান্ড জিতেছে কিনা, আর অফিসে ইয়ার-বন্ধুর সঙ্গে আর-সব দিনের মত মুখ নিয়ে দু'ঘণ্টা গোঁজিয়েছে কিনা। বিবাহিত আর মুখফোঁড় জার্মানের মত ছিল লোকটার গলার স্বর, আর ঐ 'যাক বাবা, হল তাহলে' শুনতে লেগেছিল 'রাখ এখন।' সাবিনে এমন্ডস্-এর কথায় খানিকটা শান্তি পেয়েছি, ওর গলায় একটু অস্বস্তিমাখা, উত্তেজিতও। কিন্তু, আমি ঠিক জানি, মারীর এই ব্যবহার ওর কাছে সত্যিই জঘন্য মনে হয়েছে, আর জানি, আমার জন্য এক বাটি স্যুপ সবসময়েই উনোনে চাপানো থাকবে। ও খুব ভাল রাঁধতে পারে, আর

ওর পেটে বাচ্চা না থাকলে, যা যদি চোখ দিয়ে অনবরত ঐ 'আঃ,এই সব পুরুষ' না বলে, তাহলেও বেশ আমুদে। আর কার্ল যেমন ক্যাথলিক, তার চেয়ে অনেক ভদ্র রকমের ক্যাথলিক। সেক্স ব্যাপারে কার্লের এক অদ্ভুত পণ্ডিতি ধারণা। সাবিনের ঠাট্টার দৃষ্টি ঠিকই সমস্ত পুরুষ স্রষ্টার উদ্দেশ্যে। কার্লই হচ্ছে ওর যাবতীয় দুরবস্থার কারণ, তাই ও যখনই কার্লের দিকে তাকায়, দৃষ্টিতে কেমন একটা বিশেষ অন্ধকার ছায়া থাকে, যেন এখনই ঝড় আসবে। আমি বহুবার চেষ্টা করেছি সাবিনেকে ভোলাতে, একটা ভাঁড়ামি করে দেখাতাম, ও হাসতে বাধ্য হত, অনেকক্ষণ ধরে, প্রাণ খুলে, তারপর হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত, তারপর প্রায়ই কাঁদতে থাকত, তখন আর ওর মধ্যে হাসির চিহ্নও নেই···। তখন মারী ওকে বাইরে নিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দিত, এদিকে কার্ল বসে থাকত আমার সাথে একা, গম্ভীর মুখে, তারপর কি করবে বুঝতে না পেরে খাতা দেখতে বসত। কখনও কখনও আমি ওর খাতা দেখে দিতাম, লাল ডট্‌পেন দিয়ে ভুলগুলোয় দাগ দিতাম, কিন্তু ও কখনও আমাকে বিশ্বাস করত না, সব আবার নিজে দেখত আর আমি একটা ভুলও করিনি আর প্রত্যেকটা ভুল কেটেছি দেখে ক্ষেপে যেত। ও ভাবতেই পারত না যে আমি ওকাজ স্বভাবতই ঠিকভাবে করতে পারি। কার্ল-এর সমস্যা কেবল অর্থসমস্যা। কার্ল এমণ্ডস্‌-এর যদি একটা সাতঘরের ফ্ল্যাট থাকত, তবে আর ওর অস্বস্তি কিংবা উত্তেজনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব হত না। আমি একবার কিংকেল-এর সাথে তর্ক করেছিলাম। বিষয়ঃ 'নিতান্ত বেঁচে থাকবার জন্য একান্ত প্রয়োজনসামগ্রী।' কিংকেল এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রতিভাশালী বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত, আর আমার যতদূর মনে পড়ে, ও-ই একবার হিসেব করে দেখিয়েছিল, একটা বড় শহরে থাকতে গেলে বাড়িভাড়া বাদ দিয়ে, চুরাশি (পরে সেটা ছিয়াশি করেছিল) মার্কই যথেষ্ট। আমি তখন আর কোনরকম রাখ ঢাক না করে বলেছিলাম, ওর নিজেরই বলা একটা গল্পের কথা মনে রেখে বিচার করলে, ও নিজে তার পঁচাত্রিশগুণ নিজের একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করে, একথা স্পষ্ট। এজাতীয় কথা স্বভাবতই অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং রুচিহীন বলে গণ্য হয়, কিন্তু আসল রুচিহীন ব্যাপারটা হচ্ছে যে, এরকম একটা লোক অন্যকে একান্ত প্রয়োজন কি তার হিসাব দেয়! ঐ হিসাবের মধ্যে চাইকি সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে খরচও রয়েছে; খুব সম্ভব সিনেমা বা খবরের কাগজ।

আর আমি যখন কিংকেলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওরা আশা করে কিনা যে ঐ লোকটা সেই পয়সার একটা ভাল ছবি দেখবে, একটা জাতিগঠনমূলক ছাব—তখন ক্ষেপে গিয়েছিল। তারপর আমি যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'অন্তর্বাস পুনঃ ক্রয়' বলতে কি বোঝায়। ওদের মন্ত্রণালয়ে একজন বুড়ো দেখে ধর্মভীরু গোছের কাউকে রাখে নাকি, যে সারা বন্ শহরে ঘুরে ঘুরে আণ্ডারওয়্যার ছিঁড়ে আবার মন্ত্রণালয়ে গিয়ে বলবে, আণ্ডারওয়্যার ছিঁড়তে অত্তো সময় লাগে। তাতে ফ্রাউ কিংকেল বলেছিল, আমি নাকি সাংঘাতিক সাবজেক্টিভ। আমি তখন তাকে বলেছিলাম, যখন কম্যুনিস্টরা পরিকল্পনা করতে বসে, সুষম খাদ্য, রুমাল কতদিন টিঁকতে হবে ইত্যাদি ছাবিজাবি, তখন বুঝতে পারি। কম্যুনিস্টদের আর যাই থাক ভণিতা নেই, কিন্তু আপনার স্বামীর মত খ্রীশ্চানরাও যে এসব পাগলামিতে জড়িয়ে পড়ে কেমন করে, সেটা আমার চিন্তাশক্তির বাইরে। তাতে মহিলাটি বলেছিল, আমি নাকি পুরোপুরি বস্তুবাদী আর আমি নাকি ত্যাগ, দুর্দশা, ভাগ্য, দারিদ্র্যের মহত্ব, এসব বুঝি না। কার্ল এমন্ডস্‌কে দেখে আমার কখনও ত্যাগ, দুর্দশা, ভাগ্য, দারিদ্র্যের মহত্ব, এসব কথা মনে হয়নি। ও রোজগার ভালই করে, আর ভাগ্য বা মহত্ব বলতে যা কিছু বোঝায়, তার প্রকাশ কেবল ওর চিরন্তন উত্তেজনা। কারণ ও হিসেব করে দেখেছে, ওর যত বড় ফ্ল্যাট দরকার তার ভাড়া দেবার ক্ষমতা ওর কখনই হবে না। আর যখন আমি বুঝতে পারলাম যে কার্ল এমন্ডস্‌ই একমাত্র লোক, যার কাছে আমি টাকার জন্য যেতে পারি, তখনই আমার প্রকৃত অবস্থাটা আমার নিজের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি এখন কপর্দকহীন।

আমি একথাও জানতাম যে আমি ওসব কিছুই করব না—রোমে যাওয়া আর সেখানে পোপের সঙ্গে কথা বলা কিম্বা আগামীকাল বিকেলে মায়ের "বিশেষ উৎসবে" সিগারেট আর চুরুট চুরি করা, বাদাম ভাজা পকেটে পোরা। ওসব ব্যাপারে বিশ্বাস করবার শক্তিটুকুও নেই, যা আছে লেয়োর সঙ্গে বসে কাঠ কাটবার ব্যাপারে। পুতুল নাচের সুতোগুলোয় গিঁট বেঁধে সেটা বেয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে গেলেই ঝামেলা হবে। কোনও এক সময়ে এমন একটা অবস্থায় পড়ব যে কিংকেলের কাছে ধার চাইতে হবে। সমারহবীল্ড-এর কাছেও, চাইকি হয়তো ঐ স্যাডিস্ট ফ্রেডবয়েলের কাছেও। ঐ লোকটা হয়তো আমার নাকের ডগায় একটা পাঁচ মার্কের মুদ্রা ধরে আমাকে লাফ দিয়ে ওটা ধরতে বাধ্য করবে। মনিকা সিল্ভস্ আমাকে কফি খেতে নিমন্ত্রণ করলে আমি খুশি হবো। সেটা কিন্তু মনিকা নিমন্ত্রণ করেছে বলে নয়, বিনে পয়সার কফি বলে। আমি আবার ঐ গয়েট বেলা ব্রোসেনকে ফোন করে ওকে একটি সুড়সুড়ি দিয়ে বলব যে, আমি আর টাকার অঙ্কটা জিজ্ঞেস্ করব না, বলব যে, কোনও, যে কোনও অঙ্কই আমি গ্রহণ করতে কৃতার্থ হবো। তারপর—একদিন সমারহবীল্ড-এর কাছে যাব, ওর সামনে এমন ভাব করব যে ও 'বিশ্বাস' করবে যে, আমি অনুতপ্ত। আমি বুঝতে পেরেছি, আমি ধর্মান্তর নেবার যোগ্য। আর তারপর আসবে সেই সবচেয়ে জঘন্য ঘটনা—সমারহবীল্ড-এর ব্যবস্থায় মারী আর ৎস্যুফ্‌নার-এর সাথে মিটমাট। কিন্তু আমি ধর্মান্তর নিলে আমার বাবা খুব সম্ভব আমার জন্য আর আদৌ কিছু করবে না। সবাই জানে যে ওটা বাবার কাছে সবচেয়ে সাংঘাতিক। আমাকে আবার ভেবে দেখতে হবে—লাল বা নীল আমার বাছবার জন্য নয়, গাঢ় বাদামী কিম্বা কালো—কয়লা খনি কিম্বা গীর্জা। ওরা সবাই তো তাই আশা করেছিল,—একজন পুরুষমানুষ, পরিণত, আর আত্মবাদী নয় বরং বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন এবং পুরুষদের আসরে চমৎকার এক বাজী স্কাট খেলে মাৎ করতে পারে। আমার এখনও দু'চারটে ভরসা ছিল—লেয়ো, হাইনরিষ বেলেন, ঠাকুর্দা, ৎসোনেয়ারার। ও হয়ত আমাকে গায়ে-পড়া গীটার-বাজিয়ে হিসেবে ঠেলেঠুলে দাঁড় করাতে পারত। আমি গান

গাইতাম, 'তোমার চুলের বন্যায় হাওয়া যদি খেলা করে, জানব তুমি আমার।' মারীকে একবার গেয়ে শুনিয়েছিলাম। ও তখন কানে আঙুল দিয়ে বলেছিল, ওর নাকি বমিভাব লাগছিল। সব শেষে আমি কম্যুনিস্টদের কাছে গিয়ে ওদের কতকগুলো ক্যারিকেচার দেখাতে পারি, ওগুলো ওরা এ্যান্টিক্যাপিটালিস্ট বলে চালান করতে পারে।

আমি একবার সত্যি সত্যিই গেছিলাম। এরফুর্ট-এর 'সংস্কৃতির ধারকের' সাথে দেখা হয়েছিল। ওরা স্টেশনে আমাকে বেশ আড়ম্বরের সাথে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, বিশাল বিশাল ফুলের তোড়া, হোটেলে স্ট্রিট নাচ, কাভিয়ার আর প্রায় জমাট শ্যাম্পেন প্রচুর পরিমাণে। তারপর ওরা আমাদের জিজ্ঞেস করেছিল, আমরা এয়ারফুর্ট-এ কি কি দেখতে চাই। আমি বলেছিলাম, লুথার যেখানে তাঁর ডক্টর ডিবেট করেছিল সেই জায়গাটা দেখতে চাই। আর মারী বলেছিল, ও শুনেছে এয়ারফুর্টে ক্যাথলিক থিয়োলজির একটা প্রতিষ্ঠান আছে। ধর্ম এবং তৎসংক্রান্ত জীবনে ওর উৎসাহ। ওদের মুখ গোমড়া হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কিছুই করবার উপায় ছিল না। কঠিন অবস্থা হয়েছিল সংস্কৃতির ঐ ধারকদের, থিয়োলজির লোকদের আর আমাদের। থিয়োলজিস্টরা নিশ্চয় ভেবেছিল যে, ঐসব গবেটদের সাথে আমাদের কোন না কোন সম্পর্ক আছে, কাজেই কেউই মারীর সঙ্গে মন খুলে কথা বলেনি। মারী যখন একজন অধ্যাপকের সাথে বিশ্বাস নিয়ে কথা বলছিল, তখনও না। সেই অধ্যাপক কি করে যেন টের পেয়েছিল যে, মারীর সঙ্গে আমার ঠিক বিয়ে হয়নি। লোকটি ঐসব হোমড়া-চোমড়া লোকদের সামনেই মারীকে প্রশ্ন করেছিল, 'আপনি সত্যি সত্যিই ক্যাথলিক তো?' মারী লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ, পাপের মধ্যে ডুবে থেকেও আমি ক্যাথলিকই থাকব।' যখন আমরা খেয়াল করলাম যে, আমাদের এই বিয়ে না হওয়া ব্যাপারটা ঐ হোমড়া-চোমড়াদেরও তেমন পছন্দ নয়, তখন ব্যাপারটা বেশ বিশ্রী হয়ে উঠল। তারপর কফির জন্য হোটেলে ফিরলে ঐ হোমড়া-চোমড়াদের মধ্যে একজন এই বলে শুরু করল যে, সাধারণ নাগরিক জীবনে বিশেষ বিশেষ ব্যাপার আছে যা তার সহ্য হয় না। পরে ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমি লাইপজিক বা রোস্টককে কি দেখাব,—'কার্ডিনাল,' 'বন্ শহরে প্রবেশ' আর 'ডাইরেক্টর বোর্ডের মিটিং' দেখাতে পারি কিনা। ওরা 'কার্ডিনাল'-এর খবর

কোথায় জেনেছে সেটা আমরা কখনও বার করতে পারিনি। ঐ ক্যারিকেচার আমি সম্পূর্ণ নিজের জন্য তৈরি করেছিলাম, একমাত্র মারীকে একবার দেখিয়েছিলাম। মারীই তো আমাকে অনুরোধ করেছিল ওটা না দেখাতে, (কার্ডিনালরা মাত্র একবারই শহীদের রাঙা পোশাক পরে) আমি তখন বলেছিলাম, না, আমাকে প্রথমে এখানকার জীবনের সঙ্গে, অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, কারণ কমিকের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকের কাছে সেই সব অবস্থার ব্যাখ্যা করা যা তাদের প্রকৃত জীবন থেকে তুলে নেয়া হয়েছে, যা তারা জানে না, চেনে না—তা নয়। আর আপনাদের এদেশে তো বন্‌ও নেই, ডাইরেক্‌টরও নেই, কার্ডিনালও না। ওরা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, একজন তো ফ্যাকাশে হয়ে উঠে বলেই ফেলেছিল, ওরা অন্য রকম ভেবেছিল, আর আমি বলেছিলাম, আমিও। বিশ্রী অবস্থা। বলেছিলাম, আমি হয়ত একটুখানি দেখেশুনে নিয়ে 'জেলা কমিটির বৈঠক' দেখাতে পারি। কিম্বা 'সংস্কৃতি সম্মেলন' কিম্বা 'প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন'—নয়ত 'ফুলের শহর এয়ারফুর্ট'। এয়ারফুর্টের স্টেশনের চারপাশটায় ফুল ছাড়া আর সবই ছিল। এইবার সবচেয়ে বড় মাতব্বর উঠে দাঁড়াল, বলল, ওরা তা বলে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে কোনও রকম প্রোপাগাণ্ডা সহ্য করতে পারবে না। লোকটা আর ফ্যাকাশে নয়, পুরোপুরি সাদা হয়ে উঠেছিল—অন্য কারও কারও অবশ্য দেঁতোহাসি হাসবার মত সাহস ছিল। আমি তার প্রতিবাদ করে বলেছিলাম যে, সহজবোধ্যভাবে 'প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন' ক্যারিকেচার দেখানোর মধ্যে আমি শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডার কিছু দেখি না। বলবার সময় আমি মস্ত ভুল করেছিলাম, প্রেসিডেণ্ট বলে ফেলেছিলাম। তখন সেই ফ্যাকাশে গোঁড়া লোকটা ক্ষেপে গিয়েছিল! টেবিলের ওপর এত জোরে চাপড় মেরেছিল যে, আমার সামনের কেকের ওপরের ক্রীমটা পিছলে প্লেটের ওপর এসে পড়েছিল। তারপর লোকটা বলল, 'আপনার ব্যাপারে আমরা ভুল করেছি, ভুল করেছি।' তাতে আমি বলেছিলাম যে, 'তাহলে আমি আবার ফিরে যেতে পারি?' লোকটা বলল, "হ্যাঁ, তা পারেন, দয়া করে পরের ট্রেনেই যান।' আমি আরও বলেছিলাম যে, ডাইরেক্টর বোর্ডের মিটিংটাকে তো অনায়াসে 'জেলাকমিটির বৈঠক' বলে চালিয়ে দিতে পারা যায়। কারণ সেখানেও তো আগে থেকে ঠিকঠাক করে আসা ব্যাপারগুলো আবার ঠিকঠাক করা হয়। তখন ওরা বেশ দুর্ব্যবহারই

করল। সবাই মিলে ঘর ছেড়ে চলে গেল। আমাদের কফির দামটাও দেয়নি। মারী কেঁদে ফেলেছিল। আমার তখন এমন অবস্থা যে কাউকে পেলে একটা থাপ্পড় কষাতাম। তারপর যখন আমরা পরের ট্রেনে ফেরবার জন্য স্টেশনে গেলাম, তখন একটা কুলি না, একটা ছোকরাও পেলাম না। নিজেরা বাক্সপত্র টেনে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। এই কাজটা আমার খুব খারাপ লাগে। আমাদের ভাগ্যভাল বলতে হবে যে, স্টেশনের সামনে একজন অল্পবয়সী থিয়োলজিস্ট-এর সাথে দেখা হয়ে গিয়েছিল, এর সঙ্গে মারী সকালে কথাবার্তা বলেছিল। আমাদের দেখে সে লাল হয়ে উঠেছিল। তবে মারীর হাত থেকে ভারী স্যুটকেসটা নিয়েছিল। আর মারী সারা সময়টা ফিসফিস্ করে বলে চলেছিল, ওর কোনও রকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না।

বিশ্রী। আমরা মোট ছয় কি সাত ঘণ্টা ছিলাম এয়ারফুর্টে। কিন্তু আমরা সবই মাটি করেছি—থিয়োলজিস্টদের আর ঐ সংস্কৃতির ধারকদের।

বেব্রাতে নেমে হোটেলে উঠলে মারী সারারাত কেঁদেছিল। সকালের দিকে সেই থিয়োলজিস্টকে একটা লম্বা চিঠি লিখেছিল। আমরা কিন্তু কোনদিনই জানতে পারিনি সেই চিঠি সে পেয়েছিল কিনা।

আমি ভেবেছিলাম, মারী আর ৎস্যুফনারের সাথে মিটমাট করে নেয়া অসম্ভব। কিন্তু ঐ ফ্যাকাশে গোঁড়া লোকটার দলে ভিড়ে তাকে কার্ডিনাল ক্যারিকেচার দেখানো তার চেয়েও বেশি অসম্ভব। আমার ভরসা হিসেবে এখনও লেয়ো, হাইনরিষ বেলেন, মনিকা সিলভ্স্, ৎসোনেরারার, ঠাকুর্দা আর সাবিনে এম্‌ন্ডস্-এর এক বাটি স্যুপ রয়েছে। তা ছাড়া বাচ্চাদের দেখাশোনা করে একটু আধটু কামাইও করতে পারি। আমি না হয় লিখে দেব যে বাচ্চাদের ডিম খাওয়াব না। বোঝাই যাচ্ছে, জার্মান মায়ের পক্ষে তা অসহ্য। আর সবাই যাকে 'শিল্পের উদ্দেশ্যে সম্পর্কিত গুরুত্ব' বলে, তার কোনও মূল্যে আমার কাছে নেই। কিন্তু যেখানে ডাইরেক্টরই নেই, সেখানে ডাইরেক্টরদের নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়।

একবার আমি বহুদিন ধরে 'জেনারেল' নামে একটা ক্যারিকেচার নিয়ে কাজ করি, বহুদিন তাই নিয়ে চেষ্টা করি। তারপর যখন আমি সেটা দেখাই, তখন ওটা আমাদের জগতে যাকে সার্থক প্রচেষ্টা বলে তাই হয়েছিল—অর্থাৎ যাদের হাসা উচিত তারা হাসত, যাদের বিরক্ত হওয়া উচিত তারা

বিরক্ত হত। শোয়ের শেষে বেশ গর্ব হত। একবার ঐরকম গর্বে বুক ফুলিয়ে গ্রীনরুমে গিয়ে দেখি একটা ছোট্ট বেঁটে বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য। শোয়ের পর আমি খুবই উত্তেজিত থাকি, তখন একমাত্র মারীকে আর নিজেকে ছাড়া আর কাউকে সহ্য করতে পারি না। কিন্তু মারী বুড়িটাকে গ্রীনরুমে ঢুকিয়েছে। আমি দরজা বন্ধ করার আগেই বুড়ি কথা বলতে শুরু করে। আমাকে বলে, তার স্বামীও একজন জেনারেল ছিল, যুদ্ধে মারা গেছে। মারা যাবার আগে বুড়িকে একটা চিঠি দেয়। তাতে অনুরোধ করে কোনও পেনশন না নিতে। 'আমার বয়স কম এখনও।' বুড়ি বলেছিল, 'তবে বোঝবার মত বয়স হয়েছে'—বলে বুড়ি চলে যায়। তারপর থেকে ঐ জেনারেল ক্যারিকেচার আমি আর কোনও দিন দেখাতে পারিনি। যেসব খবরের কাগজ নিজেদের বামপন্থী বলে প্রচার করত, তারা বলেছিল আমি স্পষ্টতই প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে ভয় পেয়েছি। যেসব কাগজ নিজেদের দক্ষিণপন্থী বলে প্রচার করত তারা লিখেছিল, আমি নাকি বুঝতে পেরেছিলাম যে নিজে পূর্ব অংশের হাতের পুতুল হয়ে যাচ্ছিলাম। আর নিরপেক্ষ কাগজে লিখেছিল, আমি যাবতীয় সংস্কারকামী মতবাদ এবং দাসত্ব অস্বীকার করেছি। সব একদম বাজে কথা। ওটা আমি আর কখনও দেখাতে পারিনি, কারণ প্রত্যেকবারই সেই বুড়ির কথা আমার মনে পড়ত। তাকে নিয়ে হয়ত সবাই হাসি তামাসা করত, আর তাতে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠত। কোনও একটা কাজে যদি আমি মজা না পাই, তবে সে কাজ করা আমি বন্ধ করি—সেকথা একজন সমালোচককে, বোঝানো বোধ হয় খুব কঠিন কাজ। ওরা সবসময় 'গন্ধ পায়,' 'বুঝে ফেলে'। আর সমালোচকদের মধ্যে প্রচুর আছে এরকম যারা বুঝতেই পারে না যে তারা শিল্পী নয়, এমন কি যে, শিল্পভাবসম্পন্ন লোকদের যা থাকে তাও তাদের নেই! কাজেই সেখানে তাদের গন্ধ পাওয়া ব্যাপারটা মার খায়। আর প্রায়ই সুন্দরী অল্পবয়সী মেয়েদের সামনে কেবল বড়াই করা হয়। কারণ ওরা অতশত বোঝে না, সব অপদার্থকেই ওরা আকাশে তুলে ধরে। কারণ কিনা, তারা 'খবরের কাগজে লেখে' আর তাদের 'প্রতিপত্তি' আছে। অদ্ভুত এক ধরনের অস্বীকৃত বেশ্যাবৃত্তি আছে, যার কাছে বেশ্যাবৃত্তি আসলে রীতিমত সম্মানজনক ব্যবসা—এখানে অন্ততঃ অর্থের বিনিময়ে কিছু দেওয়া হয়।

পণ্য-ভালবাসার করুণায় যে নিজেকে একটু শান্ত করব সে পথটাও বন্ধ,

আমি কপর্দকহীন। ইতিমধ্যে মারীর স্প্যানিশ ম্যান্টিলাটা জড়িয়ে দেখা হয়ে গেছে, জার্মান ক্যাথলিজম্-এর ফার্স্ট লেডি হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করতে হবে যে। বন্-এ ফিরে এসে প্রত্যেক সুযোগ এবং সুবিধায় চায়ের নিমন্ত্রণ রাখবে। হাসবে, সমিতিগুলোতে ঢুকবে, 'ধর্মীয় শিল্পের' প্রদর্শনী উদ্বোধন করবে, আর একটা 'ভাল দর্জি' খুঁজে বেড়াবে। বন্-এর যত মহিলার বিয়ে হতো কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে। তারা সবাই 'ভাল একটা দর্জি' খুঁজে বেড়াত।

জার্মান ক্যাথলিজম্-এর ফার্স্ট লেডি মারী, হাতে চায়ের কাপ কিম্বা ককটেল গ্লাস—'আপনি সেই মিষ্টি কচি কার্ডিনালকে দেখেছেন? সে ত কাল ভার্জিন মেরী স্মৃতিস্তম্ভের উদ্বোধন করবে। ওটার নক্সা তৈরি করে দিয়েছে ক্ল্যোগার্ট। আঃ, ইটালীতে মনে হয় কার্ডিনালরাও খুব ভদ্র। কি চমৎকার।'

আমি আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েও ঠিক চলতে পারছিলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, স্রেফ হামাগুড়ি দিতে পারছিলাম, হামাগুড়ি দিয়ে ব্যালকনিতে গেলাম, দেশের হাওয়ায় একটু দম নিতে হতে হবে—তাতেও লাভ হলো না। অনেকক্ষণ হলো এসেছি বন্-এ প্রায় দু'ঘণ্টার ওপর। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বন্-এর হাওয়ায় বায়ু পরিবর্তনে কিছু লাভ হয় না।

মনে পড়ল, মারী যে ক্যাথলিক হয়ে গেল, সেজন্য ওদের আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। মারীর সাংঘাতিক রকমের সংকট উপস্থিত হয়েছিল ধর্ম-বিশ্বাস ব্যাপারে কিংকেল সম্বন্ধে হতাশার ফলে। সমারহ্বীল্ড-এর সম্বন্ধেও। আর ব্লোথার্ট-এর মত একটা লোক হয়তো সেইন্ট ফ্রানসিস্কুসকেও নাস্তিক বানিয়ে ছাড়ত। একসময়ে ও বেশ কিছুদিন গীর্জাতেও যায়নি, গীর্জায় গিয়ে আমাকে বিয়ে করার কথাও কখনো ভাবেনি, কেমন এক ধরনের অস্বীকার ওকে পেয়ে বসেছিল। চক্রের ওরা সবসময় নিমন্ত্রণ করত, কিন্তু আমরা বন্ ছাড়বার তিন বছর পর ও প্রথম ওদের চক্রে যায়। সেবার ওকে আমি বলেছিলাম, হতাশা কারণ নয়। ও যদি ব্যাপারটা নিজে ঠিক মনে করে, তবে হাজারটা ব্রেডেবয়েলও তা ভুল প্রমাণ করতে পারবে না। আর তাছাড়া ৎস্যুফনার-এর মত লোকও তো আছে—যদিও ৎস্যুফনারকে আমার একটু কাঠ-কাঠ মনে হয়, আমার মনের মত নয় মোটেও, তবুও আমি ওকথা বলেছিলাম, কারণ ক্যাথলিক হিসেবে ওকে বরং বিশ্বাস করা যায়। বিশ্বাস

করবার মত অনেক ক্যাথলিক নিশ্চয় আছে, যেসব প্যান্টারদের বক্তৃতা আমি শুনেছি, তাদের আমি গুনে গুনে দেখিয়েছি ওকে। ওকে মনে করিয়ে দিয়েছি পোপের কথা, গ্যারী কুপার, আলেক গীনেস্-এর কথা—আর ও নিজেকে পোপ জোহান আর ৎস্যাফ্নার-এর কাছাকাছি ঠেলে তুলত। আশ্চর্যের কথা যে, হাইনরিখ বেলেন-এর ওপর ওর সে-সময় কোনও টান ছিল না, বরং উলটো। ও বলতো বেলেন নাকি গায়েপড়া, ওর কথা তুললেই মারী কেমন অশান্তিতে পড়তো, যার ফলে আমার সন্দেহ হয় যে বেলেন মারীর সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠ' হয়েছে। ও ব্যাপারে আমি মারীকে কখনও প্রশ্ন করিনি, কিন্তু আমার সন্দেহটা বেশ বড় রকমের ছিল, আর বেলেন-এর বাসায় কাজকর্ম করে দেয়ার মেয়েলোকটার কথা ভাবলে আমি বেশ বুঝতে পারতাম যে, ও মারীর সাথে 'ঘনিষ্ঠ' হয়েছিল। সে চিন্তা করলেই আমার বিশ্রী লাগতো, কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম, বোর্ডিং স্কুলের অনেক বিশ্রী ব্যাপার যেমন বুঝতে পারতাম, তেমনি।

আমার এতক্ষণে মনে পড়ল যে আমিই বলেছিলাম, ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিলে পোপ জোহান আর ৎস্যাফ্নার-এর মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে। ক্যাথলিজম্ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ সৎ ব্যবহার করেছি, আর সেটাই হয়েছিল ভুল, কিন্তু আমার কাছে মারী এত স্বাভাবিক রকমের ক্যাথলিক ছিল যে, ওর ঐ প্রকৃতি আমি উপভোগ করতাম। ওর ঘুম না ভাঙলে আমি ওকে জাগিয়ে দিতাম যাতে সময় মত গীর্জায় যেতে পারে। বহুবার আমি ওর ট্যাক্সি ভাড়া দিয়েছি যাতে গীর্জায় পৌঁছুতে দেরী না হয়, যদি কখনও আমরা ইভাঞ্জেলিস্ট এলাকায় গিয়ে পড়তাম, তবে আমি ওর জন্য কত যে টেলিফোন করেছি, একটা ক্যাথলিক উপাসনার খবর পেতে তার ঠিক নেই। আর ও আমাকে সবসময় বলত, আমার ঐ ব্যবহার ওর 'বিশেষ' ভাল লাগে। কিন্তু তারপরও আমাকে ঐ রদ্দি কাগজে সই করতে হবে, লিখে দিতে হবে যে আমি বাচ্চাদের ক্যাথলিক মতে মানুষ করতে দেব। আমরা তো কতবার আমাদের বাচ্চাদের নিয়ে কথা বলেছি। বাচ্চার কথা ভাবলে আমার কি ভালই লাগত! আমার বাচ্চাদের সঙ্গে আমি কত গল্প করেছি, তাদের কোলে নিয়েছি, দুধের মধ্যে কাঁচা ডিম মিশিয়েছি ওদের জন্য। একটা কথা ভাবলে আমার খারাপ লাগত যে আমাদের হোটেলে কাটাতে হবে, আর হোটেলে একমাত্র কোটিপতি আর রাজার ছেলেমেয়েদের যত্ন করা

হয়। কোটিপতির নয় বা রাজার নয় এমন লোককে নাহলেও তাদের ছেলেদের প্রথমেই ধমক দেয়া হবে, 'এটা বাড়ি পাওনি'। তিন তিনটে ভুল করা হয়, বলে দেয়া দরকার। বাড়িতে মানুষ শুয়োরের মত আচরণ করে শুয়োরের মত আচরণ করেই মানুষ আনন্দ পায় আর বাচ্চা অবস্থায় মানুষের কোনও রূমেই আনন্দ পাওয়ার কথা নয়। বাচ্চা মেয়ে হলে সবসময় একটা সম্ভাবনা থাকে যে তাকে 'মিষ্টি' মনে করা হবে এবং তার সাথে ভাল ব্যবহার করা হবে। কিন্তু ছেলের বেলায়, তার বাবা-মা যদি সামনে না থাকে তবে প্রথমেই ধমকে দেয়া হবে। জার্মানদের কাছে তো প্রত্যেকটা বাচ্চা ছেলেই বয়ে যাওয়া ছেলে। ওই বয়ে যাওয়া শব্দ দুটো কখনই উচ্চারণ করা হয় না, ছেলে শব্দটার মধ্যেই যেন মিশে গেছে। যদি কখনও কারও মাথায় আসে, বাবা-মায়েরা তাদের বাচ্চাদের সাথে কথা, বলবার সময় কি কি শব্দ ব্যবহার করে তা পরীক্ষা করে দেখবার কথা তাহলে সে দেখতে পাবে যে, সেই শব্দগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে বিল্ড-ৎসাইটুঙ-এর শব্দগুলো প্রায় গ্রীম-ভাইদের ডিক্শনারির শব্দের মতো মনে হবে। আর বেশি দেরি নেই—জার্মান বাবা মায়েরা খুব শিগগির তাদের বাচ্চাদের সাথে কেবল মাত্র কালিক-ভাষায় কথা বলবে—ও, কি সুন্দর আর ও, কি বিশ্রী। মাঝে মাঝে অন্য কিছু বলবার খাতিরে 'কোনও কথা নয়' বা 'ও তুমি বুঝবে না' কথাগুলো বেছে নেবে। আমাদের বাচ্চাদের পোশাক-আশাক কেমন হবে, সে ব্যাপারেও আমি মারীর সঙ্গে কথা বলেছি, মারীর ইচ্ছা ছিল 'সাদা রঙের চমৎকার ছাঁটের বর্ষাতি' পরার, আর আমার ইচ্ছা আনোরাক্ পরাবার। কারণ আমার ধারণা, চমৎকার ছাঁটের সাদা বর্ষাতি পরে একটা বাচ্চা ধুলো-কাদায় খেলা করতে পারে না। কিন্তু সেই ধুলো-কাদায় খেলার পক্ষে আনোরাকই ঠিক পোশাক। আমি সব সময় প্রথমে একটা মেয়ে হবে ভাবতাম—আনোরাক পরলে গরম পোশাকও হবে আবার হাত দুটোও খালি থাকবে, আর কাদার মধ্যে ঢিল ছুঁড়লে ছিটকে আসা কাদা বর্ষাতিতে লাগবে না। লাগলে লাগবে পায়ে এসে, আর কৌটোয় করে কাদাজল আনবার সময় হয়তো সেই নোংরা জল কৌটোর গা বেয়ে গড়িয়ে পড়বে। তাহলে তা বর্ষাতিতে লাগবে না। যাই হোক, কেবলমাত্র পা দুটো নোংরা হবার সম্ভাবনাই বেশি। মারীর বক্তব্য, সাদা বর্ষাতি হলে মেয়েটা আরও বেশি করে সাবধান হবে, তবে আমাদের বাচ্চারা সত্যি সত্যিই ধুলো কাদায়

খেলতে পারে কিনা সে ব্যাপারটা নিয়ে কখনও কথা ওঠেনি। মারী কেবলই মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে যেত—দেখা যাবে কি হয়।

গ্যোফনারের বাচ্চা ওর পেটে হলে তাকে ও আনোরাক বা চমৎকার প্লিটের সাদা বর্যাতির কোনটাই পরাতে পারবে না, ওদের বাচ্চাদের অমনি ছেড়ে দিতে হবে, কারণ যাবতীয় রকমের বর্যাতি নিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করেছি। আমার আণ্ডারওয়্যার লম্বা হবে না ছোট হবে সে নিয়েও আলোচনা করেছি—গেঞ্জি, মোজা জুতো সব ব্যাপারে। ওদের বাচ্চাদের উলঙ্গ অবস্থায় বন্ শহরে চলাফেরা করতে দিতে হবে, নইলে ওর নিজেকে বেশ্যা বা বিশ্বাসঘাতিনী মনে হবে। ওদের বাচ্চাদের কি খেতে দেবে তাও বুঝতে পারি না—আমরা সবরকম শিশুখাদ্য, সবরকম পুষ্টির উপায় নিয়ে কথা বলেছি। একটা ব্যাপারে আমরা একমত ছিলাম যে, আমাদের বাচ্চারা শুধু গিলবে না। যেসব বাচ্চাদের কেবল দুধ বা অন্য কিছু গেলানো হয় সব সময়ে কিম্বা গলা দিয়ে গুঁজে গুঁজে দেয়া হয়, সেরকম বাচ্চা আমাদের হবে না। আমার বাচ্চাদের জোর করে খাওয়ানো হবে, এটা আমার পছন্দ নয়। সাবিনে এমণ্ডস্ যখন বিশেষ করে তার প্রথম দুই বাচ্চাকে ঠেসে ঠেসে খাওয়াত, তা দেখলেই আমার বিরক্ত লাগত। কার্ল তার প্রথম বাচ্চার নাম কি জানি কেন এডেলটুড রেখেছিল। আর ঐ ডিম খাওয়ানোর ব্যাপারে আমি মারীর সঙ্গেও তর্ক করেছি, ও ডিম খাওয়ানোর বিপক্ষে। তর্ক করতে করতে ও বলেছিল, ওসব নাকি বড়লোকদের খাদ্য, তারপরই লাল হয়ে উঠেছিল। তখন আমাকে সান্ত্বনা দিতে হয়েছিল। আর সবার তুলনায় লোকে আমার সঙ্গে অন্যরকম ব্যবহার করত, কারণ আমার জন্ম কয়লা খনির মালিক শ্নীয়ার বংশে, সেটা আমার সহ্য হয়ে গিয়েছিল। মারীর বেলায় মাত্র দুবার ঘটেছে যে ও সেই প্রসঙ্গে একটা বাজে কথা বলে ফেলেছে—সেই প্রথম দিন, যখন আমি নিচে ওদের রান্নাঘরে নেমে এসেছিলাম, আর ঐ ডিম নিয়ে কথা কাটাকাটির সময়। বড়লোক বাবা-মা থাকাটা কুৎসিত আরও বেশি কুৎসিত অবশ্য যদি তাদের সম্পদের ভাগ কখনও না পাওয়া যায়। ডিমটা আমাদের বাড়িতে খুব কম খাওয়া হত, আমার মায়ের ধারণা ছিল ডিম 'রীতিমত ক্ষতিকারক'। এডগার ভীনেকেন-এর বেলা ছিল উল্টো ধরনের যন্ত্রণা, ওকে সর্বত্র শ্রমিক-সন্তান বলে পরিচয় করিয়ে দেয়া হত। এমন কি পাদ্রীরাও ওর পরিচয় দেবার সময় বলত—'একটি

বিশুদ্ধ শ্রমিক-সন্তান,' শুনতে মনে হত যেন বলছে—দেখ তোমরা, ওর মাথায় দুটো শিং নেই, আর দেখতেও কেমন বুদ্ধিমান। এটা একটা শ্রেণীর সমস্যা, এ নিয়ে মায়ের সেণ্ট্রাল কমিটির একবার চিন্তা করা উচিত। মাত্র ক'জন লোকের ব্যাপারে কোনও দোষ ছিল না, তারা হচ্ছে মারীর বাবা আর হ্যানেকেনরা। কয়লাখনির মালিক বংশে জন্ম বলে ওরা আমাকে দাগী করে রাখত না, বা আমার মাথায় একটা মুকুটও পরিয়ে দিত না।

নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেলাম, আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বন্ শহর দেখছিলাম। কেবল মাটির দিকেই তাকিয়ে থাকলাম, হাঁটুতে বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু যে মার্কটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম সেটা আমাকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। ওটা ফিরে পেলে খুব ভাল হত, আবার এখন রাস্তায় যেতেও পারছি না, যে কোনও মুহূর্তে লেয়ো আসতে পারে। ওদের গ্রাম বা ঘন দুধ খাওয়া আর টেবিলের প্রার্থনা একবার তো শেষ হবেই। রাস্তার মার্কটা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম না—বেশ নিচে, তাছাড়া একমাত্র রূপকথাতেই ওসব জিনিস এমন ঝক্‌ঝক্ করে যে লোকের চোখে পড়ে। এই প্রথম অর্থ সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে নিজের কাজের জন্য অনুতাপ হচ্ছে। ছুঁড়ে ফেলে দেয়া ঐ মার্ক—বারোটা সিগারেট, ট্রামের দুবারের টিকিট, একটা সসেজ দেয়া রুটি। অনুতাপ নয়, তবে বিশেষ একটা বিষাদের সঙ্গে ভাবছিলাম সেই সমস্ত নীডার সাক্‌সেন-এর দিদিমাদের টিকিটের জন্য খরচাগুলোর কথা, একটা মেয়েকে চুমু খাবার পর যদি সে অন্য কাউকে বিয়ে করে তখন লোকে যেমন বিষণ্ণ ভাবে চুমুগুলোর কথা ভাবে, তেমনি। লেয়োর ওপর তেমন ভরসা করা যায় না, টাকাপয়সা সম্বন্ধে ওর অদ্ভুত সব ধারণা, অনেকটা ঐ নানরা যেমন ভাবে 'বিবাহিতের প্রেম' সম্বন্ধে সেই রকম।

রাস্তার ওপর কিচ্ছুটি ঝিক্‌ঝিক্ করছে না। সব আলোর ঝকঝক করছে, তবুও তারার মত ঝিক্‌ঝিক্ করছে না কিছু, শুধু মোটরগাড়ি, ট্রাম আর বন্-এর লোকজন। শুধু আশা করছি যে, মার্কটা একটা ট্রামের ছাদের ওপর রয়ে গেছে, ডিপোর কেউ একজন পাবে ওটা।

ইভাজেলিস্ট গীর্জার বুকেও আমি অবশ্য আশ্রয় নিতে পারি। কিন্তু— বুকের কথা ভাবতেই আমার গা হিম হয়ে এল। লুথারের বুক জড়িয়ে ধরতে পারি আমি, কিন্তু 'ইভাজেলিস্ট গীর্জার বুক'—না। যদি আমাকে মিথ্যা বড়াই করতেই হয়, তবে আমি সেটা সাফল্যের সাথে করতে চাই, তখন

বরটা সত্তব মজা পেতে চাই। একটা ক্যাথলিক হয়ে বড়াই করতে আমার খুব মজা হবে, মাস ছয়েক নিজেকে 'সরিয়ে' রাখব, তারপর শুরু করব সুমারহ্বিন্ড-এর সন্ধ্যার বক্তৃতায় মেতে—যতদিন না কাথোলোন ব্যাপারে উচ্ছ্বসিত হব দগদগে ঘা-এর পোকার মত। কিন্তু তা করলে থাবার দেক নজরে পড়ে কয়লাখনির অফিসে বাস এ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক সই করবার শেষ সুযোগটাও হারাবো। হয়তো আমার মা আমাকে তার সেণ্ট্রাল কমিটিতে একটা ব্যবস্থা করে দেবে, আমাকে সুযোগ দেবে আমার জাতি সংক্রান্ত থিয়োরিগুলো সম্বন্ধে বলবার। আমি আমেরিকা যাব, সেখানকার মহিলা সমিতিগুলোতে জার্মান যুবসমাজের অনুতাপের জীবন্ত প্রমাণ হিসেবে বক্তৃতা দেব। কিন্তু, অনুতাপ করবার মত আমার কিছু নেই, কিছু না, অর্থাৎ আমাকে অনুতাপের ভান করতে হবে। আমি ওদের বলতে পারি, কেমন করে টেনিস খেলার মাঠে আমি হ্যারবার্ট কালিকের মুখে ধুলো ছুঁড়েছিলাম, কেমন করে আমি নিশানা রাখবার ছাপরা ঘরটায় বন্দী ছিলাম আর তারপর কেমন বিচারের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম—কালিক, ব্রুল, ল্যোফেনিষ্-এর সামনে। কিন্তু ওসব কথা বললেও ভান করা হয়ে যাবে। ঐসব খুঁটিনাটিগুলো আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না কিংবা ওগুলোকে মেডেলের মত গলায় ঝুলিয়ে রাখতে পারব না। সবাই তাদের বীরত্বব্যঞ্জক মেডেল গলায় ঝোলায় বা বুকে লাগিয়ে রাখে। নিজেকে অতীতের সঙ্গে যুক্ত রাখা হচ্ছে ভান করা, বড়াই করা। খুঁটিনাটিগুলো তো আর কেউ জানে না—যেমন হেনরিয়েটে তার নীল টুপিটা মাথায় দিয়ে ট্রামে বসে রওনা হয়েছিল লেভারকুজেন-এর ওদিকে ইহুদী ইয়াংকিদের হাত থেকে মহান জার্মানভূমি রক্ষা করবার জন্য।

না, সবচেয়ে নির্ভুল বড়াই আর যাতে আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ হবে তা হচ্ছে, 'ক্যাথলিক তাস নিয়ে বাজি ধরা'। তাতে প্রত্যেকবারই জিত হয়েছে।

ইউনিভার্সিটির ছাদের ওপর দিয়ে হোফগার্টেনের গাছগুলোর দিকে আর একবার তাকালাম—ওর পেছনে বন্ আর গোডেসবার্গ-এর মাঝামাঝি চালু জমির ওপর মারী থাকবে। ভালই। ওর কাছাকাছি থাকাই ভাল। যদি ও ভাবতে পারত যে আমি প্রায় সবসময় বাইরে বাইরে আছি, তা হলে ওর পক্ষে খুবই সহজ হত। ওকে সবসময়ে প্রস্তুত থাকতে হবে যে আমার সঙ্গে

দেখা হয়ে যাবে, আর প্রত্যেকবার লজ্জায় লাল হয়ে যাবে বরাবর ওর মনে পড়বে ওর জীবনটা কেমন নোংরা—অন্যায় বিচ্ছেদের ফল। যদি কখনও ওর বাচ্চাসমেত ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়, আর বাচ্চাদের গায়ে বর্ষাতি বা আলোয়ান থাকে, তাহলে হঠাৎ ওর মনে হবে বাচ্চারা উলঙ্গ।

শুনুন দেবী, শহরে কানাকানি হবে, বলবে আপনি বাচ্চাদের উলঙ্গ অবস্থায় পথে পথে ঘুরতে দেন। ওটা বাড়াবাড়ি। আর আপনি একটা কথা ভুলে গেছেন দেবী, এক বিশেষ সময়ে যখন বলেছিলেন, আপনি মাত্র একজনকে ভালবাসেন—আপনি মাত্র আপন একজনকে ভালবাসেন বলা উচিত ছিল। আরও কথা উঠবে, অন্তঃসারহীন গজগজানি। আপনি ভাবেন, সবাই কেন নিজেকে অপূরণীয় মনে করে, প্রত্যেকে, সেই বিশেষ একজনের মত। কি আর করা, সবাই যে গোয়েন্দা গল্প পড়ে। চমৎকার সাজান বৈঠকখানায় সুন্দর রুচির ছাপ, সেখানে গোয়েন্দা কাহিনীর মলাট বেমানান, সে কথা ঠিক। ডেনমার্কের লোকেরা গোয়েন্দা কাহিনীর মলাটের দিকে নজর দেয়নি, ফিনল্যাণ্ডের ওরা বেশ চালাক চতুর, তাদের দেশের ঐ মলাট চেয়ার, সোফা, গ্লাস আর সসপ্যানের সঙ্গে মানিয়ে যাবে। আমি তো রোথার্ট-এর বাড়িতেও গোয়েন্দা কাহিনী দেখেছি, এখানে ওখানে পড়ে ছিল। যেদিন ওর বাড়ি দেখতে যাওয়া হয়েছিল, সেদিন সন্ধ্যায় ওগুলো তেমন যত্ন করে লুকিয়ে রাখা হয়নি, যে লজ্জা ঢাকা পড়বে।

দেবী, সবসময় অন্ধকারে, সিনেমায় বা গীর্জায়, অন্ধকারে বৈঠকখানায় গীর্জার সঙ্গীত, টেনিস মাঠের আলোকে ভয়—কত কানাকানি। ম্যানস্টারে ত্রিশ-চাল্লিশ মিনিট ধরে কনফেশন। আর যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের চোখের উৎকণ্ঠা লুকিয়ে রাখতে পারেনি। বাব্বাঃ, এত কি আছে কনফেশনের, বরটা তো দেখছি বেশ সুন্দর, অমায়িক উদার, প্রকৃত সৎপুরুষ, একটা সুন্দর মিষ্টি বাচ্চা মেয়ে, দুটো গাড়ি। গরাদের ওপাশে উত্তেজিত অধৈর্য। অন্তহীন ফিসফিস—ভালবাসা, বিবাহ, কর্তব্য, ভালবাসা আর সবশেষে প্রশ্ন—'বিশ্বাসও হারাওনি কি হয়েছে তোমার, মেয়ে ?'

তুমি তা উচ্চারণ করতে পারবে না, ভাবতেও পারবে না মুখ ফুটে বলবার কথা, সেকথা আমি জানি। তোমার দরকার একজন ক্লাউন, সরকারী কাগজে লেখা আছে—

মেকআপ নেবার জন্য বাথরুমে গেলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মেকআপ ছাড়া বাবার সামনে দাঁড়ানো বা বসা ঠিক হয়নি। কিন্তু বাবা যে আসতে পারে সেকথা আমি ভাবতেই পারিনি। সেয়ো ছিল সব সময় আমার প্রকৃত মত, প্রকৃত চেহারা, প্রকৃত আমিকে দেখবার জন্য ব্যাকুল, ওর দেখার দরকার ছিল। আমার 'মুখোস' ব্যাপারে ওর ভয় ছিল, ওর ভয় ছিল মেকআপ ছাড়া আমার খেলা-কে ; বলত, ওসবের 'গুরুত্ব' নেই। মেকআপের বাক্সটা এখনও এসে পৌঁছোয়নি, বোখুম আর বন্-এর মাঝখানে কোথাও আছে। বাথরুমের সাদা দেয়াল-আলমারীটা খুলেই বুঝলাম ভুল করেছি। আমার জানা উচিত ছিল, ওর মধ্যে কি সাংঘাতিক এক মানসিক আঘাত আমার জন্য লুকিয়ে আছে। মারীর নিজস্ব ব্যবহারের সব জিনিস—টিউব আর কৌটো, শিশি-বোতল, কাজলের পেন্সিল—কিছু নেই ওর মধ্যে, আর অত স্পষ্টভাবে ওসবের কিছু না থাকা মারাত্মক মনে হল। মনে হল যেন আমি একটা টিউব বা একটা কৌটো পেলাম। সব উধাও। হয়ত মণিকা সিলভস-এর মনে লেগেছিল—সব গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে চলে গেছে। আয়নায় দেখলাম নিজেকে—চোখ দুটো সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন। এমনিতে আধঘণ্টা ধরে চেষ্টা করতে হয় আমাকে ঐ ভাবলেশহীন দৃষ্টি আনতে। জীবনে এই প্রথম কোনও রকম চেষ্টা করতে হল না। মুখটা দেখে মনে হচ্ছিল, এইবার আত্মহত্যা করবে, তারপর যখন মেকআপ নিতে শুরু করলাম তখন ওটা মরা মানুষের মুখ হয়ে গেল। মুখে ভেসলিন মেখে তার ওপর একটা টিউব থেকে আধা শুকনো সাদা রঙ বার করে মাখলাম টিউবটা টিপেটুপে যা ছিল সবটা বার করে মুখটা একেবারে সাদা করে ফেললাম—একটা কাল আঁচড় পর্যন্ত না, একটা লাল বিন্দু না, সবটা সাদা, ভ্রু দুটোও সাদা। ওই মুখের সঙ্গে আমার চুলটা পরচুলার মত দেখাচ্ছিল। ঠোঁট দুটো কালচে, চোখদুটো প্রায় নীল, হাল্কা নীল, যেন পাথরের আকাশ। একজন কার্ডিনাল যখন তার সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, কিন্তু তবুও না, স্বীকার করতে চায় না, তখন তার চোখে যে দৃষ্টি দেখা যায়, সেইরকম ফাঁকা আমার দৃষ্টি। নিজেকে নিয়ে আর আশঙ্কাও হচ্ছে না। এই মুখ নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ তৈরি করতে পারতাম। চাই কি সেই ব্যাপারটা নিয়ে কল্পাই করতে পারতাম—সেই ব্যাপারটা যার অসহায় অবস্থা, যার নির্বোধ প্রকৃতি সত্ত্বেও আমার কাছে আর সবের তুলনায় সবচেয়ে ভাল লাগত—একজার ব্যালেকেন

যে ব্যাপারে বিশ্বাস করতো। এই ব্যাপারটার অন্তত স্বাদ বিস্বাদ বলে কিছু ছিল না, আর সব সততাহীনের মধ্যে ঐ রুচিহীনতার জন্যই ওটা একটু সৎ। নীচ প্রকৃতির মধ্যে সবচেয়ে কম নীচ। কালো ছাড়া তাহলে, গাঢ় বাদামী আর নীলও একটা বিকল্প, লাল বলাটা আবার বড্ড নরম করে বলা হবে, বড্ড বেশি আশা তাতে। ছাই রঙ, তাতে হাল্কা একটা সকালের সূর্যের রঙ। একটা বিষন্ন ব্যাপারের জন্য এক বিষন্ন রঙ। এই ব্যাপারে একজন ক্লাউনেরও যেন ভূমিকা আছে—ক্লাউন জীবনের সবচেয়ে খারাপ অপরাধ করে বসে আছে—করুণার উদ্রেক করছে। বাজে ব্যাপারটা শুধু এই যে, এডগারকে আমি কখনই ঠকাতে পারব না, ওর কাছে বড়াই করতে পারব না। আমিই একমাত্র সাক্ষী, যে ওকে একশ মিটার ১০·১ সেকেণ্ডে দৌড়তে দেখেছে। আর, যে সামান্য কজন আমাকে আমি যা তা-ই ভাবত, যাদের কাছে আমি যা তা-ই ছিলাম, ও তাদের মধ্যে একজন। ওরও সেই সব বিশেষ লোকেদের ওপর কোনও বিশ্বাস ছিল না, যে সব লোক মানুষের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করত ঈশ্বরে, এ্যাবস্ট্রাক্ট টাকা-পয়সায়, সরকার জাতীয় কিছুতে আর জার্মান দেশে। এডগার নয়। আমি সেবার যখন ট্যাক্সি নিয়েছিলাম, তাতেই ও যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছে। এখন আমার কষ্ট হচ্ছে, ওকে বুঝিয়ে বলার দরকার ছিল, অন্য কাউকে কিছু বোঝাবার দায় আমার নেই। আয়নার সামনে থেকে সরে গেলাম। বড্ড ভাল লাগছিল, আয়নায় যাকে দেখলাম, একটা মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি যে, ওটা আমি নিজে। ওটা আর ক্লাউন নয়, একজন মৃত আত্মা মৃতের ভূমিকায় অভিনয় করছে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে শোবার ঘরে গেলাম, মারীর পোশাকপত্তর দেখতে পাবার ভয়ে এতক্ষণ ওখানে ঢুকিনি। বেশির ভাগ পোশাকই আমি নিজে ওকে কিনে দিয়েছি, এমনকি একটু আধটু ছোট বড় করবার ব্যাপারেও দর্জির সাথে কথা বলেছি। লাল আর কাল ছাড়া ওকে প্রায় সব রঙই মানায়, ছাই রঙও ওকে মানায়, একটুও ম্যাড়মেড়ে লাগে না, গোলাপী রঙটা খুব ভাল মানায় আর সবুজ। মেয়েদের ফ্যাশান ডিপার্টমেণ্টে কাজ করলে ভাল পয়সা রোজগার করতে পারতাম, কিন্তু একজন এক-পত্নীবাদীর পক্ষে সমকামী না হলে তা এক সাংঘাতিক যন্ত্রণা। বেশির ভাগ লোকই তাদের বৌদের চেক দিয়ে দেয় আর বলে 'ফ্যাশানের হুকুম' মেনে চলতে। তখন যদি বেগুনী রঙটা চালু থাকে, তবে এইসব মেয়েরা সবাই বেগুনী পোশাক

পরাচ্ছে, ওরা তো সবাই চেক খেয়ে যাচ্ছে। তারপর যদি একটা পার্টি হয়, তাহলে সেখানে প্রত্যেকটি মহিলা নিজেকে 'অন্যের থেকে আলাদা' প্রমাণ করার জন্য বেগুনী পোশাকে ঘুরে বেড়াবে। দেখে মনে হবে যেন বহু কষ্টে জীবন ফিরে পাওয়া মেয়ে-বিশপদের সাধারণ সভা। খুব কম মেয়েকেই বেগুনী রঙ মানায়। মারীকে খুব ভাল মানাত। যখন আমি বাড়িতে ছিলাম তখন একবার হঠাৎ বস্তার ফ্যাশান চালু হয়, আর ঐসব বেচারী বৌরা তাদের স্বামীদের হুকুমে নিজেদের 'কেতাদুরস্ত' করে সব ছুটে এসেছিল আমাদের সেই 'বিশেষ উৎসবে'—সব সেই বস্তা পরা দু একজন মহিলার জন্য আমার বেশ কষ্টই হচ্ছিল—বিশেষ করে সেই লম্বা চওড়া মহিলাটি, যার স্বামী সেই সব অগুনতি প্রেসিডেণ্টদের একজন। মহিলাটির জন্য এত কষ্ট হয়েছিল যে মনে হচ্ছিল তার কাছে গিয়ে কিছু একটা দিই—একটা টেবিল-ক্লথ কিম্বা একটা পর্দা—করুণার আবরণের মত তাই দিয়ে জড়িয়ে দিই তাকে। তার স্বামীটি কিছুই খেয়াল করেনি, কিছুই দেখেনি, কিছুই শোনেনি—একটা হাঁদা কুকুর। একটা সমকামী যদি তাকে বলত যে গোলাপী রঙের শেমিজ ফ্যাশান হয়েছে, তবে সে তাই পরিয়ে বৌকে বাজারে পাঠাত। পরদিন সেই লোকটা দেড়শো ইভাঞ্জেলিস্ট পাদ্রীর সামনে বক্তৃতা দিয়েছে, বিষয়—বিবাহে উপলব্ধি। লোকটা বোধ হয় জানত না যে তার বৌ-এর হাঁটু এত চোখামত যে ছোট পোশাকে তাকে মানায় না।

আয়নায় দেখবার জন্য একটানে আলমারীটা খুললাম—মারীর কোনও জিনিস নেই আলমারীতে, নেই 'একটা জুতোর ফিতেও, না একটা বেল্ট'। মেয়েরা তো কত সময় ওসব ফেলে যায়। ওর সেণ্ট-এর গন্ধও নেই বললেই চলে, দয়া করে আমার জিনিসগুলোও নিয়ে গেলে পারত, কাউকে দিয়ে দিত কিম্বা না হয় পুড়িয়ে ফেলত। কিন্তু আমার জিনিসপত্র সব ঝুলছে—একটা সবুজ ম্যাঞ্চেস্টার প্যাণ্ট, ওটা আমি কোনও দিন পরিনি, একটা কালো টুইডের কোট, দুচারটে নেকটাই আর নিচে জুতো জায়গায় তিন জোড়া জুতো; ছোট ড্রয়ারটাতে সব পাওয়া যাবে, সব—হাতার বোতাম, কলারের তলে লাগাবার সাদা কাঠিগুলো, মোজা আর রুমাল। আমার বোঝা উচিত ছিল, সম্পত্তির ব্যাপারে খ্রীস্টানরা খুবই সচেতন, অধিকার সম্বন্ধে ওদের ধারণা স্পষ্ট। ড্রয়ারটা খোলবার কোনও দরকার আছে বলে মনে হয় না, আমার [illegible] জিনিস ওতে আছে, ওর সবই উধাও। আমার জিনিসপত্রগুলোও

বাঁধি নিয়ে যেত, তাহলেই যেন ভাল হত। কিন্তু আমাদের এই আলমারিকে সবাই দায়ে মিলেছাম, সাংঘাতিক রকমের ঠিকঠাক। মারী যখন ঐ সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে যায়, যেগুলো দেখলেই ওর আমার কথা মনে পড়বে, তখন ওর নিশ্চয় কষ্ট হয়েছে আমার জন্য। ও নিশ্চয় কেঁদেছে, সিনেমার যেমন কাঁদে ফিরে ভেঙে যাওয়া মেয়েরা, আর বলে, 'তোমার কথা আমি জীবনে ভুলব না।'

গোছানো, পরিষ্কার আলমারী (কে একজন ঝাড়ন দিয়ে ধুলোও ঝেড়ে রেখেছে), ওটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিচ্ছিল। যা রেখে গেছে, সব কেমন গোছগাছ করা, নিখুঁত, ওর জিনিসগুলো আমার জিনিসপত্তর থেকে আলাদা। আলমারীর ভেতরটায় যেন একটা অপারেশন নির্বিঘ্নে হয়ে যাবার পরের অবস্থা। ওর কিছুই নেই, ব্লাউজের একটা ছেঁড়া বোতাম পর্যন্ত না। আলমারীর দরজাটা খোলা রাখলাম যাতে আয়নার সামনে দাঁড়াতে পারি। রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে ব্র্যান্ডির বোতলটা কোটের পকেটে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বসবার ঘরে এলাম। সোফায় শুয়ে প্যান্টটা গুটিয়ে নিলাম। হাঁটুটা খুব ফুলে উঠেছে, কিন্তু শুয়ে পড়তেই ব্যথাটা কমে গেল। প্যাকেটে আর চারটা সিগারেট আছে, ওর থেকে একটা ধরালাম।

ভাবছিলাম, মারী যদি ওর পোশাক-আশাক সব এখানে রেখে যেত, তাহলে ব্যাপারটা কতটা বিশ্রী হত, কিম্বা—সব নিয়ে যেত, সবটা পরিষ্কার ঝকঝকে, কোথাও একটা চিরকুটও না, যাতে 'তোমার কথা আমি জীবনে ভুলব না' লেখা। তাহলেই বোধ হয় ভাল হত, হয়ত তাহলে কোথাও ব্লাউজের একটা ছেঁড়া বোতাম পড়ে থাকত, কিম্বা একটা বেল্ট ঝুলে থাকতে পারত, কিম্বা আলমারীটা শুদ্ধ নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেললে ভাল হত।

হেনরিয়েটের মৃত্যু সংবাদ যখন আসে তখন আমাদের বাড়িতে সবে খাবার দেয়া হয়েছে, আন্না হেনরিয়েটের ন্যাপকিনটা একটা হলুদ রং-এর মধ্যে ঢুকিয়ে সাইড বোর্ডের মধ্যে রেখে দিয়েছিল, ওটা তখনও ধোবার মত নোংরা হয়নি, আমরা সবাই সেই ন্যাপকিনটার দিকে তাকিয়েছিলাম, ওটার গায়ে একটুখানি মারমেলেড লেগেছিল আর একটা ছোট্ট বাদামী দাগ, স্যুপ কিম্বা কোকোর। সেই প্রথম আমার মনে হয়েছিল, কেউ চলে যাবার বা মারা যাবার পর তাদের ফেলে যাওয়া জিনিসগুলো কিরকম সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। মা কিন্তু সত্যি সত্যি খাবার চেষ্টা করেছিল, উদ্দেশ্য নিশ্চয়—জীবন

আটকে থাকে না বা ঐজাতীয় কিছু। আমি কিন্তু ঠিক জানতাম, জীবন আটকে থাকে না কথাটা সত্য নয়, সত্য মৃত্যু। মায়ের হাতের স্যুপের চামচে বাড়ি মেরে দৌড়ে বাগানে চলে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি আতঙ্ক, চেঁচামেচি পুরোদমে চলছে। গরম স্যুপে মায়ের মুখ পুড়ে গেছে। আমি ছুটে হেনরিয়েটের ঘরে গিয়ে জানালাটা হাট করে খুলে ফেললাম, তারপর হাতের কাছে যা পেলাম সব ঐ জানালা দিয়ে বাগানে ফেলে দিলাম। ছোট ছোট বাক্স, পোশাক, পুতুল, টুপি, জুতো সব, তারপর ড্রয়ার খুলতে দেখি ওর ভেতরের জামাকাপড় আর তার মধ্যে অদ্ভুত ছোট সব জিনিস—ওগুলোর মূল্য ওর কাছে নিশ্চয় খুব ছিল—শুকনো ঘাস, পাথর, ফুল, কাগজের টুকরো আর পুরো বাণ্ডিল চিঠি, গোলাপী ফিতে দিয়ে বাঁধা। টেনিস ব্যাট, জুতো, ট্রাঙ্ক, যা হাতের মধ্যে এল ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বাগানে। লেয়ো পরে বলেছিল, আমাকে নাকি 'পাগলের' মত দেখাচ্ছিল, আর সব এমন তাড়াতাড়ি ঘটে গিয়েছিল যে কেউ কিছু করে উঠতে পারে নি। পুরো ড্রয়ারটা নিয়ে সোজা জানালা দিয়ে উপুড় করে দিয়েছিলাম, ছুটে গ্যারেজে গিয়ে পেট্রোলের টিন এনে ওর ওপর ঢেলে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। আর আশেপাশে যা ছড়িয়ে পড়েছিল, পা দিয়ে আগুনের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলাম। শুকনো ঘাস, পাথর, কাগজের টুকরো, চিঠির বাণ্ডিল সব খুঁজে খুঁজে আগুনে ফেলে দিয়েছিলাম। খাবার ঘরে ছুটে গিয়ে সাইডবোর্ড থেকে রিংসুদ্ধ ন্যাপকিন নিয়ে আগুনে ফেলেছিলাম। লেয়ো পরে বলেছিল, ঐসব করতে পাঁচ মিনিট সময়ও লাগেনি, ব্যাপারটা কেউ বুঝে উঠবার আগেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল, আর আমারও সব ওর মধ্যে ফেলা সারা। একজন আমেরিকান অফিসারও এসে হাজির হয়েছিল, ভেবেছিল আমি বুঝি গোপন কাগজপত্রে আগুন দিয়েছি—যুদ্ধবাজ জার্মানদের গোপন দলিল। কিন্তু সে লোকটা আসবার আগেই সব শেষ। কালো কুৎসিত আর বিশ্রী গন্ধ। অফিসারটা যখন চিঠির বাণ্ডিলে হাত দিতে গেছে তখন আমি সেটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে টিনে যেটুকু পেট্রোল ছিল তাও ঢেলে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছি। পরে ফায়ার ব্রিগেডও এসে হাজির হয়েছিল, ওদের বিশাল বিশাল হোস পাইপ দেখে হাসি পাবার জোগাড়, পেছনদিকে কে যেন এক অদ্ভুত সরু গলায় আরও এক অদ্ভুত হুকুম জারি করেছিল, 'জল লাগাও'। এমন অদ্ভুত হুকুম আমি কখনও শুনিনি। ঐ কারণ এবং যাবতীয়ের

ওপরে পাইপ থেকে জল ছিটোতে ওদের একটুও লজ্জা হয়নি। একটা জানালার ফ্রেমে একটু আগুন লেগে গিয়েছিল বলে একজন একটা হোস পাইপ সেদিকে তাক করেছিল, ঘরের ভেতরে জুতো বন্যা বয়ে গিয়েছিল, পরে মেঝেটাও নষ্ট হয়েছিল। মেঝেটা নষ্ট হয়ে যাবার দুঃখে মা কান্না শুরু করেছিল, তারপর যাবতীয় ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে টেলিফোন করেছিল, ঐ ক্ষতি জলের জন্য, আগুনের জন্য, না বিষয়-ক্ষতি হিসেবে গণ্য হবে তা জানবার জন্য।

বোতল থেকে এক ঢোক গিললাম, বোতলটা আবার পকেটে পুরে হাঁটুটায় হাত বুলিয়ে দেখলাম। শুয়ে থাকলে ব্যথা কম হয়। মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করলে ফোলা আর ব্যথা কমত। একটা প্যাকিং বাক্স জোগাড় করে স্টেশনের সামনে বসতে পারতাম, সেখানে বসে গীটার বাজিয়ে লরেটান লিটানিগুলো গাইতে পারতাম। পাশের সিঁড়িতে টুপিটা রাখতাম যেন এমনিই পড়ে আছে, কারও মাথায় যদি আসে আর ওর মধ্যে কিছু ফেলে, তবে অন্যেরাও সাহস করে কিছু কিছু ফেলবে। আমার পয়সার দরকার। দরকার কারণ সিগারেট আর নেই বললেই চলে। সবচেয়ে ভাল হত টুপিটার মধ্যে একটা দশ ফেনি আর কয়েকটা পাঁচমার্ক রাখতে পারলে। লেরো নিশ্চয় ঐ সামান্যটুকু আনবে। স্টেশনের অন্ধকার কোণে নিজেকে বসে থাকতে দেখতে পাচ্ছি, মুখে সাদা রঙ, গায়ে নীল রঙের সোয়েটার, টুইডের কোট আর পরনে সবুজ ম্যাঞ্চেস্টার প্যান্ট, আর আমি রাস্তার গণ্ডগোলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গান গাইছি—অলৌকিক গোলাপ—আমাদের জন্য প্রার্থনা কর—রাজা ডেভিডের মিনার—আমাদের জন্য প্রার্থনা কর—প্রকৃত সতী—আমাদের জন্য প্রার্থনা কর—আমি ওখানে বসে থাকব, তারপর আসবে আমার কৃতঘ্ন স্ত্রী, সঙ্গে তার ক্যাথলিক স্বামী। বিয়ের উৎসবে নিশ্চয় অস্বস্তিকর ভাবনার উদয় হয়েছিল, ওতো আর কুমারী বা সতী ছিল না—কথাটা আমি জানি এবং তা নির্ভুলভাবে জানি। বিয়ের পোশাক ছাড়া বিয়ের কথায় সমারউইল্ডের যাবতীয় সৌন্দর্যবোধ নষ্ট হয়ে যেত। বসে বসে মাথার চুল ছিঁড়ত। নাকি পতিতা মেয়েদের আর ক্লাউনের ভূতপূর্ব রক্ষিতাদের জন্য ওদের বিশেষ একটা খ্রীস্টীয় ব্যবস্থা রয়েছে? যে বিশপ বিয়েটা দিয়েছিল, সে কি ভেবেছে? বিশপের চেয়ে ছোট কাউকে দিয়ে ওরা বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারে না। মারী একবার আমাকে এক বিশপের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছিল। আর তার টুপি নামানো, টুপি চাপানো,

সাদা ফিতে জড়ানো, সাদা ফিতে খুলে রাখা, বিশপের দন্ড ওখানে রাখা, বিশপের দন্ড এখানে আনা, লাল ফিতে জড়ানো, সাদা সরিয়ে রাখা, এই সমস্তই আমাকে অভিভূত করেছিল। বিদগ্ধ প্রকৃতির শিল্পী হবার জন্যে আমার সৌন্দর্যবোধ আর পুনরাবৃত্তির প্রতি একটা ইন্দ্রিয়গত আকর্ষণ আছে।

চাবির গোছা নিয়ে মুকাভিনয়ের কথাও ভাবছিলাম। কিছু প্লাস্টিসাইন জোগাড় করে একটা চাবি ঢুকিয়ে দিতাম। সেই ফাঁকের মধ্যে জল ঢেলে রেফ্রিজারেটারে রেখে কয়েকটা চাবি তৈরি করে নিতাম। একটা ছোটখাট সঙ্গে নিয়ে ঘোরবার মত ফ্রীজ নিশ্চয় পাওয়া যেত, পরদিনের শো এর-জন্য দরকারী চাবিগুলো এক রাতের মধ্যে ওতে তৈরি করে নেয়া যেত। বরফের ঐ চাবিগুলো শো দেখানোর সময় গলে পড়ে যেত। এই ব্যাপারটা ভেবে দেখলে হয়তো কিছু করা যেত, কিন্তু এই মুহূর্তে ও চিন্তা ত্যাগ করলাম। ওতে ঝামেলা অনেক, অনেক রকমের যন্ত্র-পাতির ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে, আর স্টেজের কর্মীদের মধ্যে কাউকে যদি কোনও রাইন এলাকার লোক যুদ্ধের সময় কোনও কারণে একবার ঠকিয়ে থেকে থাকে, তাহলে সে ফ্রীজের দরজাটা খুলে রেখে দেবে, আমারও শো দেখানো অসম্ভব হয়ে যাবে। অন্যটাই ভাল, জয়সল চেহারাটা নিয়ে—মুখে সাদা রঙ, স্টেশনের সিঁড়ির ওপর বসা, লরেটান লিটানি গাওয়া আর গীটারে দুচারটে ঝঙ্কার তোলা। চ্যাপলিনকে নকল করে ভাঁড়ামি করবার সময় যে টুপিটা মাথায় দিতাম সেটা থাকবে পাশে, লোক দেখানো পয়সাটারই আমার অভাব, একটা দশ ফেনিই যথেষ্ট হত, একটা দশ ফেনি আর একটা পাঁচ ফেনি হলে আরও ভাল হত, সবচেয়ে ভাল হত তিনটে—একটা দশ, একটা পাঁচ আর একটা দু ফেনি। লোকের জানা দরকার যে আমি ধর্মকর্ম করছি না, কাজেই অল্প-স্বল্প কিছু কিছু দিলে অসন্তুষ্ট হব না। ওদের আরও জানা দরকার যে, যে কোনও দান, তামার হলেও তা সাদরে গ্রহণ করা হবে। পরে ওর সঙ্গে একটা রুপোর মুদ্রা যোগ করব, এটা স্পষ্ট হতে হবে যে বড়-সড় দান কেবল অপ্রত্যাশিত নয়, সেরকম দানও লোকে করে। চাইকি ঐ টুপির মধ্যে একটা সিগারেটও রাখব, মানিব্যাগ বার করার চেয়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করা সহজ। কোনও এক সময় নিশ্চয় কেউ এসে হাজির হবে আইন-কানুন বজায় আছে কিনা, যাচাই করবার জন্য—রাস্তায় গান গাইবার লাইসেন্স আছে কিনা, কিম্বা

সেন্ট্রাল কমিটি থেকে কেউ আসবে ঈশ্বরকে বিব্রত করা প্রতিরোধ করবার জন্য আর আমার কাজকর্ম ধর্মীয় কারণে অন্যায় মনে করবে। আমার নিজের পরিচয় দেবার জন্য, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে সবসময় পাশে একটু করে জনাজানি কয়লা রেখে দেব। 'খনিজাদের সাহায্যে ঘর গরম রাখ' কথাটা একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। কালো খনিজার শব্দটা আমি লাল রঙের চক দিয়ে স্পষ্ট করে দাগ দিয়ে রাখব, হয়তো ঐ শব্দটার আগে 'এচ্' অক্ষরটা লিখে রাখব। তাতে সুবিধা বিশেষ নেই, তবে ভিজিটিং কার্ড হিসাবে আর ভুল হতে পারবে না—এই যে, আমি খনিজার। আর বাবা আমার জন্য একটা কাজ সত্যিই করতে পারত, তাতে কোনও খরচও নেই। আমার জন্য রাস্তায় গান গাইবার একটা লাইসেন্স জোগাড় করে দিতে পারেন। মেয়রকে একটা টেলিফোন করে দিলেই হত, কিম্বা তাস খেলতে খেলতে তাকে সেকথা বলে দিতে পারে। আমার জন্য বাবার একটু করা উচিত। তাহলে আমি স্টেশনের সিঁড়িতে বসে রোমের গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে পারতাম। মারী যদি আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমাকে জড়িয়ে না ধরে যেতে পারে, তাহলেও তো আত্মহত্যার পথ খোলাই থাকবে। সেটা পরে। আত্মহত্যার কথা ভাবতে আমার আপত্তি। একটাই কারণ, তাতে দম্ভ প্রকাশ পাবার আশঙ্কা, আমি মারীকে রেহাই দিতে চেয়েছি। ওর তো আবার ৎস্যুফ্‌নারের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হতে পারে, তাহলে আমরা আদর্শ যেসোহ্বেৎস্ অবস্থায় পৌঁছুবো, ও আমার রক্ষিতা হয়ে থাকতে পারবে, কারণ গীর্জার তরফ থেকে ওর সঙ্গে ৎস্যুফনারের বিবাহ-বিচ্ছেদ আর হতে পারবে না। তারপর টেলিভিশন কোম্পানীর থেকে আমাকে আবিষ্কার করার অপেক্ষা শুধু, নতুন খ্যাতি। আর তখন ওই গীর্জা তার সবকটা চোখ বন্ধ করে বসে থাকবে। আমাকে তো আর মারীকে বিয়ে করতে বলতে পারবে না, গীর্জায় গিয়ে বিয়ে অসম্ভব, কাজেই অষ্টম হেনরীর দিকে তাক করা কামানের গোলাটা আমার দিকে ছোঁড়বার দরকার হবে না ওদের।

আমার একটু ভালই লাগছে। হাঁটু ফোলাটা কমে গেছে, ব্যথাও কমের দিকে। মাথাধরা আর বিষাদ রয়ে গেছে, তবে ওদুটো তো আমার কাছে মৃত্যুর মতই বিশ্বস্ত। একজন সৎ-পাদ্রীর কাছে যেমন সবসময় দৈনন্দিন প্রার্থনার বইটা থাকে, একজন শিল্পীর সাথে তেমনি থাকে মৃত্যু। আমার মৃত্যুর পর কি হবে তাও আমি বলতে গেলে ভালভাবেই জানি—

শরীরের কবর আমিও পাব। আমার মা কাঁদবে আর বলবে, একমাত্র মা-ই নাকি আমাকে ঠিক বুঝতে পেরেছিল। আমার মৃত্যুর পর সবাইকে বলবে, 'আমাদের হান্স আসলে কেমন ছিল' আজকের এই দিনটা অবধি। আর হয়তো অনন্তকাল অবধি মায়ের বদ্ধমূল ধারণা, আমি 'কামুক' আর 'অর্থলোভী'। মা বলবে, 'হ্যাঁ, আমাদের হান্সের প্রতিভা ছিল, তবে দুঃখের কথা, বড্ড কামুক আর অর্থলোভী—আরও দুঃখের কথা সম্পূর্ণভাবে উচ্ছৃঙ্খল—এমনিতে প্রতিভাবান, প্রতিভাবান।' সমরহুইন্ড বলবে, 'আমাদের এই চমৎকার শরীরের, চমৎকার, চমৎকার—দুঃখের কথা ওর গীর্জা সংক্রান্ত অসন্তোষ কিছুতেই ঘোচানো যায়নি আর মেটা-ফিজিক্স ব্যাপারটা ওর মাথায় ঢুকত না। রোথার্ট দুঃখ করবে, সে অর মৃত্যুদণ্ড সময়মত চালু করতে পারেনি বলে আমাকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দিতে পারল না। ফ্রেডেবয়েলের কাছে আমি 'এক বিবেকহীন চরিত্র, যে কোন রকম সামাজিক দায়-দায়িত্বের ধার ধারত না। কিংকেল কাঁদবে, পরিষ্কার আর চেঁচিয়ে, ও সম্পূর্ণভাবে বিচলিত হবে, তবে বড্ড দেরীতে। মনিকা সিলভেস গুমরে গুমরে কাঁদবে, যেন ও আমার বিধবা আর আফসোস করবে, কেন বলামাত্র আমার বাসায় এসে ওমলেট বানিয়ে দেয়নি। মারী একদম বিশ্বাস করবে না যে আমি মরে গেছি—ও ৎস্যুফনারকে ছেড়ে যাবে, হোটেলে হোটেলে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে আমার কথা, বৃথাই।

আমার বাবা এই দুঃসংবাদে খুবই অস্বস্তিতে পড়বে, কষ্টও পাবে এই ভেবে—এখান থেকে যাবার সময় লুকিয়ে অন্তত কিছু মালকড়ি ও তার কোট-টুপি রাখবার জায়গায় রেখে যায়নি বলে। কার্ল আর সাবিনে কাঁদবে লুকোবার কোনও চেষ্টা না করে, এমন কাঁদবে যে কবরখানায় যারা আসবে তাদের সকলের কাছে ব্যাপারটা বিসদৃশ মনে হবে। সবার চোখ এড়িয়ে সাবিনে কার্লের ওভারকোটের পকেটে হাত চালাবে, ও আবারও রুমাল আনতে ভুলে গেছে। এডগার তার চোখের জল চেপে রাখাটা দায়িত্ব বলে মনে করবে আর কবর দেয়া শেষ হয়ে গেলে হয়তো আর একবার আমাদের বাগানে যাবে। সেই একশো মিটার দৌড়ে আসবে, একা ফিরে আসবে কবরখানায় আর হেনরিয়েটের কবরের ফলকের সামনে মস্ত একটা গোলাপের তোড়া রাখবে। আমি ছাড়া আর কেউই জানত না যে ও হেনরিয়েটেকে ভালবাসত, কেউ জানত না, যে চিঠির বাণ্ডিলগুলো আমি পুড়িয়ে ফেলেছিলাম তার

প্রত্যেকটা চিঠির পেছনে ই. ডাব্লিউ. লেখা ছিল। আরও একটা গোপন কথা নিয়ে আমি কবরে যাব। মাকে একবার দেখেছিলাম, চুপচাপ করে নিচেসেলারে গিয়ে—যেখানে মায়ের ভাঁড়ার ছিল সেখান থেকে—বেশ খানিকটা হ্যাম কেটে নিয়ে খেয়েছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, হাতে করে, তাড়াহুড়ো করে। দেখতে কিন্তু আদৌ খারাপ লাগেনি, শুধু অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। হতাশা নয়, আমার হয়েছিল করুণা। আমি সেলারে গিয়েছিলাম পুরোনো টেনিস বল খুঁজতে, ওটা আমাদের বারণ ছিল। পায়ের শব্দ শুনেই আমি আলো নিভিয়ে দিয়েছিলাম। দেখলাম, মা আপেল সস-এর বয়ামটা নিল তাকের ওপর থেকে, সেটা আবার রাখল। হ্যাম কাটবার সময়ে কনুই নাড়াটা কেবল দেখেছি, তারপর মা সেই হ্যামটা জড়িয়ে মুখের মধ্যে পুরে দিল। ওকথা আমি কাউকে বলিনি, কখনও বলবও না। শ্রীয়ার-কবরের শ্বেতপাথরের নিচে আমার এই গোপন কথা চাপা থাকবে। আমি নিজে যেমন, অদ্ভুত ভাল লাগে আমার তাদের—মানুষদের।

আমার মত অবস্থায় কেউ মারা গেলে আমার খুব কষ্ট হয়। এমনকি আমার মায়ের কবরের সামনেও আমি কাঁদব। বুড়ো ডেরারকুমের কবরের সময়ে আমার সব সংযম হারিয়ে ফেলেছিলাম। কাঠের সেই কফিনের ওপর আমি বারবার শুধু মাটি ফেলছিলাম আর শুনতে পাচ্ছিলাম পেছনে চাপা গলায় কথা হচ্ছিল। ওর নাকি মনেই পড়ে না—আমি কিন্তু বেলচা চালিয়েই যাচ্ছিলাম, তারপর মারী একসময় এসে আমার হাত থেকে ওটা নিয়ে নেয়। আমি আর ঐ দোকানটার দিকে, বাড়িটার দিকে তাকাতে পারিনি, লোকটার স্মৃতিও রাখতে চাইনি। কিছু না। মারীর মাথা ঠাণ্ডা ছিল, দোকানটা বিক্রি করে দিয়ে সেই টাকা সরিয়ে রেখেছিল 'আমাদের বাচ্চাদের জন্য'।

গীটারটা আনতে কামরায় যেতে আমাকে আর খোঁড়াতেও হল না। ওটার ঢাকনার বোতামগুলো খুলে নিয়ে এসে বসবার ঘরে দুটো সোফা সামনা সামনি রাখলাম ঠেলেঠুলে, টেলিফোনটা নিজের কাছে এনে রাখলাম, তারপর আবার শুয়ে গীটারের সুর বাঁধতে শুরু করলাম। সামান্য ক'টা সুর ভাল লাগল। গান গাইতে শুরু করতেই একরকম ভালই লাগল নিজের—প্রিয় মা আমার, বিস্ময়কারিণী মা আমার,—সেই 'আমাদের জন্য ঈশ্বরের দয়া ভিক্ষা কর' কথাটা আমি গীটারে বাজালাম। ব্যাপারটা আমার বেশ লাগল। হাতে গীটার, পাশে টুপিটা, আমার প্রকৃত চেহারা নিয়ে আমি রোমের ট্রেনের অপেক্ষায়

থাকব। 'শুভ উপদেশের জননী'। সেবার যখন এডগার হ্বীনেকেনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসেছিলাম, তখন মারী তো আমাকে বলেছিল, আমরা কখনও, কোনদিন পরস্পরকে ছেড়ে যাব না—'যতদিন না মৃত্যু আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়!' আমি এখনও মরিনি। ফ্রাউ হ্বীনেকেন বলত সবসময়, 'যে গান গায়, সে বেঁচে আছে', আর বলত, 'যার খেতে ভাল লাগে, তার ক্ষতি হয় না!' আমি গান করছি। আমার পেটে খিদে। মারী কোথাও স্থিরভাবে বসবাস করবে, একথা আমি ভাবতেই পারি না। আমরা শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়িয়েছি, এক হোটেল ছেড়ে অন্য হোটেলে উঠেছি, আর যদি কখনও কোথাও আমরা দু'চারদিন রয়ে গেছি, তো মারী বলত, 'খোলা স্যুটকেসগুলো তাকিয়ে আছে আমার দিকে হাঁ করে, ওদের মুখ কিছু চাইছে, বোঝাই করবার জন্য।' আমরা তখন সেই স্যুটকেসের মুখগুলো বোঝাই করতাম। আর যদি আমাকে কোথাও দু-চার সপ্তাহ থাকতে হত, তাহলে ও শহরের মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়াত যেন প্রত্নতাত্ত্বিকদের আবিষ্কার করা শহর সেটা। সিনেমা, গীর্জা, হাল্কা ধরনের কাগজ, লুডো খেলা। ও কি সত্যিই সেই গুরুগম্ভীর উৎসবে উপস্থিত থাকতে চেয়েছিল, যখন ৎস্যুফনারকে সেই বিশেষ সম্মান দেয়া হল, চারপাশে কনসলার আর প্রেসিডেণ্ট, বাড়ি এসে সেই ব্যাজটা নিজে হাতে ইস্ত্রি করেছিল? রুচির ব্যাপার, কিন্তু মারী তোমার রুচির মত নয়। একজন অবিশ্বাসী ক্লাউনের ওপর আস্থা রাখা বরং ভাল। সে তোমাকে সময় মত জাগিয়ে দেবে, যাতে তুমি সময় মত গীর্জায় পেঁছতে পার। দরকার হলে সে তোমাকে গীর্জায় যাবার ট্যাক্সি ভাড়া দেবে। আমার নীল পুলওভার তোমাকে কোনদিনই ধুতে হবে না।

২৪

টেলিফোনটা যখন বেজে উঠল তখন আমি বেশ কিছুটা সময় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। আমি সম্পূর্ণভাবে সচেতন হয়ে ছিলাম যাতে দরজার ঘণ্টাটা কোনও মতেই কান এড়িয়ে না যায়। লেয়োকে দরজা খুলে দিতে হবে তো। গীটারটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, ওটা বাজছে, রিসিভারটা তুলে বললাম, 'হ্যালো'।

'হান্স?' লেয়ো বলল।

'হ্যাঁ,' বললাম, 'ভালই হল, তুই আসছিস।' ও চুপ করে গেল, একটু কাশল, আমি ওর গলা তৎক্ষণাৎ চিনতে পারিনি। ও বলল, 'তোর জন্য ঐ টাকাটা আমার আছে।' ঐটা-শব্দটা অদ্ভুত শোনাল। টাকা পয়সা সম্বন্ধে লেয়োর ধারণাগুলো সব অস্বাভাবিক ধরনের। ওর বলতে গেলে কোনও রকম চাহিদা নেই। সিগারেট খায় না, মদ খায় না, সন্ধ্যার কাগজ পড়ে না। সিনেমায় যায়, তাও যদি ও নিজের খুব বিশ্বাস আছে এরকম অন্তত পাঁচজন লোক বলে যে ছবিটা দেখবার মত। তা-ও ঘটে দু-তিন বছর অন্তর। ট্রামে চাপার চেয়ে ও বরং হেঁটে যেতে পছন্দ করে। ও যখন টাকাটা, ঐটা-শব্দ সমেত, উচ্চারণ করল, সেই মুহূর্তে আমার সব উৎসাহ নিভে গেল। ও যদি বলত 'কিছু টাকা' তাহলে বুঝতাম ওর কাছে দুই থেকে তিন মার্ক রয়েছে। আমি আতঙ্কে ঢোক গিলে চিৎকার করে উঠলাম, 'কতটা?'—'ওই', বলল, 'ছয় মার্ক সত্তর ফেনি।' ওটা ওর কাছে অনেক। আমার তো ধারণা, ওই দিয়ে, লোকে যাকে নিজস্ব খরচ খরচা বলে, ওর বছর দুয়েক চলে যাবে—কখনও কখনও একটা প্ল্যাটফরম টিকিট, এক প্যাকেট পিপারমেন্ট, ভিখিরীকে দেবার জন্য এক আধটা দশ ফেনি; ওর তো একটা দেশলাইও লাগে না। ওর 'ওপরওয়ালাদের' সিগারেট ধরিয়ে দেবার জন্য, ওসব মাঝে মধ্যে করতে হয়। যদি কখনও একটা দেশলাই কেনে, তবে তাতে ওর বছরখানেক চলে যায়, আর ঐ এক বছর ধরে সবসময় সঙ্গে করে ঘুরলেও কিন্তু দেশলাইটা দেখতে একদম নতুন থাকে। ওকে অবশ্যই মাঝে মধ্যে নাপিতের কাছে যেতে হয়, তবে সে খরচা ও নেয় ব্যাঙ্ক থেকে। বাবা

ওর লেখাপড়ার খাতে কিছু ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছে। আগে ও মাঝে মধ্যে কনসার্ট শুনতে যাবার জন্য টিকিট খরচা করত, তবে প্রায়ই মায়ের কাছ থেকে কমপ্লিমেণ্টারী টিকিট পেত। গরীবদের চেয়ে তো বড়লোকরা অনেক বেশি জিনিস অমনি পায়, আর বড়লোকরা যা কিনতে বাধ্য হয়, বেশির ভাগ সময়েই ওরা সেসব একটু সস্তায় পায়। পাইকারী ব্যবসায়ীদের একটা পুরো ক্যাটালগ ছিল মায়ের কাছে—মা পোস্ট-অফিসে টিকিটও কম দামে পায় বললে আমি বিশ্বাস করব। ছয় মার্ক সত্তর—লেয়োর কাছে ওটা অনেক। আমার কাছেও, এই মুহূর্তে উপার্জনহীন অবস্থায়।

বললাম, 'বেশ, লেয়ো, ভাইই—আমার জন্য আসবার সময় এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসিস, কেমন?' কোনও উত্তর শুনলাম না, ও একটু কাশল, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই শুনতে পেয়েছিস তো? নাকি?' ওর বোধহয় কষ্ট হচ্ছিল, ওর ঐ টাকা থেকে আগেই সিগারেট আনতে বলেছি বলে। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বলল, 'মানে...' ও তোতলাতে শুরু করল। বলার ধরনটা বাধো বাধো। 'তোকে বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে, আমি—আমি আসতে পারছি না।' 'কি বললি,' চেঁচিয়ে উঠলাম, 'তুই আসতে পারবি না?'

'এখন তো পোনে নটা হয়ে গেছে', বলল, 'আমাকে নটার মধ্যে এখানে ফিরে আসতে হবে।'

'আর যদি তোর পৌঁছুতে দেরী হয়,' বললাম, 'তাহলে কি তোকে তাড়িয়ে দেবে গীর্জা থেকে?'

'আঃ, ওসব কথা রাখ,' ও বলল দুঃখিতভাবে।

'তুই কি ছুটি বা ওই জাতীয় কিছু নিতে পারিস না?'

'এখন আর সম্ভব না,' বলল, 'তাহলে তা দুপুরে বেলা বলতে হত।'

'আর যদি এমনিই দেরীতে ফিরিস?'

'তাহলে একটা ছেড়ে দেবার নোটিশ আসতে পারে!' বলল চাপা গলায়।

'ছেড়ে দেবার' বলবার জন্য যে শব্দটা তুই বললি, সেটা তো ল্যাটিন। আমার যতটা ল্যাটিন মনে আছে তাতে মনে হয় ওটা 'বাগান' জাতীয় একটা কিছু, তাই না?'

ও একটু হাসল। 'বরং বাগান ছাঁটবার বড় কাঁচি,' বলল, 'ব্যাপারটা বেশ অস্বস্তিকর।'

'বেশ, ঠিক আছে,' বললাম, 'ঐ অস্বস্তিকর অবস্থায় তোকে পড়তে বাধ্য

করতে পারি না। কিন্তু লেয়ো, আমার যে একজন সঙ্গী পেলে ভাল হত।'

'ব্যাপারটা বেশ ঝামেলার', বলল, 'তুই আমাকে বিশ্বাস কর। ঐ একটা নোটিশের ঝুঁকি নিতে পারি আমি। কিন্তু এই সপ্তাহেই আবার ওরকম হলে, খবরটা কাগজে উঠবে, তখন আমাকে সমস্ত খুঁটিনাটি বুঝিয়ে ব্যাখ্যা করার দায় নিতে হবে।'

'কার কাছে ?' বললাম, 'একটু ধীরে সুস্থে বল তো দেখি।' ও নিঃশ্বাস ফেলল, নাকে একটা শব্দ করে বলল, 'বিচারসভার কাছে,' বলল খুব আস্তে আস্তে।

'যাঃ ব্বাবা, লেয়ো,' বললাম, 'শুনে মনে হচ্ছে পোকামাকড়দের কাটা ছেঁড়া করা হয়। আর ঐ কাগজে উঠবে—শুনে আমার মনে পড়ছে আমার কথা। তখনও সব তৎক্ষণাৎ কাগজে উঠত, দাগী আসামীদের বেলায় যেমন হয়।'

'হায় ঈশ্বর, হান্স,' ও বলল, 'এই সামান্য সময়টুকুতে কি আমরা এখানকার বিধিব্যবস্থা নিয়েই তর্ক করব ?'

'তোর যদি তাতে অস্বস্তি হয়, তবে থাক। কিন্তু একটা উপায় নিশ্চয় আছে—মানে অন্য কোনও উপায়, পাঁচিল টপকে ঢোকা বা ঐ রকম একটা কিছু। মানে সব কঠোর ব্যবস্থাতেই তো ফাঁক থাকে।'

'হ্যাঁ,' বলল, 'তা আছে, মিলিটারীতে যেমন, কিন্তু ওসব আমার পছন্দ নয়। আমি সোজা পথে চলতে চাই।'

'তুই কি আমার জন্য তোর ঐ পছন্দ একটু তফাতে রেখে একটিবার পাঁচিল টপকাতে পারিস না ?'

ও নিঃশ্বাস ফেলল, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম ও মাথা নাড়ছিল।

'কাল হলে হয় না ? মানে আমি নাহয় ক্লাসে না গিয়ে নটা নাগাদ তোর ওখানে আসতাম। ব্যাপারটা কি এতই জরুরী ? নাকি তুই আজই আবার কোথাও চলে যাচ্ছিস ?'

'না,' বললাম, 'আমি এখন কিছুদিন বন্-এ থাকব। আমাকে অন্তত হাইনরিষ বেলেন-এর ঠিকানাটা দে, ওকে ফোন করে দেখি, হয়ত ও চলে আসবে, কোলন থেকে কিম্বা যেখানেই থাক। আমি আসলে আহত, হাঁটুতে চোট লেগেছে, পকেট খালি, হাতেও কাজ নেই—আর মারীও নেই। তবে হ্যাঁ, আহত, পকেট খালি, হাতে কাজ নেই আর মারী নেই—এসবই কালও

থাকবে আমার বেলায়—কাজেই ব্যাপারটা জরুরী নয়। কিন্তু হাইনরিষ বোধ হয় এতদিনে প্যাস্টর হয়েছে, ওর একটা মোটরবাইক আছে, কিম্বা যাহোক একটা কিছু। শুনছিস্ ?'

'হ্যাঁ,' বলল নিরাসক্তভাবে।

'তাহলে' বললাম, 'ওর ঠিকানাটা দে, ওর ফোন নম্বর।'

ও চুপ করে রইল। ওর নিঃশ্বাসও আর শোনা যাচ্ছে না, ফুরিয়ে গেছে। কেউ যদি একশো বছর ধরে কনফেশন টুলে বসে মানবজাতির পাপ আর নিবুদ্ধিতার কথা ভেবে নিঃশ্বাস ফেলে, তার যেমন সব নিঃশ্বাস ফুরিয়ে যাবে, লেয়োর অবস্থাও যেন তেমনি।

'আচ্ছা,' বলল অবশেষে, বোঝা গেল একটা কিছু সামলে নিয়েছে ইতিমধ্যে, 'তাহলে তুই জানিস না ?'

'কি জানিনা আমি,' চিৎকার করে উঠলাম, 'হায় ভগবান, লেয়ো একটু স্পষ্ট করে বলবি তো।'

'হাইনরিষ আর পাদ্রী নেই,' বলল আস্তে করে।

'আমার ধারণা ছিল, যতদিন নিঃশ্বাস পড়বে ততদিন লোকে পাদ্রী থাকে।'

'তা থাকে,' বলল, 'আমি বলছি, ওর সঙ্গে গীর্জার কোন সম্পর্ক নেই। ও চলে গেছে, বেশ কয়েক মাস হল উধাও, কোনও পাত্তা নেই।'

সব কথাগুলো ও অনেক কষ্টে লেবু চিপে রস বার করবার মত বলল।

'ওঃ,' বললাম, 'ঠিক আবার এসে হাজির হবে,' তারপর আমার একটা কথা মনে পড়ল, জিজ্ঞেস করলাম, 'একা গেছে ?'

'না,' লেয়ো বলল কড়া গলায়, 'একটা মেয়ের সঙ্গে।' ওর কথা শুনে মনে হল, যেন বলল, 'ওর প্লেগ হয়েছে।'

মেয়েটার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে। ও নিশ্চয় ক্যাথলিক ছিল, আর এখন একজন ভূতপূর্ব পাদ্রীর সাথে কোথাও একটা কামরায় বসে 'রক্তমাংসের আকর্ষণের' পুঙ্খানুপুঙ্খতা সহ্য করছে, ঘরময় নোংরা জামা কাপড় ছড়ানো, আণ্ডারওয়্যার, গেঞ্জী, বেল্ট, চায়ের পিরিচে সিগারেটের শেষ অংশ, সিনেমার টিকিটের বাকি আধখানা আর আর্থিক অনটনের শুরু, মেয়েটার পক্ষে যথেষ্ট কষ্টদায়ক। তারপর মেয়েটা যখন নিচে যাবে, রুটি, সিগারেট বা এক বোতল ওয়াইন আনতে, খিটখিটে বাড়িওয়ালী দরজা খুলবে, মেয়েটা কিন্তু তখন

বলতে পারবে না, 'আমার স্বামী একজন শিল্পী, হ্যাঁ, ও শিল্পী।' ওদের দুজনের জন্যই আমার কষ্ট হচ্ছে, হাইনরিখের চেয়ে মেয়েটার জন্যই বেশি। গীর্জার ঐসব লোকগুলো এসব ব্যাপারে নির্দয়, যদি লোকটা তেমন সুনজরে না থাকে, আর যদি তা একজন একটু অসুবিধাজনক প্রকৃতির হয় তবে তো কথাই নেই। কিন্তু সমারহুইল্ড-এর মত কেউ যদি এমন কাণ্ড করে বসে, ওরা হয়ত সবাই চোখ বুজে বসে থাকবে। সমারহুইল্ড-এর তো আর হলদে রঙের পা-ওয়ালা ঝি ছিল না, বরং ছিল একটা সুন্দরী, ডব্‌কা মেয়ে, ম্যাড-ডালেনা বলে ডাকত তাকে, খুব ভাল রাঁধুনী, সব সময় ছিমছাম আর হাসিখুশি।

'বেশ, ভালই,' বললাম, 'তাহলে আপাতত ওকে আমার দরকার নেই।'

'হায় ঈশ্বর,' লেয়ো বলল, 'এমন একটা ঘটনা, আর তা তোর কাছে যেন কিছুই না।'

'আমি হাইনরিখের বিশপ নই বা ও ব্যাপারে আমার তেমন কোন উৎসাহও নেই,' বললাম, 'আমার দুশ্চিন্তা হয় কেবল ঘটনার খুঁটিনাটি ভেবে। তোর কাছে অন্তত এডগারের ঠিকানা বা ফোন নম্বর আছে?'

'হুবীনেকেন-এর কথা বলছিস?'

'হ্যাঁ,' বললাম, 'তোর নিশ্চয় মনে আছে এডগারের কথা? কোলন-এ তো আমাদের হোটেলে তোদের আলাপ হয়েছিল, আর আমাদের বাড়িতে তো আমরা সবসময় হুবীনেকেনদের সঙ্গে খেলতাম আর আলুর স্যালাড খেতাম।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়,' বলল, 'নিশ্চয় মনে আছে, কিন্তু আমি যতদূর জানি হুবীনেকেন এদেশে নেই। কে যেন বলেছিল, কি একটা কমিশনের সাথে ও গেছে গবেষণার কাজে, ভারতবর্ষ না থাইল্যাণ্ড কোথায় যেন, ঠিক বলতে পারব না।'

'তুই ঠিক জানিস?' জিজ্ঞেস করলাম।

'নিশ্চয়,' বলল, 'হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে, হ্যারিব্যার্ট বলেছে।'

'কে?' চিৎকার করে উঠলাম, 'কে বলেছে তোকে?'

ও চুপ করে থাকল, ওর নিঃশ্বাসের শব্দও আমি আর শুনতে পেলাম না, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, ও কেন আমার এখানে আসতে চায় না। 'কে?' আমি আবারও চিৎকার করলাম, কিন্তু ও কোনও উত্তর দিল না। ঐ

কনফেশন টুলে বসে হাল্কা কাশিটাও ও অভ্যাস করে ফেলেছে। মারীর জন্য অপেক্ষা করবার সময় আমি অমন কাশি অনেকবার শুনেছি। 'তোর কাল এসেও কাজ নেই,' বললাম আস্তে করে, 'সেই ভাল, মিছিমিছি ক্লাস কামাই করার দরকার নেই। শুধু আর একটা কথা বল আমাকে যে, তোর সঙ্গে মারীর দেখাও হয়েছে।'

মনে হল ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা আর হাল্কা কাশি ছাড়া আর কিছু শেখেনি। এবার ও আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, গভীর, বিষণ্ণ—অনেক সময় ধরে। 'থাক, তোকে উত্তর দিতে হবে না,' বললাম, 'ঐ চমৎকার লোকটাকে আমার নমস্কার জানাস্। তোদের ওখানে আজ দুবার ফোন করে তার সঙ্গে গল্প করেছি।'

'স্টুডার?' আস্তে করে জিজ্ঞেস করল।

'কি নাম জানি না, তবে ফোনে লোকটাকে খুব ভাল মনে হয়েছিল।'

'কিন্তু ও লোকটাকে কেউই বিশেষ পাত্তা দেয় না,' বলল, 'ওতো—ওকে তো বলতে গেলে দয়া করে খেতে দেয়া হয়।' লেয়ো সত্যি সত্যিই হাসির মত একটা শব্দ বার করতে পারল, 'ও কেবল মাঝে মধ্যে টেলিফোনের আশপাশে ঘোরাফেরা করে আর আবোল তাবোল কথা বলে।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম, পর্দার একটা ফাঁক দিয়ে বাইরের ঘড়িটা দেখলাম। নটা বাজতে তিন মিনিট বাকি। 'এবার তোকে যেতে হবে,' বললাম, 'নইলে আবার কাগজে উঠবে। আর আমার জন্য কাল তোর ক্লাস কামাই করিস না।'

'কিন্তু, আমার অবস্থাটা বুঝবি তো,' বোঝাতে চাইল।

'খুব্তোর,' বললাম, 'বুঝতে পেরেছি। খুব ভাল বুঝেছি।'

'তুই কি বল তো?' ও জিজ্ঞেস করল।

'আমি একটা ক্লাউন,' বললাম, 'আর, আমি খুঁটিনাটিগুলো জড়ো করে রাখি। রাখছি।' ফোনটা রেখে দিলাম।

২৫

ভুলে গিয়েছিলাম ওর মিলিটারী জীবনের অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞেস করতে, কিন্তু বোধহয় কখনও আবার সেই সুযোগের সৃষ্টি হবে। ও নিশ্চয় 'খাওয়া-দাওয়ার' প্রশংসা করত—বাড়িতে কখনও ও অত ভাল খাদ্য পায়নি—, খাটুনিকে 'শিক্ষণীয় এক বিশেষ মূল্যবান' ব্যবস্থা আর সাধারণ মানুষের সাথে মিশবার সুযোগকে 'সাংঘাতিক রকম শিক্ষাসমৃদ্ধ' বলে মনে করত। ওকে ওকথা জিজ্ঞেস না করাই ভাল। আজ রাতে ও ওর বিছানায় শুয়ে একবারও চোখ বুজতে পারবে না। বিবেকের দংশনে এপাশ ওপাশ করবে আর নিজেকেই প্রশ্ন করবে, আমার এখানে না আসাটা ঠিক হল কিনা। ওকে আমার কত কথাই বলবার ছিল—ওর পক্ষে দক্ষিণ আমেরিকা বা মস্কো, পৃথিবীর অন্য যে কোন জায়গায়, এই বন্ শহর ছাড়া, থিয়োলজি পড়তে গেলে ভাল হত। ও নিশ্চয় বিশ্বাস করতে বাধ্য হত যে, ওর কাছে যা ধর্মবিশ্বাস, তার জায়গা সমারফীল্ড আর ব্রোথার্ট-এর মধ্যে নয়, বন্ শহরেও নয়। শ্নীয়ার পরিবারের ছেলে হয়েও, যার যাবতীয় সম্ভাবনা ছিল, বলতে গেলে ও-ই ছিল প্রকৃত লোক যে শেয়ার বাজার হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে পারত। তবুও ও ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নিল, পাদ্রী হল। এই সব ব্যাপারে ওর সঙ্গে আমাকে একবার কথা বলতেই হবে, সবচেয়ে ভাল হয়, আমাদের বাড়ির সেই 'বিশেষ উৎসবের' দিন। আমরা দুই বিপ্লবী ছেলে গিয়ে বসব আন্নার রান্নাঘরে, কফি খাব, পুরোনো দিনের স্মৃতি চর্বণ করব, সেই গৌরবময় সময়ের কথা, যখন আমাদের বাগানে গ্রেনেড্ নিয়ে মহড়া দেয়া হত আর মিলিটারী গাড়িগুলো আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াত, যখন আমাদের বাড়িতে মিলিটারীর লোকদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এক অফিসার—মেজর বা ঐরকম কি একজন—সঙ্গে সিপাই বরকন্দাজ, একটা গাড়ি, তাতে ব্যানার লাগানো ছিল ; এরা সবাই কিছুকাল ছিল। ওদের সকলেরই মাথায় কিন্তু

ডিমের পোচ, ব্র্যান্ডি, সিগারেট আর আমাদের বাড়ির কাজের মেয়েদের সাথে ফালতু মস্করা করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মাঝে মধ্যে ওরা দায়িত্বসচেতন হয়ে উঠত, অর্থাৎ গুরুগম্ভীর ভাব দেখাত। তখন ওরা আমাদের বাড়ির সামনে লাইন বেঁধে দাঁড়াত, অফিসারটি খুব হম্বিতম্বি করত; চাই কি হাত দুটোও কোটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিত, মনে হত যেন যাত্রাদলের অভিনেতা সর্বশক্তি-মানের পার্ট করছে. আর 'সম্পূর্ণ বিজয়ের' কথা চিৎকার করে বলত। বেদনা-দায়ক, হাস্যাস্পদ, অর্থহীন। তারপর যখন প্রকাশ পেল, ফ্রাউ হ্বীনেকেন আরও কয়েকজন মহিলার সাথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল, জার্মান আর আমেরিকান সীমানা পার হয়ে গিয়ে তার ভাই-এর কাছ থেকে রুটি আনতে—ফ্রাউ হ্বীনেকেনের ভাই-এর রুটির কারখানা ছিল—তখন ওদের সেই দায়িত্ব-সচেতন ভাব মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। অফিসারটা ফ্রাউ হ্বীনেকেন, আর অন্য দুজন মহিলাকে গুপ্তচরবৃত্তি এবং অন্তর্ঘাতী কাজের দায়ে গুলি করে মারবার হুকুম দিয়েছিল। (জবানবন্দী দেবার সময় ফ্রাউ হ্বীনেকেন একবার স্বীকার করেছিল যে ওপারে এক আমেরিকান সৈন্যের সাথে কথা বলেছিল)। কিন্তু তখন আমার বাবা—তার জীবনে দ্বিতীয় বার, আমার যতদূর মনে পড়ে—তৎপর হয়ে উঠেছিল, আমাদের বাড়ির ইস্তিরি করবার ঘরটাকে অস্থায়ী জেলখানা বানানো হয়েছিল। বাবা নিজে গিয়ে সেই মহিলাদের সেখান থেকে বার করে এনে তাদের নিয়ে গিয়ে নদীর ধারে ভাঙা নৌকোর জঞ্জালের মধ্যে লুকিয়ে রেখে এসেছিল। বাবা সত্যিই সাহসের পরিচয় দিয়েছিল, অফিসারটাকে গালিগালাজ করেছিল, ও লোকটাও উল্টে গালিগালাজ করেছিল বাবাকে। সবচেয়ে হাসি পাচ্ছিল সেই অফিসারটার মেডেলগুলো দেখে। ওগুলো ওর বুকে লাগানো ছিল, ওর উত্তেজনার ঠেলায় সেগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল, ওদিকে আমার মা তার সেই হাল্কা গলায় বলে চলেছিল, 'আঃ কি হচ্ছে, এসব কি, সবকিছুরই তো একটা সীমা আছে।' আমার মায়ের কাছে যেটা সবচেয়ে কষ্টকর মনে হচ্ছিল, সেটা হচ্ছে যে, দুজন 'ভদ্রলোক ঝগড়া করছে, চিৎকার করে'। আমার বাবা বলেছিল, 'এই মহিলাদের কোনও অনিষ্ট করবার আগে আমাকে গুলি করে মারতে হবে—এই যে' বলে বাবা সত্যি সত্যিই কোটের বোতাম খুলে অফিসারটার দিকে বুক. ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন কিন্তু ঐ সৈন্যরা পিছু হটতে শুরু করেছে, কারণ আমেরিকানরা তখন রাইন হোয়ে অবধি এসে গেছে, মেয়েরাও তখন আবার ভাঙা নৌকোর জঞ্জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারল।

সেই মেজরটির, নাকি কি ছিল লোকটা, ব্যাপার স্যাপারের মধ্যে সবচেয়ে করুণ লাগছিল তার ঐ মেডেলগুলো। ওগুলো সর্বাঙ্গে না ঝুলিয়ে রাখলে বোধহয় লোকটাকে দেখে সম্ভ্রম জাগত। মায়ের 'বিশেষ উৎসবের' দিনে যখনই আমি বেচারী বুর্জোয়াদের দেখি, বুকে মেডেল লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার মনে পড়ে এই অফিসারটার কথা। বলতে কি, সমারহুবীল্ডের মেডেল ঝোলানোটা বরং আমার 'সহ্য করা যায়' বলে মনে হয়—'গীর্জার আনুকূল্যে' কিম্বা অন্য কিছু। আর যাই হোক সমারহুবীল্ড তার গীর্জার জন্য সব সময়ই কিছু করে, (তার 'শিল্পীদের' হাওয়া করে দেয়, আর রুচিবোধটা অন্তত আছে যে. মেডেল-টেডেলকে 'আসলে' করুণ মনে করে।) কেবলমাত্র মিছিলে যাবার সময় বা গীর্জায় সমারোহপূর্ণ প্রার্থনা সভায় আর টেলিভিশন ইণ্টারভিউ-এর সময় ও ওগুলো ঝোলায়। একটা কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, টেলিভিশন ওকে আর সব উদ্বৃত্ত লজ্জার কারণেই দেখায়। আমাদের এই বর্তমান কালকে যদি কোনও নাম দিতে হয়, তাহলে এই কালের নাম বেশ্যাবৃত্তি। পতিতাদের ভাষায় মানুষ রপ্ত হয়ে উঠেছে। একবার ওরকম একটা ইণ্টারভিউ-এর পর ('আধুনিক শিল্প কি ধর্মপ্রাণ হতে পারে?'—বিষয়ের নাম) আমার সঙ্গে সমারহুবীল্ডের দেখা হয়েছিল। তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেমন বলেছিলাম? আপনার ভাল লেগেছিল আমার কথা?' হুবহু প্রশ্ন, বেশ্যারা যেমন ভদ্দরলোকটাকে যাবার সময় জিজ্ঞেস করে। একটুখানি শুধু তফাৎ ছিল, সেটুকু বললেই ষোল কলা পূর্ণ হত, 'আমার এখানে আসতে বলবেন আর সবাইকে।' সেবার আমি তাকে বলেছিলাম, 'আপনাকে আমার ভাল লাগে না, কাজেই গতকাল ভাল লাগতে পারেনি।' লোকটা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। আমি কিন্তু ওর সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যথেষ্ট মিষ্টি করেই বলে-ছিলাম। (ও সেই ইণ্টারভিউতে রীতিমত ভয়ঙ্কর ব্যবহার করেছিল। দু-চারটে হাল্কা ধরনের উন্নতির প্রসঙ্গে 'অন্য লোকটাকে' বেচারী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী লোকটাকে 'কচুকাটা' করেছে বা বলা যায় 'শেষ করে দিয়েছে', কিম্বা হয়ত কেবল 'ছাগল'-ও বানিয়ে ছেড়েছে)। কত কায়দাই জানে, জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা, তাহলে পিকাসোর প্রথম দিকের ছবিগুলো আপনার কাছে এ্যাবস্ট্রাক্ট মনে হয়?' খুব চালাকি করে সেই বুড়ো, পাকাচুলওয়ালা লোকটাকে এক কোটি দর্শকের সামনে খুন করেছিল। লোকটা দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে কি যেন একটা কথা শুধু বিড়বিড় করে বলেছিল। তাতে সমারহুবীল্ড বলেছিল,

'আচ্ছা, আপনি বুঝি সমাজতান্ত্রিক শিল্পের কথা বলছেন—নাকি ঐ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের কথা ?'

তার পরদিন সকালে তার সঙ্গে পথে দেখা হলে যখন আমি বলেছিলাম তার ব্যবহার আমার খারাপ লেগেছিল, তাতে ওর অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল যেন ওকে শেষ করে ফেলা হয়েছে। এক কোটি দর্শকের মধ্যে একজনের ওকে পছন্দ হয়নি, এ ব্যাপারটা ওর গর্বকে ভীষণভাবে আঘাত করে। তবে যাবতীয় ক্যাথলিক পত্র-পত্রিকার 'প্রকৃত উচ্ছ্বসিত' প্রশংসার মধ্যে দিয়ে তার যথেষ্ট ক্ষতি পূরণ করা হয়েছিল, সমারউইল্ডের জন্যই নাকি 'একটা সৎ প্রচেষ্টার' জয়লাভ সম্ভব হয়েছে।

আর তিনটে সিগারেট আছে, তার থেকে একটা ধরালাম, গীটারটা আবার তুলে নিয়ে একটুখানি টুংটাং করলাম আপন মনে। ভেবে দেখেছিলাম, লেয়োকে প্রশ্ন করবার সময় ওকে কি কি বলতাম। সবসময় যখনই আমি ওর সঙ্গে কোনও গভীর আলোচনা করতে চেয়েছি, তখনই হয় ওর স্কুলের পরীক্ষা থাকত, নয়ত ও অন্য কোনও ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকত। আর একটা কথাও ভাবছিলাম, সত্যি সত্যিই লরেটান লিটানি গাইব কিনা ; ওটা না গাওয়াই বরং ভাল—তাতে কারও ধারণা হতে পারে যে আমি একজন ক্যাথলিক। ওরা ভাববে, 'আমাদেরই দলের' একজন, আর তার ফলে ওদের চমৎকার একটা প্রোপাগাণ্ডার সুযোগ তৈরি হয়ে যাবে। ওরা তো সবকিছুই কেমন 'কাজে লাগাবার মত' করে তোলে, আর আমি যে আদৌ ক্যাথলিক নই, লরেটান লিটানি আমার শুধু ভাল লাগে, আর যে ইহুদী মেয়েটাকে ওটা উৎসর্গ করা হয়েছে তার জন্য আমার দয়া হয়, এসব কেউ বুঝবে না। ফলে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে, একটা ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কোনও এক প্যাঁচ কষে ওরা আমার মধ্যে কোটিখানেক ক্যাথলোন আবিষ্কার করে বসতে পারে। আমাকে হয়তো টেলিভিশনে টেনে নিয়ে যাবে—আর শেয়ার বাজার আরও চড়বে। আমাকে অন্য কোনও গান বাছতে হবে, কিন্তু ঐ লরেটান লিটানি গাইতেই আমার সবচেয়ে বেশি মন টানছে। কিন্তু বন্-এর স্টেশনের প্ল্যাটফরমের সিঁড়িতে তাতে কেবল ভুল বোঝার সম্ভাবনাই আছে। কি আর করা যাবে। আমি তো ওটা গীটারে কেমন সুন্দর তুলেছিলাম আর ঐ 'আমাদের জন্য প্রার্থনা কর' কেমন চমৎকার গীটারে বাজাতে পারি।

কাজে রওনা হবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। আমি পথে বসে গীটার বাজিয়ে

গান গাইতে শুরু করলে আমার বাজনা শ্রোতারাও নিশ্চয় আমার সম্বন্ধে সব 'আশা ত্যাগ' করবে। আমি যদি সত্যি সত্যিই টানটুম এ্যারগো বা আর সব লিটানিগুলো গাইতাম, যেগুলো গাইতে আসলে আমার খুবই ভাল লাগে, যেগুলো বছরের পর বছর ধরে বাথটবে বসে গেয়েছি, তাহলে হয়ত লোকটা আবার 'আসত।' সেটা একটা চমৎকার ব্যাপার হত, (কতকটা ঐ ম্যাডোনার ছবি আঁকার মত। আমার তো মনে হত, লোকটা আমাকে সত্যিই পছন্দ করত—এই পৃথিবীর সন্তানরা আলোকের সন্তানদের চেয়ে উদার প্রকৃতির—) কিন্তু 'ব্যবসার' দিক থেকে দেখতে গেলে ওর কাছে আমি শেষ হয়ে গেছি, বন্-এর প্ল্যাটফরমের সিঁড়িতে বসলে আমাকে ওর আর দরকার হবে না।

এখন আর হাঁটতে গেলে তেমন খোঁড়াতে হচ্ছে না। অতএব (কমলালেবুর) কেরোসিন কাঠের বাক্স আর দরকার নেই, দরকার কেবল বাঁ বগলের তলায় একটা সোফার গদী আর ডান বগলে গীটারটা নিয়ে কাজে রওনা হওয়া। দুটো সিগারেট এখনও আছে, একটা খাব,—শেষ সিগারেটটা রাখতে হবে কালো টুপিটার মধ্যে চার হিসাবে, ওর পাশে অন্তত একটা খুচরো পয়সা রাখতে পারলে ভাল হত। প্যান্টের পকেটগুলো দেখলাম, সেগুলো উল্টে বার করে খুঁজলাম—দুচারটে সিনেমার টিকিট, একটা লাল রঙের লুডোর ঘুঁটি, একটা কাগজের রুমাল নোংরা হয়ে গেছে, কিন্তু পয়সা পেলাম না। ওঘরে গিয়ে আলমারীর ড্রয়ার টান দিয়ে খুললাম—একটা কোট ঝাড়বার ব্রাশ, বন্-এর গীর্জার একটা রসিদ, এক বোতল বীয়ারের কুপন একটা, পয়সা নেই। রান্নাঘরের সব কটা ড্রয়ার তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, ছুটে গেলাম শোবার ঘরে, জামার আর হাতের বোতামের মধ্যে খুঁজলাম, মোজা আর রুমালের মধ্যে, সবুজ ম্যাঞ্চেস্টার প্যান্টের পকেটেও নেই। আমার কালো প্যান্টটা ছেড়ে ফেললাম, মেঝের ওপর ফেলে রাখলাম খুলে ফেলা চামড়ার মত, সাদা শার্টটা তার পাশে ছুঁড়ে ফেললাম, তারপর গায়ে দিলাম আকাশী রঙের পুলওভার—ঘাসের মত সবুজ আর আকাশী রঙ, আয়নার সামনে দাঁড়ালাম—চমৎকার! এমন সুন্দর আমাকে আগে কখনও মানায় নি। মুখের রঙটা বড় পুরু করে লাগানো হয়ে গেছে, কয়েক বছর ধরে পড়ে থেকে ওর তেলতেলে ভাবটা শুকিয়ে গেছে। এখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম, মেকআপ জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে, দাগগুলো দেখাচ্ছে স্ট্যাচুর মুখের মত, তার ওপর আমার কালো চুল পরচুলার মত দেখাচ্ছে। আপন মনে এক কলি গান গুনগুন করে গাইলাম, তক্ষুনি মনে পড়ল, 'বেচারী পোপ জন,

সি-ডি-ইউ-এর কথা শোনে না, সে ম্যলারের গাধা নয়, ম্যলারের পরোয়া করে না। ওটা দিয়ে শুরু করা যেতে পারে, আর ঈশ্বরকে বিরক্ত করা প্রতিরোধের সেন্ট্রাল কমিটি'—এ গানের কথার মধ্যে অভিযোগ করার মত কিছু খুঁজে পাবে না। আমি আরও অনেক গান বাঁধব আর সবগুলো গীটারে তুলব। আমার খুব কান্না পাচ্ছে—মেকআপের জন্য কাঁদা যাবে না; ওটা চমৎকার দেখাচ্ছে, ঐসব ফাটা ফাটা দাগগুলো, জায়গায় জায়গায় খসে পড়বার মত অবস্থা, চোখের জল লাগলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। পরে কাঁদলেই হবে, কাজের শেষে যদি অবশ্য তখনও ইচ্ছে বা অবস্থা থাকে। পেশাগত অভ্যাস হচ্ছে সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ, একমাত্র ধার্মিক আর এ্যামেচারদেরই জীবন-মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়। আয়নার সামনে থেকে সরে নিজের গভীরে ঢুকে পড়লাম, তারপর আরও অনেক দূরে। মারী যদি আমাকে এই অবস্থায় দেখত আর তারপরও পারত ৎস্যুফনারের মালটেসা ইউনিফরমের মোমের দাগ ইস্তিরি করে তুলতে—তাহলে মারী মরে গিয়েছে, আমাদের বিচ্ছেদ হয়েছে। তাহলে আমি ওর কবরে গিয়ে শোক প্রকাশ করতে শুরু করতে পারতাম। আশা করছি, আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় ওদের কাছে যথেষ্ট খুচরো থাকবে। লেয়োর কাছে দশ ফেনির কিছু বেশি, এডগার হবীনেকেন যদি থাইল্যান্ড থেকে ফিরে আসে তবে হয়তো একটা পুরোনো মোহর, আর ঠাকুরদা ইন্ডিয়া থেকে ফিরে এসে অন্ততপক্ষে একটা ক্রশ-চেক লিখে দেবে। ইতিমধ্যে আমি ক্রশ-চেক ভাঙানো শিখে গেছি, আমার মা খুব সম্ভব দুই থেকে পাঁচফেনিই যথেষ্ট মনে করবে, মনিকা সিলভ্স হয়ত নিচু হয়ে আমাকে একটা চুমু দেবে, ওদিকে সমারহবীল্ড, কিংকেল আর ফ্রেডবয়েল আমার এই রুচিহীনতায় এমন ক্ষেপে যাবে যে আমার টুপিতে একটা সিগারেটও ফেলবে না। মাঝে মধ্যে যদি দক্ষিণ দিক থেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কোন ট্রেন আসবার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে আমি সাইকেলে চেপে সাবিনে এমন্ডস্-এর ওখানে যাব, সেখানে আমার স্যুপ খাব। সমারহবীল্ড হয়ত ৎস্যুফনারকে ট্রাংককল করে বলে দেবে গোডেসবাগেই নেমে পড়ছে। তাহলে আমি সাইকেল চেপে যাব, গড়ানো বাগানওয়ালা ভিলার সামনে গিয়ে বসে আমার গান গাইব—মারীকে কেবল একবার আসতে হবে, আমাকে দেখতে হবে তারপর মরে যাক বা বেঁচে থাকুক। একটিমাত্র লোকের কথা ভেবে আমার কষ্ট হচ্ছে, সেটা আমার বাবা। সেই যে মহিলাদের গুলি খেয়ে মরার হাত থেকে বাঁচানো বাবার এক চমৎকার কাজ হয়েছিল, আরও একটা চমৎকার

কাজ বাবা করেছিল, আমার কাঁধে হাত দুটো রেখেছিল—এখন আমি আয়নায় দেখতে পাচ্ছি—এই এখন আমার যে মেকআপ, তাতে আমার সঙ্গে বাবার শুধু মিলই নেই, আমরা অবিশ্বাস্যভাবে একরকম দেখতে। আর এখন আমি বুঝতে পারছি, মেয়েয় ক্যাথলিক হওয়ার সময় বাবা কেন প্রচণ্ড আপত্তি তুলেছিল। মেয়োর জন্য আমার কোনও ভাবনা নেই, ওর তো নিজের বিশ্বাস রয়েছে।

লিফ্‌টে করে যখন নিচে নামছি, তখন সাড়ে নটাও বাজেনি। খ্রীস্টান পোস্টার্ট-এর কথা মনে পড়ল। ওর কাছে আমার এখনও এক বোতল মদ পাওনা, আর পাওনা আছে সেকেণ্ড আর ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়ার তফাতের টাকাটা। আমি ওকে একটা বেয়ারিং পোস্টকার্ড পাঠাব, ওর বিবেককে খোঁচাতে। মালপত্র পাঠাবার রসিদটাও তো এখনও পাঠায়নি। আমার প্রতিবেশী সুন্দরী কাউ গ্রেবসেলের সাথে দেখা হয়ে যায়নি, ভালই হয়েছে। তাহলে তাকে সব কথা বোঝাতে হত। স্টেশনের সিঁড়িতে বসা অবস্থায় আমাকে দেখলে আর কিছু বলবার দরকার হবে না। জ্বালানি কয়লার টুকরোটাই কেবল নেই, আমার ভিজিটিং কার্ডটা।

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা, মার্চ মাস। কোটের কলারটা তুলে দিলাম, টুপিটা মাথায় চাপালাম, হাত দিয়ে দেখে নিলাম শেষ সিগারেটটা আছে কিনা পকেটে। ব্র্যাণ্ডির বোতলটার কথা মনে পড়ল, ওটা হলে বেশ সাজিয়ে বসা যেত। তবে তাতে ভিক্ষে পাবার অসুবিধার সৃষ্টি হত, দামী জাতের ব্র্যাণ্ডি ওটা—ছিপি দেখলেই বোঝা যায়। বাঁ বগলের নিচে গদীটা, ডান বগলে গীটার আঁকড়ে ধরে স্টেশনে ফিরে চললাম। পথে বেরিয়ে তবে বুঝতে পারলাম সময়টা কী। এ সময়টাকে 'ভাঁড়ামির সময়' বলা হয়। ফিডেল কাস্ট্রোর মত সাজগোজ করা এক মাতাল ছোকরা আমার সঙ্গে ঝঞ্ঝাট বাধাবার তালে ছিল, আমি পাশ কাটিয়ে গেলাম। স্টেশনের সিঁড়ির ওপর একদল মাটাডোর আর স্প্যানিশ ডোন্না দাঁড়িয়ে ছিল ট্যাক্সির জন্য। ভুলেই গিয়েছিলাম, এটা কার্নেভ্যালের সময়। ভালই হয়েছে। এ্যামেচার সাজের লোকদের মধ্যে একজন পেশাদার লোক যত সহজে লুকোতে পারে, তত সহজ আর কোনও জায়গা নেই। নিচের দিক থেকে তৃতীয় সিঁড়িতে গদীটা রাখলাম, ওর ওপর বসে টুপিটা খুললাম, তার মধ্যে সিগারেটটা রাখলাম, ঠিক মধ্যিখানে নয় আবার একেবারে ধারেও না। এমনভাবে রাখলাম যেন ওটা ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলেছে কেউ। এইবার শুরু করলাম গান

ফেজাটা চাপ জল; কেউই আমাকে লক্ষ্য করল না, সেটা ফেজের ভেতরে ছুঁড়ে—এক ঘণ্টা, দুঘণ্টা, তিনঘণ্টা বাদে ঠিক শুরু হয়ে যাবে আমাকে লক্ষ্য করা। স্টেশনের ভেতরে লাউডস্পীকার যখন কি একটা বলল, তখন আমি গান বন্ধ রেখে শুনলাম। হামবুর্গ থেকে একটা ট্রেন আসছে সেকথা [illegible]—আমি আবার শুরু করলাম। প্রথম পয়সাটা আমার টুপির মধ্যে পড়তে আমি চমকে উঠলাম—একটা দশ ফেনি, ওটা এসে সিগারেটটার ওপর পড়ে সেটাকে একধারে সরিয়ে দিয়েছে। ওটাকে আবার জায়গামত রেখে গান গেয়ে চললাম।